গ্যাস চেম্বার

প্রকাশক : শ্রীসুধীন্দ্র চৌধুরী
৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

Gas-Chamber
Chiranjib Sen

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৬৪

প্রচ্ছদ : শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রাকর : শ্রীধনঞ্জয় দে
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৪৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ

ও

শ্রীমতী মীরা ঘোষ

জয়যুক্তেষু

চিরঞ্জীব সেন

ইহুদি সমস্যার 'চূড়ান্ত সমস্যা সমাধানের' জন্যে যা নাকি 'ফাইন সলিউশন' নামে খ্যাতি লাভ করেছে, হিটলার এবং তার তল্পিদাররা করে যে ইউরোপ থেকে এ জাতকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেল হবে। এই ইহুদি জাতির জন্যেই নাকি জার্মানি প্রথম মহাযুদ্ধে হেরে অতএব এই জাতি জীবিত থাকলে আরও কি সর্বনাশ করবে কে জানে?

হিটলার যে সব কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বসিয়েছিল তাদের ম অসউইজ ছিল সত্যিই একটা 'ডেথ ফ্যাকটরি', মৃত্যু-কারখানা। এই মৃত্যু-কারখানায় ছিল চারটে গ্যাস চেম্বার আর চারটে ক্রিমেটোরিয়ম এবং এক দিনে ছ'হাজার পর্যন্ত মানুষকে ছাইগাদায় পরিণত করা যেতে পারত।

ইহুদিদের ত হত্যা করা হতই উপরন্তু অনেক ইহুদির মৃতদেহ চেরাই করে তাদের দৈহিক খুঁতগুলির রিপোর্ট সযত্নে রক্ষা করার ব্যবস্থা হত। ভবিষ্যতে জার্মানদের দেখিয়ে বলা হবে এই দেখ ইহুদিদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শুদ্ধ জার্মান আর্যজাতি অপেক্ষা কত নিকৃষ্ট! জার্মান যদি হয় সিংহ তবে ইহুদি হল মূষিক।

এই বই লেখবার সময় আমি উইলিয়ম এল সারার লিখিত 'দি রাইজ অ্যাণ্ড ফল অফ থার্ড রাইখ' এবং 'দি রাইজ অ্যাণ্ড ফল অফ হিটলার' হাইনরিশ হফম্যান লিখিত 'হিটলার ওয়াজ মাই ফ্রেণ্ড', বারট্রাণ্ড রাসেল-এর 'দি স্কার্জ অফ স্বস্তিক', জ্যাক ডিলারু-এর 'দি হিস্টরি অফ গেস্টাপো', ডাঃ নিকলস নিজলি-এর 'অসউইজ', যোসেফ কেসেল-এর 'দি ম্যাজিক টাচ' এবং অনেক 'পত্র-পত্রিকায়' প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধের সাহায্য নিয়েছি। এই লেখকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

নামের উচ্চারণগুলি হয়ত আমি শুদ্ধভাবে লিখতে পারি নি। আমার অজ্ঞতাকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছি যে বিদেশীরাও আমাদের নামগুলিকে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারে না।

—গ্রন্থকার

গোরুছাগল নিয়ে যাবার রেলের যে ওয়াগনে বড় জোর সত্তরজন মানুষ ঢোকানো যায়, সেই ওয়াগনে জোর করে নব্বুইজন মানুষ ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ভাগ্যিস শীতের দেশ তাই ওয়াগনের ভেতরে যে গরম হচ্ছে সেটা কোন রকমে সহ্য করা যাচ্ছে কিন্তু ওয়াগনে কোনো ল্যাভেটরি নেই। একটা বালতি এক কোণে আছে। সেই বালতি উপচে পড়ে যাচ্ছে। ইউরিনের তীব্র গন্ধে ওয়াগনের মধ্যে টেকা দায়।

কিন্তু কোনো জানালা নেই যে খুলে দিলে বাইরে থেকে হাওয়া এসে গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে যাবে। উপায় নেই। ভিড়, ধাক্কাধাক্কি এবং দুর্গন্ধ সহ্য করতেই হবে। নাক জ্বালা করছে।

এই রকম চল্লিশখানা ওয়াগনের একটা ট্রেন চলেছে হাঙ্গেরির কোনো এক রেল স্টেশন থেকে পোল্যাণ্ডের দিকে। এ হল ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসের কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতে তখনও এক বছর বাকি।

লম্বা এই ট্রেনখানায় কারা আছে? সেই দেশহারা অভিশপ্ত ইহুদির দল। হিটলার যাদের মানুষ বলে স্বীকার করে না। হিটলার বলে ওদেরই বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে জার্মানি প্রথম মহাযুদ্ধে [illegible] ফলে জার্মানিকে পড়তে হয়েছিল চরম বিপর্যয়ের মুখে, সহ্য করতে হয়েছিল লাঞ্ছনা, অপমান, অত্যাচার, নিপীড়ন [illegible] কষ্ট। অতএব এই জাতিকে হিটলার আর রাখবে না। জার্মানিতে তো বটেই, জার্মান অধিকৃত দেশগুলি থেকেও তাদের একেবারে মুছে ফেলবে।

হিটলার তথা তার প্রধান ঘাতক আইখম্যান ও অন্যান্যের আদেশে কত ইহুদি নিধন হয়েছিল? দশ লাখ, বিশ লাখ? না

আরও অনেক বেশি। এক কোটি বিশ লক্ষ। একা হাঙ্গেরি থেকেই তো দশলক্ষ ইহুদি নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল।

এই ট্রেনে একজন বিশিষ্ট যাত্রী আছে। একজন ডাক্তার। তারই জবানিতেই এই কাহিনী বলব। ডাক্তারের নাম মিকলস নিজলি।

ভেড়ার পালের মতো বোঝাই গাড়িতে কোনোরকমে একজায়গায় বসে ডাক্তার মিকলস নিজলি চলেছে। আর ক'দিনই বা জীবন আছে? মনে মনে প্রার্থনা করছে আর পাশেই সামান্য একটু যে ফাঁক ছিল তারই ভেতর দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে।

কে জানে পৃথিবীকে এই বোধহয় তাদের শেষ দেখা। পৃথিবীর আলো আর বোধহয় তারা দেখতে পাবে না। হাওয়ার স্পর্শ আর পাবে না। তৃষ্ণা নিবারণ করতে আর জলও পান করতে পাবে না। গাছের ছায়ায় আর বসতে পাবে না। এই শেষ।

কি তাদের অপরাধ? তারা যে ইহুদি।

না। ডাক্তার মিকলস নিজলি মরে নি। বুকচাপা বিভীষিকার বর্ণনা লেখবার জন্যে ডাক্তার নিজলি বেঁচে গিয়েছিল। কী করে যে ডাক্তার বাঁচল সে এক আশ্চর্য কাহিনী।

ডাক্তার লিখছে:

এটা কোন স্টেশন পার হল? টাটরা? নাম শুনিনি। গাড়ি চলেছে। একের পর এক স্টেশন পার হচ্ছে। কোথাও গাড়ি দাঁড়াচ্ছে, কোথাও দাঁড়াচ্ছে না।

কয়েকটা বড় স্টেশন পার হল, যেমন লুবলিন, ক্রাকাউ। এই দুই শহরে দুটো বড় বড় ক্যাম্প আছে। এই ক্যাম্পে নাৎসী বিরোধী এবং ইহুদিদের জমায়েত করা হয় তারপর বাছাই করা হয় কাকে কি ভাবে হত্যা করা হবে। ঘাড়ে গুলি করে না গ্যাস চেম্বারে?

যাদের গুলি করে হত্যা করা হবে তাদের পাঠান হয় অরণ্যে আর

যাদের গ্যাস-চেম্বারে, তাদের পাঠান হয় ক্রিমেটোরিয়মে অর্থাৎ দাহন-চুল্লিতে।

গ্যাস-চেম্বারে ঢুকিয়ে আগে হত্যা তারপর ক্রিমেটোরিয়মে ভরে মৃতদেহ দহন। দহনের পর যে হাড়গোড় পাওয়া যাবে সেগুলি মেসিনে গুঁড়ো করে নদী, হ্রদ বা সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে।

ক্রাকাউ ছাড়বার ঘণ্টাখানেক পরে ট্রেন একটা স্টেশনে থামল। এই স্টেশনের নাম আমরা শুনিনি কিন্তু পরে সারা জগৎ শুনেছিল। সেই নামে সারা সভ্য জগৎ আজও ভয়ে কাঁপে।

ট্রেনের দেওয়ালের সেই ফাঁক দিয়ে আমি কোনোরকমে স্টেশনটার নাম পড়লুম। বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে অসউইজ। কেউ কেউ বলে 'আউস্যুইৎস'।

না, আমরা কেউ এই স্টেশনের নাম শুনিনি। এখানে ট্রেন থামল কেন? এখানে কি হবে? এইখানেই কি তাহলে আমাদের নামিয়ে সারবন্দী করে দাঁড় করিয়ে মেসিনগান চালিয়ে গুলি করে হত্যা করা হবে? তাই হক। অত্যাচার আর সহ্য হয় না।

কিন্তু এখানে তো কোনো অরণ্য দেখতে পাচ্ছি না। বৃক্ষহীন ধূসর প্রান্তর। দূরে অবশ্য কয়েকটা ব্যারাক দেখা যাচ্ছে।

ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে কোলাহল। অনেক জার্মান কথা বলছে। অনেক জার্মান বুট সশব্দে চলে বেড়াচ্ছে।

আমাদের সঙ্গে যে সব স্টর্ম ট্রুপার ছিল তারা ঝপ ঝপ করে লাফিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। এমন কি যারা ট্রেন চালিয়ে নিয়ে এল; ড্রাইভার, ফায়ারম্যান, গার্ড, তারাও নেমে পড়ল। অন্য একদল মিলিটারি আমাদের ট্রেনের ভার নিল।

এলোমেলো যে সব কথা কানে আসছিল তা থেকে বুঝতে পারলুম যে আমাদের যাত্রা শেষ হয়েছে। এখানে বোধহয় নামতে হবে।

নতুন মিলিটারিরা ট্রেনে উঠে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন আবার ছেড়ে দিল। মিলিটারিরা ট্রেন চালাচ্ছে।

হাতে ঘড়ি নেই। ঘড়িটা একজন নাৎসী আগেই কেড়ে নিয়েছে। অনুমানে বুঝলুম কুড়ি মিনিট ট্রেন চলল। লম্বা একটা তীব্র স্বরে বাঁশি বাজিয়ে ট্রেন থামল।

বাঁশির সে কি তীব্র ও নিষ্ঠুর আওয়াজ। শিশুরা ভয়ে কেঁদে উঠল। তাদের মায়েরা শিশুকে জড়িয়ে ধরে আতঙ্কে কেঁপে উঠল।

বাইরের দৃশ্য একই রকম। তবে এখানে জমি অসমতল। বরং এখানে ওখানে ঝোপঝাড়, মাটির রং হলদে, ঘাস নেই বললেই হয়। আমাদের তো এমন নিষ্করুণ দেশই অভ্যর্থনা জানাবে। আমাদের জন্যে কি শ্যামলিমা অপেক্ষা করবে?

শুধু রুক্ষভূমি হলেও কথা ছিল। সেই রুক্ষভূমি উঁচু কাঁটা তারের ঘন বেড়া দিয়ে ঘেরা। শুধু কাঁটা তার নয়, মাঝে মাঝে দর্শক বা পথিকদের সতর্ক দেওয়া হয়েছে: তার ছুঁয়ো না, ছুঁলেই মৃত্যু, ৪৪০ না কি কত ভোল্ট বৈদ্যুতিক শক্তি নাকি সেই তার দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

কাঁটা তারের বেড়ার ভেতরে অনেক ব্যারাক। মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা, রাস্তা।

একসময়ে এরা হয়তো মানুষ ছিল। এখন আর তারা মানুষ নামের যোগ্য নয়, এমন কঙ্কালসার ছিন্নভিন্ন বেশে কিছু বন্দীকে দেখা গেল। রাইফেলধারী মিলিটারি প্রহরায় রাস্তা দিয়ে এদিকে ওদিকে যাচ্ছে। কারও কাঁধে গাঁইতি, কারও হাতে বেলচা, কারও পিঠে কাঠের বোঝা, কারো মাথায় বালতি। চলবার শক্তি তাদের নেই। আরও দূরে দেখতে পেলুম কয়েকজন বন্দী কিছু ট্রাংক বহন করে পাশে একটি ট্রাকে তুলছে।

কাঁটাতারের বেড়ার মাঝে মাঝে রয়েছে সুউচ্চ ওয়াচ টাওয়ার। ওয়াচ টাওয়ারের মাথায় রয়েছে একটি করে নাৎসী মিলিটারি।

সামনে তেপায়ার ওপর বসানো মেসিনগান। যে কোন সময়ে গুলি চালাবার জন্য রেডি হয়েই আছে সে। এরা হল এস এস গার্ড।

আমাদের ওয়াগনের ভেতরে কে যেন ফিস ফিস করে বলল: কনসেনট্রেশন ক্যাম্প।

কনসেনট্রেশন ক্যাম্প? এতো নরক? আর এরই নাম অসউইজ। তখনও জানি না এই ক্যাম্পের স্বরূপ কি? আসল নরক, যার কাল্পনিক বিবরণী আমরা শুনেছি বা পড়েছি তার চেয়েও কতটা খারাপ এই ক্যাম্প তা জানতে আমাদের বাকি আছে।

জার্মানরা বর্ণমালার সহায়তায় অনেক বড় নাম সংক্ষেপে বলে। তারা এই নামকে বলে কে-জেড কিন্তু উচ্চারণ করে 'ক্যাটজেট'।

প্রথম দৃষ্টিতে যেটুকু চোখে পড়ল তা মোটেই আকর্ষনীয় নয় তবুও ভয় অপেক্ষা আমার তখন কৌতুহলই ছিল বেশি।

আমি একবার সহযাত্রীদের দিকে চেয়ে দেখলুম। আমাদের দলে ছিল ছাব্বিশ জন ডাক্তার, ছ'জন ফারমাসিস্ট। ছ'জন মহিলা, আমাদের ছেলে মেয়েরা এবং বাকি সবাই আমাদের বাবা মা আত্মীয় স্বজন। অধিকাংশই বয়স্ক নরনারী।

কেউ বসেছে মেঝেতে, কেউ তাদের পুঁটলি বা বাক্স প্যাঁটরার ওপর। সকলেই ক্লান্ত কিন্তু উদাসীন; যা হয় হবে এইভাব। তাদের মুখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, ভাবলেশহীন। ট্রেন থেকে হয় তো নামতে হবে কিন্তু তাদের কণামাত্র উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না।

কয়েকটা শিশু ঘুমোচ্ছে, কেউ কিছু চিবোচ্ছে, শুকনো রুটি বোধ হয়। আর বাকিরা যারা জেগে আছে, যাদের চিবোবার কিছু নেই তারা মাঝে মাঝে জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু জিভে কি কিছু রস আছে?

বাইরে বালির ওপর ভারি ভারি বুটের ভসভস শব্দ শোনা যাচ্ছে। সীল ভেঙ্গে দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে, এস এস গার্ডরা তীব্র স্বরে অর্ডার দিচ্ছে:

সবাই একে একে নেমে পড়, শুধু হাতে নেবার মতো মাল নিয়ে নামবে। ভারি মাল গাড়িতে পড়ে থাক।

আমরা সক্ষম পুরুষেরা ট্রেন থেকে নীচে লাফিয়ে নেমে পড়লুম তারপর হাত তুলে শিশু ও আমাদের পত্নীদের নামিয়ে নিলুম, কারণ নীচে নামবার জন্যে প্রায় সাড়ে চার ফুট তাদের মতো দুর্বলদের পক্ষে লাফিয়ে নামা সম্ভব নয়।

রেল লাইনের ধার বরাবর এস এস গার্ডরা আমাদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন ছোকরা এস এস অফিসার, নিখুঁত ইউনিফর্ম, চকচকে বুট। কোটের চওড়া কলারে সোনালী ব্যাজ।

নাৎসী মিলিটারিদের ব্যাজ থেকে আমি তাদের র‍্যাংক চিনতে পারি না কিন্তু তার বাহুতে লাল ক্রস চিহ্নিত ব্যাণ্ড দেখে বুঝলুম যে ছোকরা একজন ডাক্তার। পরে জেনেছিলুম যে সে এই এস এস গ্রুপের হেড এবং অসউইজ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের চিফ মেডিক্যাল অফিসার, নাম ডক্টর মেনজিল তথা সর্বেসর্বা।

তার আরও একটা ডিউটি আছে। সে হল 'মেডিক্যাল সিলেক্টর'। প্রতি ট্রেন আসার সময় তাকে হাজির থাকতে হয়। বন্দীদের সে বাছাই করে দেয়, কাদের দিয়ে ক্যাম্পে কুলিমজুরের কাজ করানো যাবে, কাদের সরাসরি গ্যাস চেম্বারে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং কাদের আপাততঃ বন্দী রাখা হবে বা অন্য ক্যাম্পে পাঠানো হবে।

প্রথম এই পর্যায়ের নাম 'সিলেকশন'। আগেই ভাগ্য নির্ধারণ করে দেওয়া হবে তারপর অন্য কাজ, অন্য কথা। দেখা যাক আমার ভাগ্যে কি আছে। আমি তো একা নই, আমার স্ত্রী ও পনেরো বছরের আমার কিশোরী মেয়েটি আছে।

প্রথমেই তো স্ত্রীলোক ও পুরুষদের দুভাগে ভাগ করে দেওয়া হল। যেসব বালক-বালিকার বয়স চৌদ্দ বছরের কম তাদের মায়ের

সঙ্গে থাকতে দেওয়া হল। আমাদের যুক্ত দলটি প্রথমে এইভাবে বিভক্ত হল। স্ত্রী ও সন্তান থেকে আমরা পৃথক হয়ে গেলুম। অনেক মা ও সন্তান কাঁদতে আরম্ভ করল। কে জানে আর হয়তো দেখা হবে না।

কিন্তু গার্ডরা আশ্বস্ত করতে লাগল। তারা বলল ভয় পাবার কিছু নেই। ক্যাম্পে এলেই এভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়। মেয়েদের এখন পরিষ্কার হবার জন্যে স্নানাগারে পাঠান হবে। পুরুষদেরও পাঠান। স্নান করে পরিষ্কার হয়ে এলে আবার দেখা হবে।

তা সেই স্নানাগার তো কাছে নয়। একটু দূরে। একে একে সকলকে ট্রাকে বা লরিতে তোলা হচ্ছে। এই ক্যাম্পে আমি একবার চারদিক দেখে নেবার চেষ্টা করলুম। নড়েচড়ে তো দেখবার উপায় নেই, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম সেখান থেকেই দেখতে লাগলুম।

সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। ব্যারাকের ছায়া লম্বা ও কালো হচ্ছে, আকাশও ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। এ যেন রূপকথার রাজ্যের ভয়াবহ এক তেপান্তরের মাঠ।

একটা জিনিস দেখে কিন্তু আমি ভয় পেলুম। লাল ইঁটের তৈরি বেশ বড়সড় চৌকো একটি উঁচু চিমনি। দোতলা বাড়ির চেয়েও উঁচু। দেখে তো মনে হয় কারখানার চিমনি কিন্তু এখানে কারখানা আছে নাকি? কিসের কারখানা? মানুষের চামড়া ট্যান করার কারখানা?

মনে করার কারণ আছে। সেই চিমনির মুখ দিয়ে লকলক করে অগ্নিশিখা বেরিয়ে আসছে। চিমনি থেকে তো ধোঁয়া বেরোয় আগুনের শিখা কেন? কারখানায় কি জ্বলছে? এত আগুন কেন? কি তৈরি করতে বা কি রান্না করতে এত আগুন লাগে যে তার শিখা চিমনির উচ্চতা অতিক্রম করে বাইরে বেরিয়ে আসছে?

হঠাৎ আমার খেয়াল হল আরে আমি তো এখন জার্মানি অধিকৃত পোল্যাণ্ডে। এ তো এখন দাহন-চুল্লির দেশ।

পোল্যাণ্ডে আমি দশ বছর কাটিয়েছি, ছাত্র ও ডাক্তার হিসেবে অতএব আমার জানা আছে যে এখানে কনিষ্ঠতম শহরেও ক্রিমেটোরিয়ম থাকে। অতএব এটি কোনো কারখানা বা রন্ধনশালাও নয়। এটি একটি ক্রিমেটোরিয়ম।

আরও খানিকটা তফাতে আরও একটা বাড়ি। সেই বাড়ির এলাকার মধ্যেও একটা চিমনি আমার নজরে পড়ল। ওধারে গাছের আড়ালে আরও একটা। এই চিমনিটা থেকেও আগুন বেরোচ্ছে।

কিসের যেন গন্ধও বেরোচ্ছে? ট্রেনের ওয়াগনের মধ্যে ইউরিনের তীব্র গন্ধে নাক বন্ধ হয়ে ছিল। খোলা হাওয়ায় এসে নাক আস্তে আস্তে খুলে গেছে। অন্য গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে।

অন্য গন্ধটা কি? আমি নাক তুলে ঘ্রাণ নিতে চেষ্টা করি। গন্ধ যদিও মৃদু তবুও নাকে আসতেই গা গুলিয়ে উঠল। মাংস পোড়া, চুল পোড়ার গন্ধ। এই সকল ক্রিমেটোরিয়মে আমাদের খাওয়াবার জন্যে গোরু, ঘোড়া বা শূকর রোষ্ট করা হচ্ছে না নিশ্চয় আর এ গন্ধ রোস্ট করার গন্ধও নয়। ক্রিমেটোরিয়মে কি পোড়ে এবং তার গন্ধ কি রকম তা আমার কিছু জানা আছে। তবুও ভাল করে আঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করি কিন্তু ততক্ষণে 'নির্বাচনের' দুনম্বর পালা শুরু হয়ে গেছে।

সমস্ত স্ত্রী, পুরুষ ও বালক-বালিকাদের তখন পরপর লাইন করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সিলেকশন কমিটির সামনে দিয়ে একে একে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বয়স্করাও লাইনে আছে, অথর্বরাও আছে।

পুরো লাইনটা সিলেকশন কমিটির দেখা হতে মেডিক্যাল 'সিলেকটর' ডাক্তার মেনজিল হাতের একটা ইসারা করলেন। লাইনটা সেই ইসারা নির্দেশে দুভাগে ভাগ করা হল। বাঁ দিকের লাইনে রইল বয়স্ক, অথর্ব, পঙ্গু, দুর্বল, নারী ও চৌদ্দ বছরের কম বালক-বালিকারা।

ডান দিকের লাইনে রইল আপাতদৃষ্টে সমর্থ পুরুষ ও নারী অর্থাৎ যারা খাটতে পারবে। এই দলে দেখলুম আমার স্ত্রী ও কন্যাও আছে। তাদের আমি কোনো কথা বলতে পারলুম না তবে ইসারায় কিছু কথা হল।

বেশ কিছু পঙ্গু ছিল, তারা হাঁটতেই পারছে না। কয়েকজন উন্মাদও ছিল। এদের রেডক্রস মার্কা ভ্যানে তোলা হল। আমার লাইনে কয়েকজন বৃদ্ধ ডাক্তার ছিল। তারা জিজ্ঞাসা করল তাদের ভ্যানে চড়তে দেওয়া হবে কিনা। কোনো উত্তর নেই। ভ্যান ছেড়ে দেওয়া হল। সেই সঙ্গে আমার বাঁদিকে বৃদ্ধ ও অথর্বদের লাইন নতুন করে বিন্যস্ত করে এস এস গার্ডরা তাদের কোথায় নিয়ে গেল। কিছু পরে তারা গাছের আড়ালে আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

আমাদের লাইন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তার মেনজিল হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠল

লাইনে যারা ডাক্তার আছ তারা এগিয়ে এস।

হুঙ্কার শুনে চমকে উঠেছিলুম। আদেশ মানতেই হবে। অতএব আমরা যারা ডাক্তার ছিলুম লাইন ছেড়ে দু'পা এগিয়ে দাঁড়ালুম। কম নয়, আমরা পঞ্চাশজন ডাক্তার ছিলুম।

মেনজিলের আবার হুঙ্কার :

জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা পড়েছ? উত্তমরূপে প্যাথোলজি জানা আছে কি না? ফোরেনসিক মেডিসিনে প্র্যাকটিশ করেছ কি? যাদের এই যোগ্যতা আছে তারা এগিয়ে এস। কিন্তু খুব সাবধান, এই যোগ্যতা না থাকলে এবং কাজ না পারলে কিন্তু…

মেনজিল কথা শেষ করল না কিন্তু যা ইঙ্গিত করল তার অর্থ এই হল যে তাহলে বিপদে পড়বে।

বিপদে আবার পড়ব কি? বিপদে তো এক গলা ডুবেই আছি। আমি আমার সঙ্গীদের দিকে চেয়ে দেখলুম কিন্তু তারা কেউ সাড়া

দিল না। নড়বার চেষ্টাও করল না। তারা রীতিমতো ভয় পেয়েছে। কে জানে কি মতলব।

আমি কিন্তু ঝুঁকি নিলুম। ঝুঁকি না নিলে হয় তো বেঁচে ফিরে আসতে পারতুম না এবং কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আমি কি ভয়াবহ কাণ্ড কারখানা দেখে এসেছি এবং আমাকে কি কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল তাও আপনাদের জানাতে পারতুম না।

আমি ডাক্তার মেনজিলের সামনে যেয়ে দাঁড়ালুম। মেনজিল একটা ক্যাম্বিশের ভাঁজকরা চেয়ারে বসল তারপর একটা রাশিয়ান সিগারেট ধরিয়ে আমার মুখের দিকে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর আমাকে কয়েকবার বেশ করে দেখে নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্নের তীর ছুঁড়তে লাগল। কোথায় পড়েছ? কোন ইউনিভারসিটি? প্যাথোলজির প্রফেসরের নাম কি? ফোরেনসিক মেডিসিন কোথায় শিখেছ? কোথায় প্র্যাকটিশ করতে? কতদিন?

আমার জবাব বোধ হয় সন্তোষজনক হয়েছিল। আমাকে ভেতরের দিকে অপেক্ষা করতে বলল। অন্য ডাক্তারদের লাইনে ফিরিয়ে দিল।

তারপর একসময় ডাক্তারগণ সমেত আমি যে লাইনে দাঁড়িয়েছিলুম সেই লাইনের এবং আমাদের বাঁদিকের লাইনের সকলকে একে একে গাড়িতে তোলা হল। যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম সেখান থেকেই দেখতে পেলুম তাদের একটা ক্রিমেটোরিয়মের গেটের ভেতর নিয়ে যাওয়া হল কিন্তু তারা আর কোন দিন সেই ক্রিমেটোরিয়মের গেটের বাইরে আসতে পারে নি।

সেই স্থানে অন্যান্য যারা উপস্থিত ছিল তাদের থেকে আমি একটু তফাতে একা দাঁড়িয়েছিলুম। ভাবছিলুম জার্মানিতে আমি যখন ডাক্তারী পড়তুম। জার্মানিতে আমি খুব আনন্দে ছিলুম। সে

স্মৃতি আমি ভুলতে পারি না। তাছাড়া আমার কলেজের শিক্ষকরা খুব ভাল ছিলেন। আমি বিদেশী বা ইহুদি বলে আমাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করতেন না। খুব যত্ন নিয়ে তাঁরা সকলকেই সব কিছু শেখাতেন। আর আজ আর একজন জার্মান ডাক্তারের হাতে আমি কি ব্যবহার পাচ্ছি। দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করা ছাড়া আমার আর করবার কি আছে।

আকাশে তারা ফুটেছে। মৃদু সান্ধ্য বাতাস বইছে। নাকে আর পোড়া মাংসর গন্ধ লাগছে না। বেশ লাগছিল। হঠাৎ ওয়াচ টাওয়ারের সব সার্চলাইট দপ করে জ্বলে উঠে চোখ ধাঁধিয়ে দিল। আমি আবার বাস্তবে ফিরে এলুম।

কয়েকটা থামের ওপরে রক্ষিত তীব্র সার্চলাইট এয়ারপোর্টের আলোর মতো চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সমস্ত পরিবেশটাই পালটে গেল। আলোর বাইরে অন্ধকার। যে সব ব্যারাকে মানুষ নেই সেগুলি অন্ধকার। বাতাসটাও যেন বন্ধ হয়ে গেল। থার্ড রাইখের ক্রিমেটোরিয়ম থেকে আবার পোড়া মাংস ও পোড়া চুলের গন্ধ আসতে লাগল। মিনজেল যদি একটা সিগারেট দিত!

যে ট্রেন আমাদের নিয়ে এসেছিল তার ওয়াগনগুলি খালি হয়ে গেছে, আর কোনো বন্দী নেই। কয়েদির পোশাক পরা কিছু লোক এসে গাড়িতে উঠে আমাদের ছেড়ে আসা ভারি ভারি মোট ও ট্রাংক গুলি নামিয়ে ট্রাকে তুলতে লাগল। ক্রমে সব মাল নামানো হয়ে গেল, ট্রেন খালি হয়ে গেল। ট্রেনের দিকের আলো নিবিয়ে দেওয়া হল। অন্ধকারে ট্রেনটা আর দেখা গেল না।

ঐ ট্রেনটাই আমাদের দেশ থেকে নিয়ে এসেছিল। এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না। আমার মনে হল যেন আত্মায় বিয়োগ হল।

যে সকল এস এস ট্রুপ ডিউটিতে ছিল ডাক্তার মেনজিল তাদের কিছু নির্দেশ দিল। ডাক্তার এবার কোয়ার্টারে ফিরে যাবে কিন্তু আমাকে তো কিছু বলল না। আমাকে কোথায় পাঠাবে?

ডাক্তার কয়েক পা হেঁটে গিয়ে নিজের গাড়িতে উঠল। গাড়ি-খানা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। গালাগাল খাবার ভয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হচ্ছে না।

ডাক্তার ড্রাইভারের সিটে বসে স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে গাড়িতে স্টার্ট দিল। এইবার আমার দিকে ইসারা করে আমাকে গাড়িতে উঠতে বলল।

আমি পিছনের দরজা খুলে গাড়িতে উঠলুম। পিছনের সিটে একজন জুনিয়র এস এস অফিসার বসেছিল। আমি তার পাশে বসলুম।

ক্যাম্পের ভেতর দিয়ে গাড়ি চলল। কাঁচা রাস্তা। গর্তে ভর্তি। কোনো এক সময়ে বৃষ্টি হয়েছিল। কাদা প্যাচ প্যাচ করছে। গর্ত-গুলোতে ময়লা জল জমে রয়েছে। রীতিমতো ঝাঁকুনি লাগছে। ডাক্তারকে সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছে।

সার্চলাইটগুলো পিছনে ফেলে গাড়ি এগিয়ে চলল। মস্ত একটা গেটের সামনে এসে গাড়ি থামল। ডাক্তার হর্ন বাজাল। পরিচিত হর্নের আওয়াজ শুনে একজন এস এস সেন্ট্রি এসে গেট খুলে দিল।

গেটের ভেতর দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল। এইটে বুঝি ক্যাম্পের মেন রোড়। দু'ধারে লম্বা লম্বা ব্যারাক।

গাড়ি আবার থামল। একটা বাড়ির সামনে। এ বাড়িখানা একটু স্বতন্ত্র। বাসযোগ্য বাড়ি বলে মনে হয়। সামনে একটা সাইনবোর্ড, লেখা রয়েছে "ক্যাম্প অফিস"। তাই, এইজন্যে বাড়িখানা একটু ভাল।

ডাক্তার আমাকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। ভেতরে দেখলুম বিভিন্ন ডেসকে বেশ কয়েকজন লোক কাজ করছে। সকলের পরণে কয়েদির পোশাক। তাহলে এরা সবাই কয়েদি।

ডাক্তার ঘরে ঢুকতেই সকলে নিজের নিজের টুল ছেড়ে উঠে পড়ল। তারপর অ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়াল। ডাক্তার ইসারা করতেই সবাই বসে পড়ল।

একটাও ডেস্ক বা টুল খালি নেই। আমাকে তাহলে বসাবে কোথায়? না, আমাকে এখানে বসানো হল না।

ডাক্তার একজনের সামনে যেয়ে দাঁড়াল। সে উঠে দাঁড়াল। বয়স হবে বোধহয় পঞ্চাশ। মাথা নেড়া। চোখ উজ্জ্বল। ডাক্তার তার সঙ্গে কি কথা বলতে লাগল। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলুম, ওদের কোনো কথা আমি শুনতে পাইনি।

পরে জেনেছিলুম লোকটি 'এফ' ক্যাম্পের চিকিৎসক কিন্তু একজন বন্দী। এর নাম ডাক্তার সেণ্টকেলার। ডাক্তার মেনজিলের কথা শুনতে শুনতে সেণ্টকেলার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতে লাগল।

মেনজিলের কথা শেষ হতে সেণ্টকেলার আঙ্গুল দিয়ে আমাকে একটা ডেস্ক দেখিয়ে দিল। আমি সেই ডেস্কের সামনে যেয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই সেই ডেস্কের লোকটি, যে কেরানী এবং একজন বন্দী, আমার নাম ধাম পেশা ইত্যাদি বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন করল। আমি উত্তর দিতে লাগলুম, সে মোটা খাতায় লিখে নিতে লাগল।

খাতায় লেখা শেষ করে কেরানী একটা কার্ড বার করে তাতে আমার নাম ইত্যাদি লিখল। লেখা শেষ হলে কার্ডখানা একজন এস এস গার্ডের হাতে দিল।

গার্ড আমাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাবে। আমাকে ইসারা করল। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে আমি কোমর বেঁকিয়ে ডাক্তার মেনজিলকে বাও করলুম।

ডাক্তার সেণ্টকেলার এটা লক্ষ্য করল। বেশ উচু গলায় এবং একটু ব্যঙ্গের স্বরেই বলল: এখানে ওসব সহবতের দরকার নেই, খোশামোদ করে এখানে কিছু লাভ করা যাবে না। এটা হল ক্যাটজেট।

ডাক্তার মেনজিল যেন শুনতে পায় নি। কিছু বলল না। আমি একটু ঘাবড়ে গেলুম। ডাক্তারটা একটা বন্দী। ক্যাম্প চিফের

সামনে এমনভাবে কথা বলতে সাহস পায় কি করে? ছদ্মবেশী কোনো বড় অফিসার নয় তো?

সেই গার্ড মস মস করে এগিয়ে চলল। আমি তাকে অনুসরণ করতে লাগলুম। আমরা আর একটা ব্যারাকে ঢুকলুম। দরজায় লেখা আছে "বাথস অ্যাণ্ড ডিসইনফেকসান"; স্নান এবং নির্জীবাণুকরণ।

আমাকে এবং আমার কার্ড আর একজন গার্ডের জিম্মা করে দেওয়া হল। এই নতুন গার্ড আমাকে আর একটা ঘরে নিয়ে গেল।

আমাকে দেখেই একজন বন্দী এগিয়ে এল। আমার ডাক্তারী ব্যাগটা আমার হাতেই ছিল। বন্দী ব্যাগটা আমার হাত থেকে নিয়ে একটা টেবিলের ওপর রেখে মাথার ওপর জোর একটা আলো জ্বেলে ব্যাগটা খুলে পরীক্ষা করতে লাগল।

ব্যাগ পরীক্ষা শেষ হলে আমাকে সার্চ করতে আরম্ভ করল। প্রথমে আমার দেহের ওপর হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখতে লাগল। তারপর আদেশ করল জামা কাপড় সব খুলে উলঙ্গ হও। আমি বিনা বাক্য ব্যয়ে উলঙ্গ হলুম। একজন নাপিত এসে আমার মাথা ও সারা দেহ কামিয়ে নির্লোম করে দিল। চুলের ভেতরে কোথাও যেন উকুন লুকিয়ে না থাকে। উকুন হল টাইফাস রোগবাহী। টাইফাস ছোঁয়াচে রোগ। টাইফাসকে এরা ভয় করে। সৈন্যবাহিনীতে এই রোগ একবার ঢুকলে আর রক্ষা নেই।

এরপর আমার নেড়া মাথায় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন বেশ করে ঘসে দিল। আমার চোখ জ্বালা করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ চাইতেই পারলুম না।

আমার ছাড়া পোশাক নিয়ে গেল। আমাকে একটা তোয়ালেও দেওয়া হয় নি। আমি উলঙ্গ হয়েই দাঁড়িয়ে আছি। যে আমার ছাড়া পোশাক নিয়ে গিয়েছিল সে আমাকে এক প্রস্থ পোশাক এনে দিল, ফুল প্যাণ্ট, আণ্ডারওয়ার, শার্ট, জ্যাকেট ও মোজা।

পুরনো পোশাক, কিন্তু লণ্ড্রিতে কাচা ও ইস্ত্রি করা। আমার নিজের জুতো জোড়াই ফিরিয়ে দিল তবে সেটাকে একটা ট্যাংকে ক্যালসিয়ম ক্লোরাইডের সলিউশনে ডুবিয়ে দেওয়া হল। পোশাকটা আমাকে ভালই ফিট করল। কে জানে কোন হতভাগ্যের পোশাক।

ডাক্তার মেনজিলকে ধন্যবাদ। ডাক্তার সেণ্টকেলারের মতো আমাকে কয়েদির উর্দি দেওয়া হয়নি।

ইতিমধ্যে আর একজন বন্দী এসে আমার বাঁ হাতের আস্তিন গুটিয়ে দিয়েছে। তারপর কার্ড থেকে আমার নম্বর দেখে নীল কালি ভরা হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জের মতো একটা যন্ত্র দিয়ে আমার হাতে নম্বর ফুটিয়ে দিতে লাগল। টাটু মার্ক অর্থাৎ উলকি আর কি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নীল ফুটকি ফুটকি চিহ্ন আমার হাতে ফুটে উঠল।

সে বলল: ভয় পেয়ো না। হাতটা দিন কতক একটু ফুলে থাকবে তারপর সপ্তাহখানেকের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

তা আমিও জানি কিন্তু আমার হাতে নম্বরটা থেকে যাবে। ওটা আর উঠবে না।

আমি আর ডাক্তার মিকলস নিজলি নয়। এখন থেকে আমি একজন কে জেড বন্দী। আমার নম্বর এ-৮৪৫০।

তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়ল পনেরো বছর আগে একটি দিনের কথা। সেদিন ব্রেসল-এর ফ্রেডরিক উইলহেলম বিশ্ববিদ্যালয়ের মডিকেল স্কুলের রেকটর আমার হাতে মেডিকেল ডিপ্লোমাটি তুলে দিয়ে আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করে আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন জীবনে উন্নতি কোরো, আমাদের সকলের শুভেচ্ছা রইল।

তখনও আমার ছুটি হয় নি। তবে আমি এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলুম যে আমাকে আপাততঃ মেরে ফেলা হচ্ছে না। আমাকে কোনো

ডিউটি দেওয়া হবে। আমার স্ত্রী ও কন্যা আপাততঃ মরছে না বোধ হয়, তাদের কুলি মজুরের মতো খাটিয়ে নেবে।

ডিউটি দেওয়া ছাড়া এদের উপায় কি? লোক তো নেই। তিন চার বছর যুদ্ধে তো অনেক ডাক্তার মরে গেছে। সারা জার্মানিতেই এখন পুরুষ কম। ফ্রণ্টে যাবার জন্যে পনেরো বছরের ছেলেদের ডাক পড়ছে।

আমাকে আবার ডাক্তার মেনজিলের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। জার্মানির কোনো শহরেও আমাকে পাঠান হতে পারে। অনেক হাসপাতালে ডাক্তার নেই। সেই শহরে যে প্যাথলজিস্ট এবং ফোরেনসিক মেডিসিনের ডাক্তার ছিল তাকে মিলিটারি ডিউটিতে পাঠান হয়েছে।

জার্মানির শহরে? দুশ্চিন্তা হল। সেখানকার মানুষ একজন জু ডাক্তারকে কি সহ্য করবে?

ডাক্তার আমাকে অনেক কথা বলতে লাগল। ক্যাটজেট ক্যাম্পের বিভিন্ন বিভাগের কথা, ব্যারাক চিফদের ডিউটি, তাদের নাম, কি খাবার দেওয়া হয়। ব্যারাকের হাসপাতালের কথা ইত্যাদি।

ডাক্তারের কথা শুনতে শুনতে রাত্রি বারোটা বেজে গেল। আমি ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হলেও ডাক্তারের মুখে নতুন কথা শুনতে শুনতে কিছু অনুভব করি নি।

ডাক্তার বলল এই অসউইজ ক্যাম্প হল একদিক দিয়ে বৃহত্তম। সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক মানুষ খতম করবার ব্যবস্থা এই ক্যাম্পে আছে। প্রতিদিন ব্যারাকে ও হাসপাতালে কি ও কিভাবে মানুষ বাছাই অর্থাৎ 'সিলেকশন' করা হয় সে বিষয়েও কিছু বলল।

প্রতিদিন শতশত নরনারী বাছাই করে তাদের লরি ভর্তি করে কয়েকশ' গজ দূরে একাধিক ক্রিমেটোরিয়মে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তারা আর ফিরে আসে না।

একদিনে শতশত নরনারী? কি সর্বনাশ! আমি শিউরে উঠলুম। ডাক্তার কিন্তু নির্বিকার। যেন ফুটবল খেলার বিবরণী বলছে।

ব্যারাকগুলির অবস্থা কি রকম? ডাক্তার নিজেই বলল: বলল সবই দেখতে পাবে। প্রতি ব্যারাকে এক একটা ঘরে আটশ থেকে হাজার মানুষ থাকে। মেঝেতেই শোয়। সবাই পাশাপাশি। এক জনের মাথা যদি থাকে পূব দিকে তাহলে তার পাশের লোকের মাথা থাকে পশ্চিম দিকে। জায়গা তো নেই। এইভাবে তারা শোয়। একজন তার পা তুলে দেয় আর একজনের মাথায় বা বুকে। এই নিয়ে ঝগড়া খামচাখামচি লেগেই আছে। মারামারি করতে দেওয়া হয় না। ওরা আর মানুষ নেই, ভেড়ার পাল।

আরাম করে আর লাভ কি? আরাম করতে দিলেই মরতে ভয় পাবে। আর ঘুমোবার সময়ই বা কোথায়? রাত্রি তিনটে বাজলেই তো বিউগল বাজবে। তখনি উঠে পড়তে হবে। উঠতেই হবে।

কারণ বিউগল বাজার সঙ্গে সঙ্গে শক্ত রবারের তৈরি মুগুর হাতে নিয়ে গার্ডরা এসে পড়বে। যারা তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি তাদের মুগুর পেটা করবে, করেও অনেককে।

তারপর তাদের ব্যারাকের বাইরে যেয়ে দাঁড়াতে হবে। ওদেরই মধ্যে কাউকে ভার দেওয়া থাকে। সে উচ্চতা অনুসারে পরপর দাঁড় করিয়ে দেয়। কারও কারও ঘুম ভাল করে ভাঙেনি। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঢুলতে থাকে, কেউ হয় তো বসে পড়ে।

এরপর আসে একজন ডিউটি গার্ড। যারা ঢুলছে বা বসে পড়েছে তাদের সে চড় চাপড়, থাপ্পড় বা কিল ঘুঁসি লাগিয়ে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেয়। লম্বা লোকদের পিছিয়ে দেয় যদি তাদের চোখে চশমা থাকে। কারণ কি? কেউ বলতে পারে না। এই নাকি অলিখিত নিয়ম।

এরপর আসবে ব্যারাক লিডার। এও একজন বন্দী তবে উর্দি

পরিষ্কার। রোজ কাচা ও ইস্ত্রি করা হয়। সে প্রত্যেককে একবার দেখে যাবে। কোনো খুঁত চোখে পড়লে খাপ্পড়।

এই হল কে জেড ক্যাম্প। এইভাবে এখানকার কাজকর্ম চলে। না এখনও শেষ হয় নি। বাকি আছে। এরপর হবে গুনতি মিলান। প্রথমে ডান দিক থেকে বাঁ দিক, তারপর লাইন ভাঙা হবে। লম্বা বা বেঁটে লোক সামনে দাঁড়াবে, তার পিছনে উচ্চতা অনুসারে আরও বন্দী দাঁড়াবে। তাদের আবার গুনতি হবে।

গুনতি মিলান হতে হতে কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে যায়। লোকগুলো ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর। গায়ে তো পাতলা উর্দি। এপ্রিল মাস হলেও পোল্যাণ্ডে তখনও সকালে বেশ শীত।

কি শীত কি গ্রীষ্ম গুনতি মিলান চলবে সকাল সাতটা পর্যন্ত। সাতটার সময় এস এস অফিসাররা আসবে। সবুজ জামা পরে এস এস অফিসারের হুকুমের চাকর ব্যারাক লিডার অফিসারদের রিপোর্ট দেবে। তারপর এস এস অফিসার বন্দীদের পরিদর্শন করবে। প্রতিদিনের সংখ্যা তারা যাচাই করে নিজেদের নোটবুকে লিখে নেবে।

গতরাত্রে যদি কোনো বন্দীর মৃত্যু হয়ে থাকে এবং হয়ও। প্রতিদিন দশজন পর্যন্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়। সেই মৃতদেহগুলিকে হাজির করতে হবে। দু'জন লোক তাদের ধরে দাঁড় করিয়ে রাখবে। উলঙ্গ একটা মড়া মানুষকে কেন যে দাঁড় করিয়ে রাখা তা কে জানে! সে এক বীভৎস দৃশ্য। কিন্তু ডাক্তারের এসব এখন সহ্য হয়ে গেছে।

মাঠে বা অন্যত্র কাজ করতে করতেও কেউ কেউ মরে। গুনতি মিলানের জন্যে তাদের লাস সঙ্গে সঙ্গে আনা যায় না। সময় সময় দু তিন দিন পর্যন্তও দেরি হয়। তা হক। গুনতি মিলানের সময় লাস হাজির করতেই হবে। তারপর বন্দীদের তালিকা থেকে তাদের নাম কাটা হবে।

যাইহক আমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে। ডাক্তার না হলে এরা আমাকে কোনো ডিউটি না দিলে আমার সঙ্গে আর যে ক'জন

ডাক্তার এসেছিল তাদের মতো আমি হয় তো এই বন্দীশালার নরকে হারিয়ে যেতুম কিংবা কোয়ারানটাইন ক্যাম্প ফেরত হয়ে কোন ব্যারাকে হারিয়ে যেতুম কে জানে।

ডান দিকের সেই লাইনের মানুষদের কোয়ারানটাইন ক্যাম্পে এনে তাদের মাথা ও শরীরের লোম কামিয়ে, স্নান ও নির্জীবাণুকরণের পর কয়েদির জামা ইজের পরিয়ে বিভিন্ন ব্যারাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তাদের দ্বারা ক্রীতদাসের মতো কাজ করানো হয়।

আমাকে একটু বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আমাকে অন্যান্য ডাক্তারদের মতো কয়েদির পোশাক পরানো হয় নি। তাই আমি এখনও নিজেকে মানুষ বলে মনে করছি এবং এখানকার মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করবার চেষ্টা করব।

সে রাত্রে আমাকে বারো নম্বর ব্যারাক হাসপাতালের বিছানাতেই শুতে দেওয়া হয়েছিল।

সকাল সাতটায় বিউগল বাজবে। আমার সেকশনের সমস্ত ডাক্তার ও হাসপাতালের কর্মীদের ব্যারাকের বাইরে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে গুনতি মিলানের জন্যে। দু তিন মিনিটের মধ্যেই গুনতি মিলান পর্ব শেষ হয়। তারপর জীবিত ও মৃত সকল রোগী গণনা করা হয়।

ব্রেকফাস্টের সময় আমার সহযোগী ডাক্তারদের সঙ্গে আলাপ হয়। এঁদের মধ্যে দু'জন হলেন ইউরোপের খ্যাতিমান চিকিৎসক। একজন হলেন ডাক্তার লেভি, স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। বারো নম্বর ব্যারাক হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার।

অপর জন হলেন জাগরেব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডাক্তার গ্রাস।

সেরা ওষুধের দেশ জার্মানি কিন্তু এইসব হাসপাতালে ওষুধ নেই, অ্যান্টিসেপটিক নেই, ব্যাণ্ডেজ নেই, সার্জারির জিনিসপত্র এবং অন্যান্য সব সরঞ্জাম আছে সে সবই ত্রুটিপূর্ণ তবুও যা আছে তাই দিয়েই ডাক্তারবাবুরা চেষ্টা করেন।

ব্যারাকে বন্দী রোগীরা তো আগে থেকেই হতাশ হয়ে আছে। তারা ভাবে বাঁচিয়েই বা ডাক্তারবাবু কি করবেন? এই ক্যাটজেট ক্যাম্প থেকে তারা তো কোনোদিনই বেরোতে পারবে না অতএব যত শীঘ্র মৃত্যু হয় ততই ভাল।

কতক রোগী এতই গুরুতরভাবে পীড়িত যে তারা জীবিত বা মৃত বোঝাই যায় না। বাঁচলেই বা কি আর মরলেই বা কি, তারা সম্পূর্ণ উদাসীন।

শক্ত সমর্থ একজন লোক ক্যাম্পে প্রবেশ করার তিন চার সপ্তাহের মধ্যেই কঠোর পরিশ্রম, যৎকিঞ্চিৎ আহার, অনিদ্রা এবং ন্যূনতম স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অভাবে নরকঙ্কালে পরিণত হয়। তাদের আর চেনাই যায় না। তারা মানুষ বলে মনে হয় না।

আর যারা রোগাক্রান্ত বা অসুস্থ হয়ে ক্যাটজেট ক্যাম্পে এসেছে তাদের কথা আর না বলাই ভাল। ডাক্তাররা যথাসাধ্য চেষ্টা করে কিন্তু ওষুধ না পেলে কি করবে?

এতো সাধারণ বন্দীদের কথা। বন্দী ডাক্তারদের অবস্থাই কি ভাল? বিশেষ করে অধস্তন ডাক্তারদের? আমাদের সেকশনে ফরাসী ও গ্রীক মিলিয়ে ছ জন ছোকরা ডাক্তার ছিল। এরা সবাই প্রিজনার অফ ওয়ার। আইন হচ্ছে যে যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে। ভাল খেতে পরতে ও ভালভাবে থাকতে দিতে হবে যাতে নাকি শত্রুপক্ষও জার্মান যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে।

কিন্তু এই অসউইজ ক্যাম্পে ঐ ছ'জন ফরাসি ও গ্রীক ডাক্তারদের কি খেতে দেওয়া হত? গত তিন বছর ধরে তাদের প্রধান আহার হল জংলী বাদামের রুটি যার ওপর স্রেফ করাত গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হত। এই রুটির নাম কে জেড-ব্রেড।

তাদের যখন বন্দী করা হয় তখন তাদের স্ত্রী ও শিশুদেরও বন্দী করে আনা হয়েছিল। কিন্তু তারা এই বিরাট বন্দীশালার 'শিকা

য়েছে। শিশুরা তো কবেই শেষ হয়ে গেছে, তাদের মায়েদেরও চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তবুও এই ডাক্তারেরা তাদের ভাগ্য মেনে নিয়েছে। তারা যথা সাধ্য তাদের ডিউটি করে যায়। এই ডাক্তারেরা জানে যাদের তারা চিকিৎসা করছে তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়।

ঐ সব যুদ্ধবন্দীদের দেখলেই সেই মর্মস্পর্শী উক্তিটি মনে পড়বে, হায়াট ম্যান হ্যাজ মেড অফ ম্যান। মানুষকে মানুষ কী পরিমাণ হীন করেছে!

এইসব যুদ্ধবন্দীদের আর মানুষ বলে চেনাই যায় না। হাড্ডিসার গায়ে পুরু ময়লা জমেছে, দগদগে ঘা, দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ান যায় না। শরীরে রক্ত তো দূরের কথা এক বিন্দু জলও নেই বোধ হয়। আর সকলেই ভুগছে দুরারোগ্য রক্ত আমাশয়, টিবি, হার্ট ডিজিজ এবং তার ওপর আর অন্য কি রোগ কে জানে? জানবার চেষ্টা করলেও জানবার উপায় নেই। জেনেই বা হবে কি? এরা তো খরচের খাতায় তালিকাভুক্ত হয়েই আছে।

এই যে সব ভয়াবহ কনসেনট্রেশন ক্যাম্প এগুলি কিন্তু ১৯৩৯ সালে পোল্যাণ্ড আক্রমণের আগেই শান্তির সময়েই চালু হয়েছিল। এগুলির সংগঠন ও যাবতীয় আইনকানুন তৈরি করার ভার দেওয়া হয়েছিল হিমলারের ওপর।

নাৎসী বিরোধী জার্মান এবং ইহুদিদের এইসব কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে রাখা হত। তখনই এইসব হতভাগ্য বন্দীদের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে ক্যাম্পের কার্যধারা স্থির করে নেওয়া হয়েছিল।

হিটলার ক্ষমতায় এসে দেরি করেনি। ১৯৩৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেনশিয়াল ডিক্রি অর্থাৎ অর্ডিনান্স জারি করা হল যার দ্বারা থার্ড রাইখ 'শুৎসহ্যাফট' চালু করল। যার অর্থ হল নাৎসী শাসন

ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যারা সামান্যমাত্রও প্রতিবাদ বা অসহযোগিতা করবে তাদের জন্যে বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। যার মূলকথা হল যে তাদের ধরে এনে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী করে রাখা হবে।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত এই ছ বছরে হাজার হাজার জার্মানদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল। শুধু জার্মান নয়, জার্মানিতে যে সব বিদেশী ছিল এবং হিটলার পরে যে সব দেশগুলি যেমন অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, রাইনল্যাণ্ড, ইত্যাদি বিনাযুদ্ধে ও রক্তপাতে করতলগত করেছিল, সেই সব দেশেরও বহু বন্দীকে এইসব নরকতুল্য ক্যাম্পে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

এইসব ক্যাম্প থেকে কেউ আর বেরিয়ে আসতে পারেনি। যুদ্ধ শেষে কিছু বন্দীকে মিত্রশক্তি উদ্ধার করেছিল কিন্তু সে আর কত?

থার্ড রাইখের শাসনকালে যে গেস্টাপো ছিল তাদের প্রধান কাজই ছিল এস এস অর্থাৎ স্টর্ম ট্রুপার এবং গার্ডদের সহায়তায় নাৎসী পার্টি বিরোধী বা যে কোনো ব্যক্তিকে সন্দেহ হবে তাকে নির্মূল করে দেওয়া। এইসব নরকে যুদ্ধের সময়ে যে সব নৃশংস কাণ্ড কারখানা চলেছিল তা চরম পরিণতি লাভ করেছিল যুদ্ধের সময়। সে যে কি বীভৎস ব্যাপার তা আমরা ভাবতেই পারি না।

১৯৩৯ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় পর্যন্ত জার্মানিতে এই রকম ছ'টি বর্বর বন্দীশিবির ছিল যেগুলিতে প্রায় মোট কুড়ি হাজার বন্দী ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ছ বছরের মধ্যে আরও ক্যাম্প তৈরি করা হল আজ যেগুলির নাম সকলের মুখে মুখে, যেমন অসউইজ, বেলজেন, বুকেনওয়াল্ড, ফসেনবার্গ, মাউথাউসেন, স্যাৎসবাইলার, নয়েনগাম, র‍্যাভেনসব্রুক, স্যাশেনহাউসেন।

একটা মোটামুটি হিসেবে বলা হয় যে যুদ্ধের সময় এইসব ক্যাম্পে খুব কম করেও প্রায় দেড় কোটি যুদ্ধবন্দী নির্মূল হয়েছে। এর মধ্যে ইহুদিই মরেছে ইউরোপের মোট ইহুদি জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ। এই কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলি ছিল নরহত্যার বিরাট কারখানা।

অসউইজ, ডাচাউ, ট্রেবলিংকা, বুকেনওয়াল্ড, মাউথাউসেন, ডানেক এবং ওরানিয়েনবার্গ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলিতে গ্যাস চেম্বার ছিল। উলঙ্গ হতভাগ্যদের সেই গ্যাস চেম্বারে ভরে একসঙ্গে য়েক হাজারকে হত্যা করে ক্রিমেটোরিয়মে পুড়িয়ে ফেলা হত।

অধিকৃত দেশ থেকে বন্দীদের ধরে এনে এই সব ক্যাম্পে আটক রা হত। উদ্দেশ্য ছিল তাদের ক্রীতদাসের মতো খাটিয়ে নেওয়া। দের মধ্যে ইহুদি তো ছিলই, ছিল রাশিয়ান এবং অন্যান্য দেশের ন্দী, আফ্রিকা থেকে ধরে আনা কিছু ভারতীয়ও ছিল।

বন্দী অবস্থায় তাদের ওপর চলত অমানুষিক অত্যাচার এবং শেষ র্যন্ত হতভাগ্যেরা চিরশান্তি লাভ করত গ্যাস চেম্বারে। বলা হুল্য যে সরকারী ভাবে সবই গোপন রাখা হত। কাঁটাতারের পারে কি হচ্ছে কেউ জানত না।

তবুও কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে যেটুকু খবর বাইরে এসে পৌঁছত াতেই শ্রোতার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হবার উপক্রম হত। মুষ্টিমেয় কজন বেসামরিক কর্মচারী এই সব নরকে চাকরি করত তাদের পর কড়া নির্দেশ ছিল যে তারা বাইরে যেন কিছু প্রকাশ না করে। াসটাপোর ভয়ে তারা মুখ খুলত না।

যুদ্ধ শেষ হবার মুখে জার্মানরা এইসব নরকগুলি নিশ্চিহ্ন করবার ান করেছিল যাতে না কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ামেরিকানরা দ্রুত অগ্রসর হওয়ার ফলে জার্মানরা তাদের কাজ ষ করতে পারে নি। কুকীর্তির প্রমাণ থেকেই গিয়েছিল।

যে সব হতভাগ্যরা বেঁচে গিয়েছিল তারা সাক্ষ্য বা বিবৃতি দেবার র্বেই তাদের অ-মানুষিক চেহারাই বলে দিয়েছিল তারা কি অবস্থায় ল।

সমস্ত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কাহিনী বলার স্থান হবে না। ামরা শুধু অসউইজ ক্যাম্পের বিষয় কিছু বলবার চেষ্টা করব।

অসউইজ বা অসউইস্ত্রিয়েন পোল্যাণ্ডের একটি ছোট শহর।

রাজধানী ওয়ারম থেকে ১৬০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এর অবস্থান জনসংখ্যা বারো হাজার।

যুদ্ধের আগে পোল্যাণ্ডের বাইরে কেউ এই শহরের নাম জানত না। জায়গাটা মোটেই ভাল নয়। চারদিকে পচা ডোবা, নোংরা জলাভূমি, দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত পোকামাকড়যুক্ত ঝোপঝাড়। জমিও ভাল নয়। নানারকম রোগ, মড়ক লেগেই থাকত।

এমন পরিবেশ না হলে কি আর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের উপযুক্ত জায়গা পাওয়া যাবে?

কিভাবে যে শহরটা টিকে ছিল আর কেনই বা ছিল কেউ জানে না। কাছাকাছি জনবসতিও ছিল না। কে আসবে এই জলা জায়গায় বাস করতে? পোলরা বলত ওখানে যাওয়া মানে যমের সঙ্গে বন্ধু পাতানো।

সেইজন্যেই বোধহয় জার্মানরা জায়গাটা বেছে নিল। জার্মানরা এইখানেই স্থাপন করল 'কনজেনট্রেশনল্যাগার অসউইজ' এবং একদিন ওখানে দৈনিক দশ হাজার পর্যন্ত হতভাগ্যকে গ্যাস চেম্বারে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে।

ক্যাম্পের কমাণ্ডাণ্টের হিসেব অনুসারে গ্যাস চেম্বারে এবং অন্য ভাবে এখানে তিরিশ লক্ষ নরনারী ও শিশু হত্যা করা হয়েছে।

ক্যাম্প যখন প্রথম আরম্ভ হয় তখন এখানে একটা পরিত্যক্ত টুব্যাকো ফ্যাক্টরি ছিল। ছ'টা পুরনো ব্যারাক ছিল। এখানে ক্যাম্প স্থাপন করবার ভার দেওয়া হল এস এস অফিসার রুডলফ হস্-এর ওপর। জার্মানি থেকে বদলি করে ১৯৪০ সালের ১লা মে তাকে এখানে আনা হল। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে তাকে নাকি প্রমোশন দিয়ে আনা হয়েছিল। তার প্রধান কাজ হবে বদমাইস পোলদের এই ক্যাম্পে পুরে শায়েস্তা করা। এজন্যে নাকি হস্-এর চেয়ে উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় নি।

তা হস্-এর সে যোগ্যতা ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হস

সাইলেশিয়া এবং আর কোথায় যেন ক্ষেতে খামারে কাজ করত। তারপর ১৯২৩ সালে একজন স্কুল শিক্ষককে খুন করে। দশ বছর জেল হয়, কিন্তু পাঁচ বছর পরে তাকে ক্ষমা করা হয় ও মুক্তি দেওয়া হয়। অথচ তার বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলে পাদ্রী হবে। জেল থেকে বেরিয়ে হস্ ন্যাশানাল সোসালিস্ট জার্মান ওয়ারকারস পার্টিতে যোগ দিয়ে মিউনিখে চাকরি নেয়।

ক্রমে সে এস এস বিভাগে চাকরি পায় এবং "ডেথস হেড" গ্রুপের সভ্য মনোনীত হয় যাদের কাজ হল বন্দীশালা পাহারা দেওয়া।

প্রথমে তাকে ডাচাউ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ডিউটি দেওয়া হয়। তারপর সাসেনহাউসেন ক্যাম্পে।

১৯৪১ সালে হিমলার অসউইজ পরিদর্শনে যায় এবং এই ক্যাম্প সম্প্রসারিত করবার আদেশ দেয়। জলাভূমি ও পুকুর থেকে জল বার করে শুকিয়ে ফেলা হক। জমি বাড়াও। ইতিমধ্যে কাছে বিরকেনো-তে একটা প্রিজনার-অফ-ওয়ার ক্যাম্প করা হয়। সেখানে এক লাখ রাশিয়ান যুদ্ধবন্দী রাখা হয়।

অসউইজ ক্যাম্পেও বন্দীর সংখ্যা বাড়তে থাকে কিন্তু আয়োজন সম্পূর্ণ হয় নি। চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না বললেই হয়। যখন মড়ক লাগত, পিল পিল করে মানুষ মরত।

১৯৪১ সালেই অসউইজ ক্যাম্পে স্লোভাকিয়া এবং আপার সাইলেসিয়া থেকে ইহুদি চালান আসতে থাকে। যারা কাজের অযোগ্য তাদের প্রথমেই গ্যাস-চেম্বারে পুরে হত্যা করা হত। তখন থেকেই ক্রিমেটোরিয়মও চালু হল।

ঐ বছরই হস্‌কে হিমলার বারলিনে ডেকে পাঠান এবং ইহুদিদের সম্বন্ধে হিটলারের নীতি তাকে বুঝিয়ে বলা হল। কিন্তু পাইকারি হারে তখনও ইহুদি নিধনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা যায় নি।

পোল্যাণ্ডে ট্রেবলিংকা ক্যাম্পে কিছু ব্যবস্থা ছিল। সেটা দেখে

আসবার জন্যে হস্‌কে সেখানে পাঠান হল। হস্‌ দেখল সে ব্যবস্থাও উপযুক্ত নয়। তবুও ইতিমধ্যে পোল্যাণ্ডে আশি হাজার ইহুদিকে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করা হয়েছে।

কিন্তু এই গ্যাসিং ব্যবস্থা বাড়াতে হবে। ওয়ারসর ঘেটো জু-মুক্ত করা হচ্ছে। সংখ্যায় অনেক জু। তাদের দ্রুত শেষ করতে হবে। কি করে করা হবে? হিমলার চিন্তিত।

অসউইজ উপযুক্ত জায়গা। কাছাকাছি বড় শহর নেই। চারটে রেললাইনের জংসন আছে। সম্প্রসারণ করবার জমিও আছে প্রচুর।

হস্‌কে আদেশ করা হল চার সপ্তাহের মধ্যে প্ল্যান দাখিল কর। আইখম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করতে বলা হল। আইখম্যান ও হস্‌, উভয়ে মিলে চূড়ান্ত প্ল্যান রচনা করবে।

অতি দ্রুত কাজ চলল। এত বড় গ্যাস-চম্বার তৈরি হল যে একত্রে দু'হাজার ব্যক্তিকে সেই চেম্বারে পোরা যাবে এবং ...। সে কথা থাক।

যুদ্ধের পরে নুরেমবার্গে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের সময় এই রুডলফ হস্‌ সাক্ষ্য দিয়েছিল। হস্‌কে পরে অন্যত্র বদলি করা হয়েছিল। কর্মসূত্রে সে বিভিন্ন বন্দীশালা পরিদর্শন করত। তার সাক্ষ্য থেকে বন্দীশালাগুলির অনেক নারকীয় ঘটনা জানা গিয়েছিল।

বিচারের পর হস্‌কে পোলদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা তার বিচার করে ফাঁসির হুকুম দেয়। ঐ অসউইজ ক্যাম্পেই ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

হস্‌ তার সাক্ষ্যে বলে গেছে:

The 'Final solution' of the Jewish question meant the complete extermination of all Jews in Europe. I was ordered to establish extermination facilities at Auschwitz in June 1941. At that time

there were already in the General Government of Poland three other extermination camps : Belzen, Trebelinka and Walzek···

I visited Trebelinka to find out how they carried out their extermination. The camp commander at Trebelinka told me that he had liquidated 80,000 in the course of half a year. He was principally concerned with liquidating all the Jews from the Warsaw ghetto.

He used monoxide gas and I did not think that his methods were very efficient. So when I set up extermination building at Auschwitz, I used Zyklon B, which was a crytallized Prussic acid which we dropped into the death chamber, depending upon climatic conditions.

At Auschwitz we endeavoured to fool the victims into thinking that they were to go through delousing process. Of course, frequently they realized our true intentions and we sometimes had riots and difficulties. Very frequently women would hide their children under the clothes but of course when we found them we would send the children in to be exterminated.

We were required to carry out these exterminations in secrecy, but of course the foul and nauseating stench from the continuous burning of bodies permited the entire area and all of the people living

in the surrounding communities knew that exterminations were going on at Auschwitz.

হস্ বলছে যে বিশেষ বন্দী বিশেষ করে রাশিয়ান বন্দীদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হত। তাদের স্রেফ বেঞ্জিন ইঞ্জেকশন দিয়েই হত্যা করা হত।

অসউইজ কনসেনট্রেশন ক্যাম্প সম্পূর্ণ ও চালু হয়ে যাবার পর থেকেই ইহুদি ও বন্দীবাহী কনভয়ের সংখ্যাও বাড়তে লাগল। বাড়তি ক্রিমেটোরিয়ম তৈরি হল।

যে সব বন্দী কাজ করবার উপযুক্ত তাদের মাথা নেড়া করবার, স্নান করবার ও নির্জীবাণুকরণের জন্যে ঘর তৈরি হল। সেই ঘর ও গ্যাস চেম্বারের সামনে ফুলের বাগান করা হল। দেখে বোঝার উপায় নেই ভেতরে কি বীভিষিকা তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

প্রথম ঘরের নাম ছিল ডিসইনফেকটিং চেম্বার। এই ঘরে ঢোকবার আগে বন্দীদের সমস্ত জামাকাপড় খুলে নেওয়া হত। পরে তাদের কয়েদিদের উর্দি দেওয়া হত।

আর যারা কাজের অযোগ্য, অথর্ব, পঙ্গু, যাদের মেরে ফেলা হবে, জামাকাপড় খুলে নিয়ে আর ডিসইনফেকটিং চেম্বারে পাঠান হত না। তাদের সোজা গ্যাস চেম্বারেই পাঠান হত এবং কিভাবে সাইক্লন-বি গ্যাস প্রয়োগ করে হত্যা করা হত তা হস্ তার সাক্ষ্যে বলেছে।

আধঘণ্টা পরে গ্যাস চেম্বারের দরজা খোলা হত। মৃতদেহ থেকে সোনার আংটি ও বাঁধানো সোনার দাঁত খুলে নেওয়া হত। সেগুলি রাইখস ব্যাংকে জমা দেওয়া হত।

এবার লাস সরাবার পালা। এসব কাজ বন্দীরাই করত। একটা পৃথক দল ছিল। সেই দলের নাম ছিল সনডারকমাণ্ডো। তারাই লাস তুলে নিয়ে ক্রিমেটোরিয়মের গহ্বরগুলি বোঝাই করত। একশটা লাস বোঝাই হলে কাঠ আর তরল প্যারাফিন দিয়ে ভেজানো ন্যাকড়া গুঁজে আগুণ ধরিয়ে দেওয়া হত।

লাসগুলো পুড়ে গেলে আরও লাস চাপানো হত। পোড়া দেহ থেকে যে গলিত চর্বি বেরিয়ে আসত সেই চর্বি বালতিতে ধরে আবার আগুনের ওপরেই ঢেলে দেওয়া হত। ক্রিমেটোরিয়মের বাইরেও অরণ্যের মধ্যে মাটি খুঁড়ে লম্বা লম্বা খাল তৈরি করে তার মধ্যে লাস বোঝাই করে কাঠ ও পেট্রল বোঝাই করে লাস জ্বালানো হয়েছে।

এক একটা ক্রিমেটোরিয়মের কাজ ৬।৭ ঘণ্টা পর্যন্ত চলত। দুর্গন্ধে টেকা দায় হত। তারপর সমস্ত গহ্বর পরিষ্কার করে ছাই বার করে নেওয়া হত। হাড় গোড় যা পাওয়া যেত তা গুঁড়ো করে লরি বোঝাই করে ভিসচুলা নদীতে বিসর্জন দেওয়া হত।

যারা ক্যাম্প এলাকার মধ্যে কাজ করত তাদের মধ্যে অনেকে অনাহার ও নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে 'আত্মহত্যা' করত। অথচ 'আত্মহত্যা' করবার কোনো সুযোগ ছিল না।

তারা কাজ করতে করতে হঠাৎ দৌড় লাগাত যেন পালিয়ে যাচ্ছে। সেন্ট্রি থামতে বললেও থামত না। সেন্ট্রি অগত্যা গুলি চালাত, 'শুট টু কিল', অর্ডার দেওয়াই থাকত।

যারা কাঁটা তারের বেড়ার কাছে কাজ করত, তারা হঠাৎ লাফিয়ে গিয়ে তীব্র বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবাহিত কাঁটাতারের বেড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ত। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।

মরতে তো হবেই গ্যাস-চেম্বারে; এইভাবে আত্মহত্যা করে তারা নির্যাতনের দিনগুলি কমিয়ে নিত আর কি!

তাই অসউইজ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের নাম হয়েছিল 'ডেথ ক্যাম্প'। দান্তের ইনফার্নো-এর প্রবেশপথে তবুও একটু ভাল কথা লেখা ছিল; যারা এখানে প্রবেশ করবে তারা সকল আশা ত্যাগ কর।

অসউইজ নরকের বর্ণনা আপাতত বন্ধ থাক। আরও কত যে বীভৎস কাণ্ড ঘটত তার পরিচয় ক্রমশঃ পাওয়া যাবে। গা ঘিন ঘিন

করে, বিশ্বাস করাও যায় না কিন্তু এমন নিষ্ঠুর ও অমানুষিক কাণ্ডও ঘটেছে এই সভ্য জগতে এবং ঘটিয়েছে তারাই যারা নাকি নিজেদের শুদ্ধ আর্য বলে দাবি করে।

আমরা আবার ডাক্তার মিকলস নিজলির কথায় ফিরে যাই।

আমাকে তখনও নির্দিষ্ট কোনো কাজ দেওয়া হয় নি। যখন যে রকম আদেশ পাই সেই রকম কাজ করি। কাজে তখনও মন বসেনি। এ তো আর চাকরি নয় যে মন বসবে? আমি তো বন্দী? কোন দিন এঁদের দয়া হবে সেদিন আমাকে খারিজ করে দেবেন এই ক্যাম্পের বাইরে আমাকে বেরোতে হবে না।

অবস্থা যা বোঝা যাচ্ছে তাতে জার্মানি এখন পরাজয়ের মুখে। এরা যদি আমাদের এখন বাঁচিয়েও রাখে তাহলেও পালাবার মুখে আমাদের সকলকে নিশ্চয়ই মেরে রেখে যাবে যাতে বেঁচে সভ্য জগতে ফিরে যেয়ে এই নরকের কাহিনী প্রকাশ করতে না পারি।

ক্যাম্পের ভেতরে কোথায় নাকি 'টোটেনবুশ' অর্থাৎ একখানা মোটা 'ডেথবুক' আছে। তাতে হয় তো আমাদের নাম লেখা হয়ে গেছে।

একদিন একজন ফরাসি ডাক্তারের সঙ্গে রাউণ্ডে বেরিয়েছি। একটা কে-জেড ব্যারাকের ধারে একটা অ্যানেক্স চোখে পড়ল। ব্যারাকটা থেকে একটা ছোট অংশ বার করে দেওয়া হয়েছে। চোখে পড়ে, কারণ এমন অ্যানেক্স আর কোনো ব্যারাকে নেই। বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছে এটা একটা ছোট কারখানা বা গুদোম ঘর, যন্ত্রপাতি থাকে বোধহয়।

ফরাসি ডাক্তার বলল, তা নয় ভেতরে চল।

ভেতরে ঢুকলুম। ঘরে ঢুকে দেখলুম বেশ বড় এবং বেশ উঁচু একটা টেবিল রয়েছে আর রয়েছে তেমনি উঁচু একটা চেয়ার।

টেবিলের একধারে এনামেলের একটা ট্রে। ট্রে-এর মধ্যে রয়েছে লাস চেরাইয়ের ছুরি ও অন্যান্য অস্ত্র। এক কোনে এক জগ জলও রয়েছে।

বুঝতে পেরে তবুও আমি ফরাসি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলুম এ ঘরে কি হয়?

কারণ আমার মনে সন্দেহ ছিল এই ক্যাম্পে ময়না তদন্ত করার দরকারটা কি? কি জন্যে পোস্টমর্টেম করা হবে? সবাইকে তো মারবার জন্যেই আনা হয়েছে!

ফরাসি ডাক্তার অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চাইল। বলল, বুঝতে পারলে না, এটা হল ডিসেকটিং রুম। ঘরখানা অনেকদিন ব্যবহার করা হয় নি, লোক নেই তো, পড়ে আছে, তোমাকে হয় তো এই ঘরের ভার দেবে। মেনজিলের তাই হয়তো মতলব। তোমার তো এই কাজ জানা আছে।

ডাক্তারের কথা শুনে আমার গা ঘিন ঘিন করে উঠল। গ্যাস-চেম্বারে মৃত নিরীহ জাতভাইয়ের লাস আমাকে চেরাই করতে হবে? তার ওপর ওই রকম আলো-বাতাসহীন বিশ্রী একটা ঘরে যেখানে তখনই আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে? তার ওপর এই পুরনো মর্চে ধরা ছুরি দিয়ে?

কিন্তু কি আর করা যাবে। যদি আদেশ হয় তো আমাকে এখানেই থাকতে হবে। ওদের দয়ার ওপর আমাকে নির্ভর করতে হবে। যদি এখানে আমাকে লাস চিরতেই হয়, তাহলে মনে হয় এখানে ঝামেলা কম। ছুরিতে মর্চে পড়েছে? মড়া লোকের দেহে কোনো আঘাত লাগবে না।

এখানে আমি বন্দী। আমার কোনো স্বাধীনতা নেই। কাঁটা-তারের ওপারে নজর পড়ল। কয়েকটা বেশ বড় উলঙ্গ ছেলেমেয়ে ফাঁকা মাঠে খেলা করছে, ছুটছে, লাফাচ্ছে, হাসছে। রঙিন ঘাঘরা পরা একপাল মেয়ে ও খালি গায়ে একদল পুরুষ ইতস্ততঃ বিচরণ করছে। জমিতে কিছু খুঁজছে। এরা মুক্ত, স্বাধীন।

না, ঠিক হল না। এরা খোলা মাঠে থাকলেও স্বাধীন নয়। মুক্ত আকাশের নীচে থাকলেও এদের ওপরে নজর রাখা হচ্ছে। এরা হল জিপসি। ওটা হল 'জিপসি ক্যাম্প'।

জার্মানির নৃতাত্ত্বিকরা জিপসিদের হীন জাতি মনে করে। জার্মানি এবং অধিকৃত সমস্ত দেশগুলি থেকে ওদের ধরে এনে এখানে জমায়েত করা হয়েছে। এখানে ওদের সংখ্যা সাড়ে চার হাজার। ওদের একটা কাজ দেওয়া হয়েছিল, ইহুদিদের ওপর নজর রাখা। কিন্তু সে কাজে ওরা ব্যর্থ হওয়ায় এখন ওদের কোনো কাজ নেই।

তবে বর্তমানে এখানে ওদের ওপর একটা পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। না, জিপসিদের উৎপত্তি নিয়ে নয়। বিশেষ রোগ নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছেন প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং শিশু রোগের ডঃ এপস্টিন, জগৎবিখ্যাত চিকিৎসক।

ডঃ এপস্টিন ১৯৪০ সাল থেকে জার্মানদের বন্দী। এখানে তাঁর একজন সহকারী আছে, ডঃ বেনডেল, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক।

জিপসিদের মুখে একরকম ঘা হয়। তাকে বলে ড্রাই গ্যাংগ্রিন। শিশু এবং বয়স্ক উভয়ের মুখেই এই বিশ্রী ঘা হয়। আর কোনো জাতির মুখে এই ঘা হয় না। শুধু জিপসিদের মুখেই এই ঘা হয় কেন? এই নিয়ে ডঃ এপস্টিন এবং ডঃ বেনডেল রিসার্চ করছেন।

এ ছাড়া যমজ সন্তান, বামন বা বিরাটকায় শিশু জন্ম বিষয়েও ওরা রিসার্চ করছেন। তারপর ম্যালেরিয়া নিবারণের ইঞ্জেকশন নিয়েও এঁরা কাজ করছেন? কি একটা ওষুধও আবিষ্কার করেছেন। এঁদের শুধু আটকে রাখা হয়েছে। বন্দীর মতো ঠিক ব্যবহার করা হয় না। বন্ধনের মধ্যেও কিছু স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

ডাক্তার মেনজিল রোজ একবার আসে। ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে। রিসার্চের অগ্রগতি সম্বন্ধে খোঁজ নেয়। ডাক্তারদের সঙ্গে একজন মহিলা শিল্পীও আছে। নাম ডিনা। প্রাগ শহরের মেয়ে।

সে ডাক্তার মেনজিলের সেক্রেটারির কাজ করে, অবশ্য পার্টটাইম, তাই তারও কিছু স্বাধীনতা আছে।

আর এই ডাক্তার মেনজিল লোকটা তো ভীষণ পরিশ্রম করতে পারে! ক্যাম্পে রাউণ্ড দিতে হয়। ল্যাবরেটরিতে অনেক সময় কাটাতে হয় তারপর ট্রেন ভর্তি বন্দী এলে তো আর কথাই নেই। একখানা ট্রেন এলেই তার ঠেলা সামলাতে বিকেল হয়ে যায়। সে সব ঝামেলা মিটিয়ে রিপোর্ট লেখা, খাতাপত্তর দেখা, লোকজনকে কাজ বোঝানো, কাজ বুঝে নেওয়া, পঞ্চাশ রকম ঝামেলা। রাতে শুতে শুতে বারোটা বেজে যায় আবার ভোরে উঠতে হয়। ডাক্তারও তো আমাদের মতোই একরকম বন্দী। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে চাকরি মানে শাস্তি ভোগ করা।

ডিসেকশন রুম দেখে আমি রেল লাইনের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। একটা কনভয় এসেছে। বন্দীদের নামিয়ে সারবন্দী দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই বন্দীরা বোধ হয় কোনো বড় শহর থেকে এসেছে। সকলের গায়ে বেশ দামী স্যুট। স্যুটকেসগুলিও বেশ ভাল। এদের চেহারা ভাল। কিন্তু কালই এরা ভেড়ার পালের সঙ্গে মিশে যাবে। বাঁ হাতে একটা নম্বর ব্যতীত এদের আর কোনোও পরিচয় থাকবে না। সাতদিন পরে তো এদের আর চেনাই যাবে না।

এদের অপরাধ কি? মানুষ খুন করেছে? ডাকাতি করেছে? না, ওসব কিছুই নয়, এরা ইহুদি, ওদের ভুল হয়ে গেছে যে এরা ইহুদি হয়ে জন্মেছে।

ডাক্তার মেনজিল এখনও এসে পৌঁছয় নি। আমাকে একজন এস এস গার্ড দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল:

তুমি কাল এসেছ না? তোমার নাম কি নিজলি? তুমি কি ডাক্তার?

কেন? হ্যাঁ আমি ডাক্তার নিজলি। কি হয়েছে?

তোমাকে তো ডাঃ মেনজিল খুঁজছে। তুমি ঐ ডিসেকশন রুমে যাও।

গার্ড আঙ্গুল দিয়ে ডিসেকশন রুম দেখাতে আমি বললুম ডিসেকশন রুম আমি চিনি। ঐখান থেকেই তো আসছি।

তাহলে এলে কেন? শীগগির যাও। তোমার জন্য ডাক্তারের অপেক্ষা করবার সময় নেই। চল আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি নইলে আবার কোনদিকে চলে যাবে। চল, কুইক মার্চ।

আমরা যখন ডিসেকটিং রুমের দরজায় যেয়ে পৌঁছলুম তখনি কয়েকজন বন্দী চার চাকার একখানা গাড়ি টানতে টানতে নিয়ে এসে গেটের সামনে দাঁড়াল।

ডাক্তার মেনজিলও এসে গেছে। গাড়িতে দুটো লাস রয়েছে। বন্দীদের ডাক্তার আদেশ দিল লাস দুটোকে লাসকাটা টেবিলে তুলে দিতে। দু'টো লাসেরই বুকে খড়ি দিয়ে লেখা রয়েছে 'জেড' এবং 'এস' যার অর্থ হল এদের চিরতে হবে। ডাক্তারও আমাকে সেই নির্দেশ দিল এবং একজন বন্দীকে বলল আমাকে সাহায্য করতে। ডাক্তার চলে গেল।

আমি ও সেই বন্দী তখনই কাজে লেগে গেলুম। বন্দীটি বেশ বুদ্ধিমান। আমার নির্দেশ ঠিক ঠিক বুঝতে পারছে। নিশ্চয়ই বেশ শিক্ষিত। লেখাপড়া জানে

একটা লাস আমরা ধরাধরি করে নামিয়ে রাখলুম। যে লাসটা নামিয়ে রাখলুম সেটা দেখেই বেশ বোঝা গেল যে এ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছে। মাঝে মাঝে চামড়া পুড়ে কালো হয়ে গেছে আর সেই পোড়া জায়গায় চারদিকে হলদেটে-বাদামী দাগ।

হয় লোকটা কাঁটাতারের বেড়ার হাই-টেনশন অয়ারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কিংবা কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। ক্যাট্‌জেট ক্যাম্পে এই দুই রকম ঘটনাই ঘটে।

যে লাসটা আমরা লাসকাটা টেবিলের ওপর রেখেছিলুম এবার

দিকে নজর দিলুম। গলায় কালসিটের দাগ। এ ক্ষেত্রেও ই হতে পারে। হয় সে নিজে ঝুলে পড়েছিল কিংবা কেউ ঝুলিয়ে দিয়েছিল।

কেলে যখন গুনতি মিলান হবে তখন এই দুজন হতভাগ্যকে ত বলে ঘোষণা করা হবে তা সে আত্মহত্যাই হক আর খুনই তারপর লাস চালান করে দেওয়া হবে মর্গে। ডাক্তার যদি া কারণে দরকার মনে করে তখন লাস চিরে দেখা হবে, নয় তো টারিয়মে পুড়িয়ে ফেলা হবে।

াক্তার মেনজিল যে লাস দুটো আমাকে দিয়ে গেল এই হল আমার প্রথম কাজ এবং প্রথম লাস চেরাই। যাবার আগে ক ডাক্তার বলে গেল আমি যেন বেশ মন দিয়ে ও সযত্নে কাজ যেন বেশ পরিষ্কার কাজ হয়।

ামি একবার বলতে গিয়েছিলুম যে উত্তমরূপে কাজ করবার স্ত্র বা সরঞ্জাম তো কিছুই নেই এখানে, ছুরিতে ধার আছে কি ও জানি না।

ন্তু বলতে গিয়ে থেমে গেলুম। কে জানে কি প্রতিক্রিয়া তবে মেনজিল তো ডাক্তার। কাজ দেখলে নিশ্চয়ই বুঝতে আমার অসুবিধা কোথায় হয়েছিল। আমি ডাক্তারকে শুধু যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

নালা দিয়ে দেখতে পেলুম বাইরে গেটের সামনে একটা এসে থামল। দু'জন সিনিয়র এস এস অফিসার গাড়ি নামল। সমস্ত রক্ষীরা স্ট্যাচুর মতো নিশ্চল অ্যাটেনশন দাঁড়াল। সঙ্গে ডাক্তার মেনজিলও এসেছে। ডাক্তার কিছু বলল। আমি শুনতে পেলুম না কিন্তু আমার সহকারী ক ফিস ফিস করে বলল: ওরা তোমার কাজ দেখতে ।

ক তাই। এস এস অফিসার দুজনকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার

মেনজিল ডিসেকশন রুমে ঢুকল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ক্যাম্পের বাকি ডাক্তাররাও এসে হাজির।

সকলে মিলে লাসকাটা টেবিল ঘিরে এমনভাবে উৎসুক দাঁড়াল যে এটা যেন মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি হল। অ্যানাটমির প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নিচ্ছি, ওরা যেন ছাত্র।

অথবা টেবিলে যে লাসটা পড়ে রয়েছে তার যেন রহস্যজ কোনো ব্যাধিতে মৃত্যু হয়েছে। এখন লাস চেরাই করে দেখা কিসে তার মৃত্যু হল। ইণ্টারেস্টিং কেস। তাই ডাক্তাররা দে এসেছে!

ব্যাপারটা আমার মাথায় ঠিক ঢুকল না কারণ ডাক্তার নিয়ে এস এস অফিসাররা এবং হয় তো বন্দী ডাক্তাররাও জানে কি এই হতভাগ্য দু'জনের মৃত্যু হয়েছে তবুও তারা কি জানতে চায়

মনটা ফস ফস করছিল। ডিসেকশনের আগে আমি এ সিগারেট খেয়ে থাকি তারপর অ্যান্টিসেপটিক সাবানে বেশ করে ধুয়ে দু'হাতে গ্লাভস পরে কাজ আরম্ভ করি। এপ্রনটা অবশ্য আগেই গায়ে চড়ানো থাকে।

এখানে কোথায় বা এপ্রন, কোথায় বা গ্লাভস আর সিগারে তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না তবে হাত ধোবার জন্যে একটা কার্বলি সোপ আছে।

কার্বলিক সাবানে হাত ধুয়ে আমি প্রাথমিক কাজ আরম্ভ দিলুম। মাঝে বেশ কিছুদিন বাদ গেছে। রাজনীতিক গণ্ডগো জন্যে কাজকর্ম বন্ধ ছিল। তারপর কয়েকমাস আগে গ্রেফতার ইস্তক ছুরি ধরবার সুযোগ হয় নি।

তবুও মনে সাহস আছে। বোরোসোলো ইনস্টিটিউট ফোরেনসিক মেডিসিন-এ আমি কাজ শিখেছি। প্রফেসর স্ট্র্যাসম তিন বছর ধরে আমাদের যত্ন করে কাজ শিখিয়েছেন। নানা কেস ডিসেকশন করবার পদ্ধতি আমরা শিখেছি। এখানে

ইজ ক্যাম্পে আমি না হয় প্রিজনার ডক্টর, নম্বর এ-৮৪৫০, কিন্তু আমি তো ডাক্তার।

প্রথমে স্কাল, তারপরে থোরাক্স তারপর অ্যাবডোমেন খুলতে আমি দেহের ভেতরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উত্তমরূপে সরিয়ে য় লক্ষ্য করতে লাগলুম।

এস এস অফিসার দুজন কি ডাক্তার? ওরা মাঝে মাঝে কে প্রশ্ন করছিল। তবে তাদের চোখ মুখের ভাবভঙ্গি ও দের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় লক্ষ্য করে বুঝলুম যে ওরা আমার সন্তুষ্ট হয়েছে। তাহলে ওরা আমাকে পরীক্ষা করতেই ছিল।

আমি নিজেও অবাক হয়ে গেলুম। এই অকিঞ্চিতকর অস্ত্র ও মের সাহায্যে আমি দু'টো লাস কি করে সফলভাবে চেরাই ম!

মার কাজ শেষ হল। ডাক্তার মেঙ্গিল আর সকলকে নিয়ে যাবার আগে আমাকে রিপোর্ট তৈরি করে রাখতে বলল। ন লোক এসে সেই রিপোর্ট নিয়ে যাবে।

রের দিন তিনটে লাস এসে হাজির এবং কিছু পরেই ডাক্তার দল সমভিব্যাহারে সেই দু'জন এস এস অফিসার এবং বন্দী-রা।

জ আর আমাকে ওরা বিশেষ বিরক্ত করে নি বরঞ্চ মাঝে মাঝে প্রশংসাই করছিল। তাদের প্রশংসা আমি ভাল মনে নিতে লুম না কারণ এখন ওরা দায়ে পড়ে আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে তার পর কাজ ফুরোলেই পাজি।

মার হাতে নম্বর পড়ার পর আমি জেনে গিয়েছিলুম যে আমি সনডারকমানডোভুক্ত বন্দী হয়ে গেছি যাদের জীবনের মেয়াদ স মাত্র। চার মাস হয়ে গেলেই তাকে গ্যাস-চেম্বারে পাঠিয়ে হবে।

এমন কি গ্যাস-চেম্বারে ও ক্রিমেটোরিয়মে যারা কাজ তাদেরও ভাগ্য এইভাবেই স্থির হয়ে থাকে।

সেদিনেরও কাজ মিটল। তারা দেখল যে অপ্রতুল সরঞ্জাম কাজ করতে আমার খুবই অসুবিধে হচ্ছে কিন্তু তবুও তারা মন্তব্য করল না। ডাক্তার মেনজিল যাবার আগে যথারীতি রি দাখিল করতে বলে চলে গেল।

ঘর খালি হয়ে গেল। ঘরে আমি এবং আমার সেই সহ সিগারেট ত পাওয়া যায় না। পরিশ্রমের পর একটু র চা বা কফি পেলেও চলত, কিন্তু তাও পাওয়া যায় না।

ভাগ্যক্রমে জল গরম করার জন্যে ঘরে একটা স্পিরিট- ছিল। তাইতে একটু জল গরম করে দুজনে ভাগ করে বেশি জল গরম করার উপায় নেই কারণ ল্যাম্পে বেশি স্পিরিট না। এইটুকুই আমাদের বিলাস।

কয়েকজন ফরাসি ডাক্তার এসে হাজির। এরা আগে এসেছিল। এরা এসে আমাদের অনুরোধ করল এদের আমি পাংচার করা শিখিয়ে দিতে পারব কি না। এখানে তো আসে।' লাসের ওপর তারা পরীক্ষা করতে পারবে।

আমি তো সানন্দে রাজি হলুম। শিখিয়েও দিলুম কি করলুম শিখে কি করবে? কার লাম্বার পাংচার করবে? এই থেকে কি বেরোতে পারবে?

তারা অঘটনে বিশ্বাসী। বলল হাজার হলেও আমরা ডা যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। রোগী যতক্ষণ বেঁচে থাকে ত তার জীবনের আশা করা যায়। কে জানে এমন অবিশ্বাস্য ঘ তো ঘটতে পারে যে আমরা বেঁচে গেলুম।

এরপর তিন দিন আমার আর কোনো কাজ নেই।

শুয়ে বসে কাটাই। বই বা খবরের কাগজও নেই যে পড়ব। ডাক্তারদের জন্যে পরিপূরক কিছু রেশন পাওয়া যায়। রেশনটা নিজেই আনি (রেশনে কি দেওয়া হবে তা ডাক্তার নিজলি উল্লেখ করেন নি)।

'এফ' ক্যাম্পের কাছেই একটা স্টেডিয়ম আছে। হ্যাঁ, স্টেডিয়ম, ছোট অবশ্য। মাঝে মাঝে সেই স্টেডিয়মের ধাপে গিয়ে বসে থাকি, শুয়ে থাকি। স্টেডিয়মটা হল জার্মান বন্দীদের জন্যে। প্রতি রবিবার তাদের এখানে খেলতে দেওয়া হয়। বাকি ছ দিন স্টেডিয়ম ফাঁকা পড়ে থাকে।

স্টেডিয়মের পরেই কাঁটাতারের বেড়া, তার ওপাশে এক নম্বর ক্রিমেটোরিয়ম। ক্রিমেটোরিয়মের ভেতরটা দেখতে আমার ভীষণ আগ্রহ। কাঁটাতারের বেড়ার ধারে গেলে কিংবা স্টেডিয়মের সব ওপরের ধাপে উঠলে কিছু হয় তো দেখা যেতে পারে বা আভাস পাওয়াও যেতে পারে কিন্তু টাওয়ারে মেসিনগান উঁচিয়ে সাক্ষাৎ যমদূত দাঁড়িয়ে আছে। বেড়ার ধারে গেলে বা স্টেডিয়মের ওপরের ধাপে উঠলে সুঁই সুঁই করে কয়েকটা গুলি বেরিয়ে এসে দেহ ঝাঁঝরা করে দেবে।

তবুও এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ক্রিমেটোরিয়মের বাইরে কম্পাউণ্ডে লাল ইঁটের বাড়িটার সামনে সাধারণ শার্টপ্যান্ট পরা শ'দুয়েক মানুষকে সারি দিয়ে দাঁড় করানো হচ্ছে। এস এস গার্ডরা পাহারা দিচ্ছে।

আমার মনে হল গুণতি মিলান হচ্ছে আর এরা বোধহয় রাত্রের পাহারাদার, একদল যাবে আর একদল আসবে বা এদের ভেতরেই দুই দল পাহারাদার আছে।

আমাকে একজন বলেছিল যে ক্রিমেটোরিয়মে দিন রাত্তির সারাক্ষণ কাজ হয়। আর তারই কাছে শুনেছিলুম যে ক্রিমেটোরিয়মের ভেতরে যারা ডিউটি দেয় তারা সবাই সনডার-

কমানডোভুক্ত। এদের ভাল জামাকাপড় দেওয়া, ভাল খেতেও দেওয়া হয় কিন্তু ক্রিমেটোরিয়মের বাইরে যাওয়া তাদের নিষেধ। ভেতরের ব্যাপার ফাঁস হয়ে যাবার ভয় আছে তো।

তারপর তারা যখন সব কিছু উত্তমরূপে জেনে ফেলে তখন চার মাস পরে তাদের 'লিকুইডেট' করা হয়। অন্যদের যেভাবে ওরা মেরেছে তখন ওদের সেইভাবে মরতে হয়। ঐ চার দেওয়ালের ভেতর যে কত রহস্য লুকিয়ে আছে তা যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ জানতে পারে নি।

আমার ভাগ্যও স্থির হয়ে আছে, চার মাসের বদলে হয়তো আর কয়েকটা দিন এক্সটেনশন পেতে পারি। তারপর গ্যাস-চেম্বার, ক্রিমেটোরিয়ম।

ব্যারাকে ফেরার একটু পরেই দেখি ডাক্তার মেনজিল এসে হাজির। গার্ডরা ব্যস্ত হয়ে তার গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল তারপর গোড়ালির সঙ্গে গোড়ালি ঠেকিয়ে খটাস করে স্যালুট দিল।

মেনজিল তাদের বলল আমাকে ডেকে দিতে। আদেশ পেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে আসতেই বলল

গাড়িতে ওঠ।

গাড়িতে কোনো গার্ড না থাকায় আমি ইতস্তত করছিলুম। ডাক্তার বোধহয় আমার মনোভাব বুঝতে পেরে এবার আর একটু জোরে বলল

আরে ওঠই না।

আমি বিনা বাক্য ব্যয়ে উঠে পড়লুম। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল। আমি আমার ব্যারাকে কাউকে কিছু বলে আসার সময় পেলুম না। ডাক্তার মেনজিল দ্রুত গাড়ি চালিয়ে ক্যাম্প অফিসের সামনে এসে গাড়ি থামিয়ে ডাক্তার সেণ্টকেলারকে ডেকে পাঠিয়ে আমার কার্ড চেয়ে পাঠাল। কার্ড নিয়ে আবার গাড়ি ছেড়ে দিল।

কাঁটাতারের বেড়ার গোলক ধাঁধাঁর ভেতর দিয়ে প্রায় বারো
নিট গাড়ি চালিয়ে, সেকশনের পর সেকশন পার হতে থাকল।
-জেড ক্যাম্প যে কি বিরাট তার একটা ধারণা হল। যারা এই
দীশালায় আসে তারা যেখানে এসে থাকবার স্থান পায় সেইখান
কেই তাকে একদিন ক্রিমেটোরিয়মে নিয়ে যাওয়া হয় তাই তারা
পরিধি জানতে পারে না। আর জেনেই বা কি হবে? কোনো
ভ নেই।

তড়িৎ প্রবাহিত কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে অসউইজ ক্যাম্পে এক
ক পর্যন্ত বন্দী রাখা হয়েছে। নুরেমবার্গে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের
য় হস্ তার সাক্ষ্যে বলেছিল একসময়ে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার
ন্ত বন্দী রাখা হয়েছিল।

আমি চুপ করে বসে আছি। কিছু বলছি না। নানারকম চিন্তা
ছি। বিশেষ করে ভাবছি কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? কোনো জরুরী
ারেশন করাতে? দেখা যাক।

ডাক্তারের কথায় আমার চিন্তায় বাধা পড়ল। গাড়ি চালাতে
াতে আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে সামনে চোখ রেখে ডাক্তার
াকে বলল:

তোমাকে আমি যেখানে নিয়ে যাচ্ছি সেটা অবিশ্যি একটা স্বাস্থ্য-
ন নয় তবে আমার মনে হয় তোমার খুব খারাপ লাগবে না।

একসময়ে একটা ভারি গেট দিয়ে ক্যাম্পের বাইরে বেরিয়ে
। পাশে রয়েছে ইহুদিদের জমায়েত করবার একটা ঘেরা
ফরম। আরও খানিকটা এগিয়ে যাবার পর সামনে বিরাট ও
ত একটা গেট।

সামনেই বিরাট একটা প্রাঙ্গণ সবুজ ঘাসে ভর্তি। নুড়ি বিছানো
, দু'পাশে পাইন গাছের সারি। কোথা থেকে কোথায় এলুম।
প্রাঙ্গণ পার হতেই সামনে মস্ত বড় একটা লাল বাড়ি কিন্তু
য় একটা চিমনি রয়েছে এবং চিমনির মুখ দিয়ে অগ্নিশিখা

বেরোচ্ছে। তাহলে কি আবার একটা ক্যামুফ্লাজ করা ক্রিমেটো
রমেই এলুম ?

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ডাক্তার গাড়িতেই বসে রই
একজন এস এস গার্ড ছুটে এসে সেলাম করে দাঁড়াতেই ডা
তাকে জিজ্ঞাসা করল :

ঘরখানা কি রেডি করা হয়েছে ?

হ্যাঁ স্যার ঘর রেডি।

ডাক্তার গাড়ি থেকে নামল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও নামলুম।
ও ভারি একটা দরজা পার হয়ে ক্রিমেটোরিয়ম বাড়ির ভে
ঢুকলুম। ডাক্তার মেনজিল আগে আগে যাচ্ছিল। আমরা
ঘরে এসে পৌঁছলুম।

ঘরখানা সদ্য চুনকাম করা হয়েছে। এখনও চুনের গন্ধ বেরো
দেওয়াল ভাল করে শুকোয় নি। বেশ বড় একটা জানালা আ
প্রচুর আলো। তবে জানালায় মোটা গরাদ দেওয়া আছে।

ঘরের মধ্যে ফারনিচারগুলি দেখে আমি তো অবাক। ব্যা
এরকম ফারনিচার থাকে নাকি ? বোধহয় বন্দীদের জন্যে নয় !

হাসপাতালে যেমন সাদা খাট থাকে, সাদা চাদর পাতা সেই
একটা খাট পাতা রয়েছে, বড় টেবিল ও কয়েকটা চেয়ার, একটা
আলমারিও রয়েছে।

টেবিলের ওপর পাতা রয়েছে ভেলভেটের একটা লাল টে
ক্লথ। কনক্রিটের মেঝেতে মোটা কম্বল পাতা রয়েছে। অ
মনে হল এবার থেকে বোধহয় আমাকে এই ঘরেই থাকতে হ
সনডারকমানডোর লোকরাই ঘরখানা রং করেছে, সাজিয়েছে।

ডাক্তার আমাকে আর একখানা ঘরে নিয়ে চলল। আলে
একটা করিডর পার হয়ে আমরা সেই ঘরে এলুম। এ ঘর
আমি অবাক।

একটা আধুনিক ডিসেকটিং রুম। বড় বড় দুটো জানালা,

কনক্রিটের মেঝে। ঘরের মাঝখানে পালিশকরা মার্বেল বসানো ডিসেকটিং টেবিল। ঘর থেকে জল ও দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা রয়েছে।

টেবিলের ধারে বসানো রয়েছে চকচকে নিকেলের ট্যাপ লাগানো বেসিন, এছাড়া দেওয়ালে তিনদিকে তিনটে সিংক বসানো রয়েছে। দেওয়ালের রং ফিকে সবুজ। জানালায় অবশ্যই গরাদ দেওয়া আছে, মশা আটকাবার জন্যে সবুজ রঙের সূক্ষ্ম তারের জাল।

এরপর আমরা গেলুম ওয়ার্করুমে। পাশেই। ঘরের মাঝখানে সবুজ টেবিলক্লথ ঢাকা বড় একটা টেবিল, টেবিল ঘিরে ফ্যান্সি চেয়ার। আরামপ্রদ। দেওয়ালে কয়েকখানা ছবিও টাঙানো রয়েছে। টেবিলের ওপর তিনটে মাইক্রোস্কোপ রয়েছে। একধারে আলমারি ভর্তি আধুনিক বই, সবই ডাক্তারী শাস্ত্রের।

আলমারিতে আছে ঢিলে জামা, এপ্রন, তোয়ালে এবং রবারের গ্লাভস। বলতে গেলে একটি হাসপাতালের উপযোগী আধুনিক ডিসেকটিং রুম।

সবই তো দেখলুম কিন্তু একটুও উৎসাহ বোধ করলুম না। সমুদ্রার কমানডোরের মতো আমাকেও সাধারণ অর্থাৎ সিভিলিয়ান ড্রেস দেওয়া হয়েছে যার অর্থ চার মাস আর মেয়াদ। খরচের খাতায় তোমার নাম উঠে আছে।

আমার চিফ অর্থাৎ ডাক্তার মেনজিল চলে যাবার আগে এস এস গার্ডদের ডেকে বলে দিল যে আমার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার নিজের ওপর। ক্রিমেটোরিয়মের এস এস কর্মচারীদের আমার ওপর কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না তবে আমার খাওয়া থাকার ব্যবস্থা তারা করবে।

এস এস কিচেন থেকে খাবার আসবে, বিছানার চাদর ইত্যাদি এবং আমার জামা প্যান্ট আসবে এস এস স্টোর থেকে। এই বাড়িতেই আছে এস এস শপ, সেখানে আমি চুল ছাঁটতে ও দাড়ি

কামাতে পারব। আর সকাল সন্ধ্যায় গুণতি মিলানের সময় আমাকে হাজির থাকতে হবে না।

আমাকে নির্দিষ্ট কাজ দেওয়া হল। আমি হলুম ক্রিমেটোরিয়মের রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান। থুতু, রক্ত স্টুল, ইউরিন ইত্যাদির প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষাও আমাকেই করতে হবে এছাড়া ১২০ জন এস এস কর্মী ও সনডারকমানডোর সব ব্যক্তি এবং ৮৬১ জন যুদ্ধবন্দীর চিকিৎসার ভার আমার ওপর দেওয়া হল। ওষুধ, ব্যাণ্ডেজ ও অন্যান্য সবঞ্জাম আমি চাইলেই পাব। ক্রিমেটোরিয়মের রোগীদের প্রত্যহ ক.র, দরকার হলে দু'বার করে আমাকে দেখে আসতে হবে এবং সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত চারটে ক্রিমেটোরিয়মে আমি কোনো রকম অনুমতি পত্র বিনাই যেতে পারব, কোনো পাস লাগবে না। তবে এস এস কমাণ্ডাণ্ট এবং সনডারকমানডোর ভারপ্রাপ্ত অফিসার মাসফেলডকে রোজ রিপোর্ট দাখিল করতে হবে, ক'জন রোগী আছে, তাদের কি রোগ, অবস্থা কি রকম, এখানেই চিকিৎসা করা যাবে কিনা অথবা অন্যত্র পাঠাতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে। ছাপা ফরম আছে, রোগীর নাম লিখে ভর্তি করে দিলেই চলবে।

আমাকে এত কাজের ভার দেওয়া হল? আমি তো অবাক হয়ে গেলুম। ক্যাটজেট ক্যাম্পে আমি তাহলে একজন কেউকেটা ব্যক্তি।

তবুও মন খচ খচ করে। যতই তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া হক, যতই তুমি কেউকেটা হও, তুমি সেই সনডানকমানডোর দাগী আসামী। আর চার মাস তোমার আয়ু। তবুও আমি সেই ফরাসি ও গ্রীক ডাক্তারের মতো আশা ছাড়বো না। অঘটনের প্রত্যাশা করব।

আমাকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে ডাক্তার মেনজিল চলে গেল। এস এস গার্ড তাকে স্যালুট করল কিন্তু আমাকে নয়, আমার পদ যাই হক না কেন আমি তো যুদ্ধবন্দী। এস এস গার্ডরা যুদ্ধবন্দীদের স্যাল্যুট করে না।

আমি ডিসেকটিংরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলুম। এখন থেকে এই ঘরের দায়িত্ব আমার।

একটা চেয়ারে বসলুম। বাড়ির কথা মনে পড়ল। আমার সেই ছোট বাড়ির ছোট বারান্দা। বারান্দায় ফুলগাছের টব। আসবার আগে দেখে এসেছিলুম কতকগুলো গাছে কুঁড়ি এসেছে। এতদিনে নিশ্চয় ফুল ফুটেছে যদি না গেস্টাপোরা টবগুলি ভেঙে চুরমার করে দিয়ে থাকে।

সাতদিন হল এরা আমাকে ধরে এনেছে। জানি না আমার পরিবারের সকলে এখন কোথায় বা তারা কি করছে। আমার বৌ ও মেয়েকে তো ওরা ধরে এনেছে। ওরা এখানেই আছে। কি অবস্থায় আছে তাও জানি না। খবর নিতে পারি নি। জিজ্ঞাসা করলেও বলবে না।

মা আর মেয়ে কি একই সঙ্গে আছে? তারা কি খাচ্ছে, কি পরছে, তাদের দিয়ে কি কাজ করানো হচ্ছে কিছুই জানি না।

আমার বুড়ো বাবা মা তাদের কি অবস্থা হয়েছে কে জানে? মেরেই ফেলেছে হয় তো। চিন্তা হচ্ছে আমার ছোট বোনের জন্যে। জানি না তার ভাগ্যে কি ঘটেছে।

এইটুকু জানি যে ওরা আমাদের সঙ্গে একই ট্রেনে আসে নি। ওরা যদি অপর কোনো ট্রেনেও এসে থাকে তা হলে তো বন্দী বাছাই-য়ের সময় মেডিক্যাল সিলেকটর হিসেবে ডাক্তার মেনজিল আমার বাবা ও মাকে গ্যাস চেম্বার এবং আমার বোনকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়েছে। কে জানে বোন হয় তো প্রার্থনা করেছিল যে তাকে মায়ের সঙ্গে যেতে দেওয়া হক। প্রার্থনা তো মঞ্জুর হয় নি উল্টে তার গালে চড় মেরে তাকে হয়তো তার নিজের লাইনে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

কে জানে হয় তো তার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। কৃতজ্ঞতায় ছলছল চোখে সে মায়ের সঙ্গেই গেছে এবং তারপর?

হঠাৎ চিন্তাজাল ছিন্ন হল। দরজা খুলে গেল। ঘরে কয়েকজন

এস এস অফিসার প্রবেশ করল। ক্রিমেটোরিয়মে যে একজন ডাক্তার এসেছে এ খবরটা খুব দ্রুত মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমার মনে পড়ে গেল ডাক্তার মেনজিলের কথা। মেনজিলই আমার একমাত্র মনিব। আমি আর কারও আদেশ শুনতে বাধ্য নই। ঘরে যে দুজন দীর্ঘকায় এস এস অফিসার প্রবেশ করল, আমি এখন ওদের সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করব তার ওপর এদের সঙ্গে আমার ভবিষ্যত সম্পর্ক ও আচার ব্যবহার নির্ভর করবে। আমি যদি নরম হই এবং ওদের বুঝতে দিই যে ওরাই আমার প্রভু তাহলে ত আমাকে পেয়ে বসবে এবং আমাকে গ্রাহ্যই করবে না।

আমি চেয়ার থেকে এক চুলও নড়লুম না কিন্তু সাধারণ সৌজন্য ভুললুম না। ওদের বসতে বললুম। ওরা আমাকে একবার ভাল করে দেখে নিল তারপর ভুরু কুঁচকে চেয়ারে বসল। হয়তো ভেবেছিল যে আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওদের স্যালুট করব এবং ওরা বসতে না বললে আমি বসব না।

কথাবার্তা আরম্ভ হল। আমি কোথা থেকে আসছি, আসবার সময় পথে এবং এখানে আসার পর কোনো অসুবিধে হয়নি তো? এই দিয়ে ওরা কথা আরম্ভ করল, তারপর আমি ছাত্র অবস্থায় ও পরে জার্মানিতে অনেকদিন কাটিয়েছি, জার্মানি সম্বন্ধে আমার ধারণা স্পষ্ট। জার্মানদের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল ইত্যাদি জানতে চাইল। ওরা মনে মনে খুশি হল।

আমি ওদের চেয়ে আরও মার্জিতভাবে জার্মান বলতে পারি ওরা তা লক্ষ্য করেছে এবং সে কথা উল্লেখও করল। আমিও অসউইজ ক্যাম্পের রোগী ও তাদের এতাবৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করলুম। রাজনীতি ও সমালোচনা একেবারেই পরিহার করে চললুম।

আমার মনে হল ওরা আমাকে বাজিয়ে নিতে এসেছিল। তবে ওরা খুশিমনে বিদায় নিল এবং আমাকে তাদের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে গেল। কিন্তু হায়! নিজেরাও সিগারেট টানল না

আমাকেও একটা দিল না। মনটা ফস ফস করে। যাক গে! আর দু'চারদিন গেলে নেশা কেটে যাবে। যদি এখান থেকে বেঁচে ফিরি তাহলে আর সিগারেট ধরব না।

দু'জন সহকারী নিয়ে ক্যাপো-ইন-চিফ এল। যাকে বলে কার্টসি কল। ক্যাপো হল দুটো বড় জার্মান শব্দের সংক্ষিপ্ত শব্দ। এরা জার্মান বন্দী তবে এদের অপরাধ রাজনীতিক নয়, অন্য কিছু। এরাই আমার ঘর সাজিয়ে দিয়েছে, সেই কথাই বলতে এসেছিল। ওরা আমাকে ওদের এবং ওদের সঙ্গীদের সঙ্গে ডিনার খাবার নিমন্ত্রণ জানাল। নিমন্ত্রণ তো বটেই ওরা ডিনারের জন্যে আমাকে ডাকতেই এসেছে।

ডিনারের সময় হয়ে গিয়েছে। ক্ষিধেও পেয়েছিল।

ওরা আমাকে তিন তলায় একটা বড় হল ঘরে নিয়ে গেল। এই ঘরে বন্দীরা থাকে। বন্দীর শোবার জন্যে দু দিকের দেওয়ালে অনেকগুলি বাংক আমার নজরে পড়ল। বাংকগুলি পালিশ করা না হলেও যে শয্যা পাতা রয়েছে তা কিন্তু বেশ ভাল। চাদর, বালিশ ও ওয়াড় রয়েছে। এরা জার্মান বন্দী বলেই হয়তো এদের এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু পরে শুনলুম যে আগে যে সব ধনী বন্দী এসেছিল তারাই নাকি এগুলি সঙ্গে এনেছিল। এই বন্দীদের অনুরোধে এগুলি এদের ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে।

মাথার ওপর বেশ জোরালো আলো, ব্যারাকের মতো নিষ্প্রভ আলো নয়। ঘরে তখন অর্ধেক লোক ছিল, বাকি অর্ধেক নাইট ডিউটিতে চলে গেছে। কেউ কেউ বাংকে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, কেউ কেউ বই পড়ছে। এই ঘরে অনেক বই রয়েছে আর আমরা ইহুদিরা বই পড়তে ভালবাসি।

বন্দীরা নিজেদের বিদ্যা ও রুচি অনুসারে নানারকম বই এনেছে। যাই হক এখানে বই পড়তে দেওয়া হয়। অথচ ব্যারাকে যদি

কাউকে বই পড়তে দেখা যায় তাহলে তার বই তো কেড়ে নেওয়া হবেই উপরন্তু তাকে কুড়িদিন সেলে আবদ্ধ হয়ে কুড়িদিন একলা থাকতে হবে। আর সেই সেল এত ক্ষুদ্র যে উঠে দাঁড়ান যায় না, হাত পা ছড়িয়ে শোয়াও যায় না, একটা বড় স্টীল ট্রাঙ্ক বললেই হয়।

কোনো বন্দী বই পড়ছে ধরা পড়লেই, তা সে যে বই হক, তাকে তো আগে প্রহার দেওয়া হবে। প্রহার খেয়ে বেঁচে থাকলে তবেই তাকে সেলে পাঠান হবে।

ডিনার টেবিল দেখে তো আমার চোখ কপালে উঠল। আমি তাজ্জব। টেবিলের ওপর পাতা রয়েছে ব্রোকেডের টেবিল ক্লথ, শিল্কের ঝালর। কারুকার্য করা ডিশ প্লেট, চকচকে ছুরি কাঁটা। এসব এখানে কোথা থেকে এল? পরমুহূর্তেই মনে মনে হাসলুম। ধনী ইহুদি পরিবার থেকে এগুলি নিশ্চয় লুট করে আনা।

খাবারের আয়োজনও উত্তম, বেকন, সালামি, কেক, চকোলেট, জেলি। জারের গায়ে লেবেল পড়ে বোঝা গেল এগুলি হাঙ্গেরি থেকে আনা।

হালে তো হাঙ্গেরি থেকেই ইহুদিদের ধরে আনা হচ্ছে অতএব এই সব দ্রব্য ও খাদ্যসম্ভার ঐ সব ইহুদি পরিবার থেকেই লুট করে আনা হচ্ছে।

টেবিলের চারদিকে অনেকেই বসেছে। ক্যাপো-ইন-চিফ তো আছেই তা ছাড়া আছে এঞ্জিনিয়ার, হেড শফার, কমাণ্ডো-লিডার, একজন 'টুথ পুলার' এবং কয়েকজন কারিগর।

সকলেই আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। তাদের আন্তরিকতায় সন্দেহ করবার কিছু নেই। আমার সামনে নানারকম খাদ্য সাজিয়ে দেওয়া হল। সবই প্রায় আমার দেশের খাবার, হাঙ্গেরির।

যে সব হতভাগ্য হাঙ্গেরিয় ইহুদিদের বর্বর নাৎরীরা ধরে এনেছে সেইসব হতভাগারা সঙ্গে করে কিছু খাদ্য ও পানীয় এনেছিল।

সেগুলি তো নাৎসীরা ছিনিয়ে নিয়ে ছিলই উপরন্তু তাদের বাড়িতে বা দোকানে যা পেয়েছে তাও লরি বোঝাই করে নিয়ে এসেছে।

সেই সব হতভাগ্যরা পথে কিছুই খেতে পায় নি। হয় তো করাতের গুঁড়ো মেশান একখণ্ড করে আরসার্তজ অর্থাৎ কৃত্রিম পাঁউরুটি দেওয়া হয়েছিল। তারা অভুক্তই ছিল। শিশু, নারী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, কেউ কিছু খেতে পায় নি। তাদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে আমার সামনে টেবিলে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার বমি পেতে লাগল। এ খাবার আমি খাব কি করে?

শরীর খারাপের অজুহাত দেখালাম। তারা হয় তো বুঝতে পারল। কিছু বলল না। আমি শুধু চা খেলাম। চায়ের সঙ্গে রাম মিশিয়ে নিয়েছিলাম। তার ফলে একটু মানসিক শান্তি লাভ করেছিলুম।

অস্‌উইজ ক্যাম্পে কোনো বন্দী সিগারেট টানতে পায় না। রক্ষীদের একখানা পাঁউরুটি ঘুস দিলে তারা একটা সিগারেট এনে দেয়। এখানে পাশেই একটা টেবিলে শত শত প্যাকেট 'মেড ইন হাঙ্গেরি' সিগারেটের প্যাকেট রয়েছে। একটা সিগারেট না নিয়ে পারলুম না।

টেবিলে পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, গ্রীস, জার্মানি ও ইটালির মানুষরা রয়েছে। সকলেই অবশ্য বন্দী, আমরা সকলেই জার্মান ভাষা বুঝতুম। আলাপ করতে অসুবিধে হল না।

এদের মুখ থেকে ক্রিমেটোরিয়মের ইতিহাস শুনলুম। হাজার হাজার বন্দী নিজেদের রক্ত দিয়ে নিজেদের কবরখানা ক্রিমেটোরিয়ম, মরণচুল্লী, তৈরী করেছে। প্রতিটি ইঁট তাদের খুনে লাল। ক্ষুধা নিবারণের আহার নেই, তৃষ্ণা নিবারণের জল নেই, পরণে কাপড় নেই, বিশ্রাম নেই, দিবারাত্র পরিশ্রম করে তারা এই শ্মশানভূমি তৈরী করেছে শুধু একজন মাত্র অত্যাচারী ডিকটেটরের লালসা চরিতার্থ করবার জন্যে।

একজন এগুলিকে বলেছিলেন 'ডেথ-ফ্যাক্টরি'।

গত চার বছরে শত শত ট্রেনে চাপিয়ে গরু ছাগলের মতো হাজার হাজার ইহুদিকে এখানে আনা হয়েছে, গ্যাস চেম্বারে পোরা হয়েছে তারপর ক্রিমেটোরিয়মে পুড়িয়ে ছাই করা হয়েছে।

আমাদের মধ্যে জার্মান ও ইটালিয়ানও ছিল। ফরাসি, পোল ও গ্রীক বন্দীরা শ্রোতার ভূমিকা নিয়েছিল। যা বলবার ক্যাপো-ইন-চিফ বলছিল কিন্তু এমন ভাব দেখাচ্ছিল যেন সে নিরপেক্ষ, শুধু কাহিনী বলে যাচ্ছে, সংবাদপত্রের রিপোর্টারের মতো।

যাক রাত্রি অনেক হল। সকলেই ক্লান্ত। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে। একজন এস এস গার্ড এসে মনে করিয়ে দিল যে আলো নেবাবার সময় অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। আমি আমার ঘরে ফিরে এলুম। রামটুকু পেটে পড়ার জন্য সে রাত্রে সুনিদ্রা হয়েছিল।

আরও হয়তো খানিকক্ষণ ঘুমোতুম কিন্তু একটা ট্রেনের হুইসিল-এর তীব্র আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। আর শুয়ে থাকা গেল না, ভালও লাগল না। উঠে পড়লুম। বাথরুমে যেয়ে বেশ করে মুখ ধুয়ে এলুম।

জানালার ধারে এসে দাঁড়ালুম। ট্রেনের প্লাটফরমটা আমার জানালা থেকে দেখা যায়। সবে রোদ উঠেছে। গাছের ডগা ছাড়িয়ে রোদ এখনও নীচে নামে নি।

আমি আমার ঘরের জানালা থেকে ট্রেনখানা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ট্রেনখানা থেমেছে। ওয়াগনের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। আলুর বস্তার মুখ খুলে দিলে যেমন গল গল করে আলু গড়িয়ে পড়ে ঠিক সেইভাবে হতভাগ্য ইহুদির দল নিজের নিজের ছোট ছোট মোট পুঁটলি বা ব্যাগ নিয়ে প্ল্যাটফরমে নেমে পড়ল।

আজ বোধ হয় কয়েক হাজার হতভাগ্যকে নামানো হল। আধ

ঘণ্টার মধ্যেই অতি দ্রুত 'সিলেকশন' হয়ে গেল অর্থাৎ কর্মঠ ও বাতিল এই দুইয়ের লাইন ভাগ হয়ে গেল।

বাঁ দিকের অর্থাৎ বাতিলের লাইনকে এগিয়ে যাবার আদেশ দেওয়া হল। আদেশের ভঙ্গি কি সাংঘাতিক। এক একটা কথা বেরোচ্ছে গার্ডদের মুখ থেকে যেন সপাসপ চাবুকের আওয়াজ হচ্ছে।

অনেক পায়ের শব্দ পেলুম। ক্রিমেটোরিয়মে মানুষ চলাচল করলে আমার ঘর থেকে আওয়াজ পাওয়া যায়।

এ আওয়াজ আসছে ক্রিমেটোরিয়মের ফারনেস রুম থেকে। অতি দ্রুত আওয়াজ, যেন সকলেই ব্যস্ত।

ট্রেন থেকে যারা নামল এবং যাদের বাতিলদের দলে ফেলা হয়েছে তাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে মরণ-চুল্লী তৈরী করা হচ্ছে আর কি।

মোটরে স্টার্ট দেওয়া হল। ধ্বক্ ধ্বক্ আওয়াজ বেশ স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে। প্রতিটি চুল্লীর জন্যে একটি করে ভেনটিলেটর আছে। ভেনটিলেটর দিয়ে জোরে বাতাস চালাবার ব্যবস্থা আছে, যাতে চুল্লীগুলি তাড়াতাড়ি ধরে যায়। পনেরোটি চুল্লী আছে ক্রিমেটোরিয়মে।

ক্রিমেটোরিয়মের এই ঘরটার নাম হল ইনসিনারেটর রুম। ৫০০ ফুট লম্বা বিরাট ঘর, কনক্রিটের মেঝে, গরাদ দেওয়া জানালা, চুনকাম করা দেওয়াল।

প্রতিটি চুল্লী লাল ইঁটের তৈরি। সামনে পালিশ করা চকচকে লোহার গেট। চারদিক বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোথাও ময়লা নেই, দেওয়ালে ঝুল নেই, দরজা জানলার পেন্ট কোথাও বিবর্ণ হয়নি।

ওদিকে তখন হতভাগ্যেরা বাইরের প্রাঙ্গণে এসে গেছে। গেট দিয়ে পাঁচজন পাঁচজন করে একসঙ্গে ঢুকছে। এই যে ভেতরে ঢুকল এদের ভাগ্যে যে কি ঘটতে চলেছে তা কিন্তু বাইরের জগতের কেউ জানতে পারছে না এমন কি কাক পক্ষীতেও নয়।

ওরা কেউ আর গেটের বাইরে বেরোতে পায় নি। আর যারা এইসব হতভাগ্যের কাহিনী বাইরের জগতকে বলতে পারত তারাও আর এই ক্যাম্পের বাইরে কোনদিন বেরোতে পারে নি।

রেল লাইনের ধারে প্লাটফরমে যখন লাইন ভাগ করা হত তখন ডানদিকের লাইনের কর্মঠ ব্যক্তিদের বলা হত বাঁ দিকের লাইনের বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, রুগ্ন বা শিশুদের চিকিৎসা বা পরিচর্যার জন্যে পৃথক একটি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

হতভাগ্যরা গেট পার হয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। সামনেই তো সবুজ ঘাসের লন। লন ঘিরে ফুলগাছের সার। কতরকম নয়ন ভোলানো কত রঙের ফুল ফুটে আছে।

শিশুরা তাদের বাবা মায়ের কোলে পিঠে কাঁধে। কেউ কেউ মায়ের পোশাকের প্রান্ত ধরে গুটি গুটি পা ফেলে হেঁটে চলেছে। চোখে এখনও ঘুম লেগে রয়েছে।

ক্রিমেটোরিয়মের দরজায় এস এস গার্ড দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাথার ওপর দেওয়ালের গায়ে বেশ বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে বিনা কাজে প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এমন কি এস এস গার্ডরাও নয়।

আগন্তুকদের চোখে পড়ল বাগানে বেশ কয়েকটি জলের কল রয়েছে, বাগানে জল দেবার জন্যে। লাইন ভেঙ্গে সকলেই ছুটল কলের দিকে। গত পাঁচদিন তারা তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে এক ফোঁটাও জল পায়নি, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে, কারও কারও জিভ ফুলে গেছে। অনেকের সঙ্গে পাত্র ছিল।

কিছু গোলমাল হল, কিছু ঠেলাঠেলিও হল, বচসাও হল কিছু কিন্তু সকলেই তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারল। আশ্চর্যের বিষয় এস এস গার্ডরা বাধা দিল না, কোনো দিনই দেয় না কারণ তারা তো জানে যে মরবার আগে এই তাদের শেষ তৃষ্ণা নিবারণ। আর তাছাড়া গার্ডরা জানে যে জলপান না করে তারা নড়বে না।

জল পান করে সকলে আবার নিজের নিজের লাইনে এসে

দাঁড়াল। এরপর তাদের দুধারে ঘাসের বর্ডার দেওয়া একটা রাস্তা দিয়ে প্রায় একশ' গজ হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

পথের শেষে লোহার একটা ঢালু সাঁকো পার হয়ে কয়েক ধাপ নেমে ওদের মস্ত বড় একটা হলে ঢোকানো হল। হলের প্রবেশপথে জার্মান, ফরাসি, গ্রীক এবং হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় লেখা আছে: স্নান নির্জীবাণুকরণ ঘর।

ঘরে ঢোকবার আগে যাদের সংশয় ছিল তারা ঐ লেখা পড়ে তখন নিশ্চিন্ত হল। কয়েকদিন স্নান হয় নি এমন কি হাত পা ও মুখও ধোয়া হয়নি। ভালই হল।

বিরাট হল। লম্বায় দু'শো গজ। দেওয়াল ধবধবে সাদা চুনকাম। চারদিকে উজ্জ্বল আলো। হলের মাঝে মাঝে ছাদ পর্যন্ত থাম রয়েছে। দেওয়ালের দিকে বেঞ্চি পাতা রয়েছে, জামাকাপড় রাখবার আলনা রয়েছে।

দেওয়ালের চতুর্দিকেই লেখা রয়েছে নিজের নিজের জামা প্যান্ট স্কার্ট বা ফ্রক বা ব্লাউজ কি করে একত্রে বেঁধে আলনায় রাখতে হবে এবং জুতোই বা একত্রে কি করে রাখতে হবে। গার্ডরাও একথা মুখে বলে দিচ্ছে। তাদের কথাবার্তা বেশ মোলায়েম।

আগন্তুকরা ভাবল জার্মানদের কাজকর্ম নিখুঁত, ব্যবস্থা উত্তম।

হ্যাঁ, ঠিক। জার্মানরা যে কাজ করে ভাল করেই করে। আর সেই জন্যেই তো এদের মারবার আগে এদের সমস্ত জামাকাপড় ও জুতো খুলে নেওয়া হবে, তারপর সেগুলি কাচিয়ে ও পরিষ্কার করে বোমা বিধ্বস্ত শহরে দুর্গতদের ব্যবহারের জন্যে পাঠান হবে।

পুরুষ, রমনী ও শিশু মিলিয়ে হলের মধ্যে তিন হাজার জন ছিল। পরবর্তী নির্দেশের জন্যে তারা অপেক্ষা করছে।

ঘরে কয়েকজন সশস্ত্র মিলিটারী প্রবেশ করল। প্রবেশ করেই তারা আদেশ করল, প্রত্যেকে নিজের নিজের সমস্ত জামাকাপড় সব কিছু খুলে ফেল। দেরি কোরো না। খুলতে আরম্ভ কর।

জামাকাপড় খুলবে কেন? লজ্জা বা শালীনতার প্রশ্ন তো আছেই তা ছাড়া উলঙ্গ হবার দরকারটা কি তাতো তারা বুঝতে পারছে না।

কিন্তু দেখা গেল যে মিলিটারিরা কোনো ওজর আপত্তি শুনবে না। রাজি না হলে ওরা জোর করে সকলের জামাকাপড় খুলে নেবে। কিশোরীরা লজ্জায় ও ভয়ে জড় সড়। উপায় নেই। দশ মিনিটের মধ্যে সকলেই উলঙ্গ হল এবং নির্দেশ অনুসারে নিজ নিজ পোষাক ও জুতো আলনায় গুছিয়ে বা সাজিয়ে রাখল।

আগে নাকি সকলের দেহ ও মাথা থেকে উকুন মারা হবে। উকুন থেকে টাইফাস রোগ হয়। টাইফাস বড় খারাপ রোগ, মড়ক লেগে যায়, একবার ধরলে আর ছাড়ে না।

হতভাগ্যরা তাই বিশ্বাস করল। আগে উকুন মারা হবে তারপর স্নান তারপর আবার তারা জামা কাপড় পরে সভ্য হবে। ওদের নাকি আপাততঃ একটা করে পাজামা ও শার্ট দেওয়া হবে। যাই হক লজ্জা নিবারণ তো হবে।

ভেতরের দিকে আর একটা দরজা খুলে গেল। ওক কাঠের বেশ ভারি দরজা। আদেশ হল, ওঘরে চলে যাও। সকলে পাশের ঘরে চলে গেল। ও ঘরটাও বেশ বড়, এই ঘরের প্রায় সমান তবে এ ঘরে আলনা বা বেঞ্চি কিছুই নেই।

তবে এ ঘরেও মাঝখানে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত লম্বা লম্বা চৌকা থাম রয়েছে। না, এগুলো ছাদ ধরে রাখবার জন্যে কনক্রিটেব থাম নয়। আসলে এগুলো লোহার চাদরের পাইপ যাদের গায়ে অসংখ্য ছিদ্র, ঝাঁঝরির মতো। থামগুলো রয়েছে তিরিশ গজ অন্তর।

হতভাগ্যরা ভাবছে এই সব ছিদ্র দিয়ে ফোয়ারার মতো জল বেরোবে আর সেই জলে তারা স্নান করবে।

পাশের ঘরের ভেতরে সবাই যখন ঢুকে গেছে তখন আদেশ হল 'এস এস গার্ড এবং সনডারকমানডো সবাই বেরিয়ে এস'। বলার

সঙ্গে সঙ্গে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এ ঘরে কোনো জানালা নেই তবে আলো জ্বলছিল।

এস এস এবং সনডারকমানডো বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের একমাত্র ওক কাঠের সেই ভারি দরজা বেশ চেপে বন্ধ করে দেওয়া হল। এ দরজা ভেতর থেকে খোলা যায় না। বাইরে থেকে সেই ঘরের আলো নিবিয়ে দেওয়া হল। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। কেউ কেউ ভয় পেয়ে গেল। এ কি? আলো নিবে গেল কেন? কারেন্ট চলে গেল? তখনও তারা জানে না যে তাদের আয়ু আর মাত্র দশ মিনিট।

বাইরে তখন একটা ভ্যানের আওয়াজ শোনা গেল। ভ্যানের গায়ে লেখা আছে ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রস এবং একটা বড় রেড-ক্রসের লাল ছাপও রয়েছে। ভ্যান থেকে নামল একজন এস এস অফিসার এবং একজন ডেপুটি হেলথ সারভিস অফিসার। এই অফিসারের হাতে রয়েছে সবুজ রঙের চারটি টিন। প্রতি হাতে দুটি করে।

সেই অফিসার লনের দিকে এগিয়ে চলল। লনের মধ্যে প্রতি তিরিশ গজ অন্তর একটি করে কনক্রিটের পাইপের মুখ বেরিয়ে রয়েছে। ক্যাপ দিয়ে মুখগুলি আঁটা।

অফিসার মুখে গ্যাসমাস্ক লাগিয়ে নিল। ঘরের ভেতরে অন্ধকারে তখন ভীতি সঞ্চার হয়েছে, কেউ কাঁদছে, কেউ প্রার্থনা করছে। কেউ নির্বিকার। প্রতি মা তার সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে!

অফিসার মুখে গ্যাসমাস্ক পরে পাইপের মুখ থেকে প্যাঁচ ঘুরিয়ে ভারি ক্যাপ একে একে খুলতে লাগল আর পাইপের মুখের ভেতর দিয়ে বেগুনি রঙের দানা বাঁধা কি একটা রসায়ণ ঢেলে দিতে লাগল। তারপর বেশ করে ক্যাপ বন্ধ করে দিল।

দানাবাঁধা সেই রসায়ণ ঘরের ভেতরের পাইপের নিচে চলে গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে অতি মারাত্মক ও তীব্র এক গ্যাস উৎপাদন করল

এবং সেই গ্যাস পাইপের অসংখ্য ছিদ্র দিয়ে স্নানের জলের পরিবর্তে বেরিয়ে এসে সারা ঘর ভরে ফেলল।'

গ্যাস প্রথমে হলের মেঝে ও নিচের দিক ভরে ফেলল তারপর আস্তে আস্তে ওপরে ছাদের দিকে উঠতে লাগল।

ক্রন্দনরোল ও চিৎকারে ঘর বুঝি ফেটে যাবে। সেই সঙ্গে নিজের প্রাণ বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা। মারামারি, হাতাহাতি। অথর্ব নারী ও শিশুরা পিষ্ট হতে থাকল, চাপা পড়তে থাকল। ওপরে তখনওতো গ্যাস ওঠেনি তাই তাদের মাড়িয়ে যাদের দেহে কিছু শক্তি আছে তারা ওপরে উঠতে লাগল এবং তাদের আঁচড়ে কামড়ে আরও একদল।

মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড। তার মধ্যে সারা হল গ্যাসে ভর্তি হয়ে গেল এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব শেষ, একজনও বেঁচে রইল না।

এই রুটিন চলে প্রত্যহ। মারাত্মক ঐ গ্যাসটা আসে ক্যাম্পের বাইরে থেকে এবং ধোঁকা দেবার জন্যে রেডক্রসের ভ্যানে করে। রেডক্রস, যার পুণ্যব্রত মানুষের সেবা কিন্তু এখানে তার ভূমিকা নরহত্যা! এর চেয়ে নিন্দনীয় আর কি হতে পারে! এই গ্যাস ক্যাম্পে মজুদ রাখা হয় না।

ভ্যানে চেপে ঐ যে দুজন গ্যাস-কসাই এসেছিল তারা আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল তারপর গ্যাসমাস্ক খুলে সিগারেট ধরাল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিন হাজার নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করল, ওদের ডিউটি শেষ। তারা খালি টিনগুলি নিয়ে ভ্যানে উঠে ফিরে গেল।

কুড়ি মিনিট পরে হলের ইলেকট্রিক ভেন্টিলেটর চালিয়ে দেওয়া হল, দরজা জানালা খুলে দেওয়া হল। গ্যাস বেরিয়ে যাক।

ওদিকে ট্রাক এল। প্রথম হলের দরজা খোলা হল। সনডার-কমানডোরা সেই ঘর থেকে হতভাগ্য ইহুদিদের সমস্ত পোশাক ও জুতো মোজা সংগ্রহ করে ট্রাকে বোঝাই করল। আগে ওগুলি

জীবাণুমুক্ত করা হবে তারপর ট্রেনে চাপিয়ে জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান হবে।

'একজেটর' সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত ভেন্‌টিলেটারের সাহায্যে গ্যাস-চেম্বার থেকে বিষাক্ত গ্যাস দ্রুত বেরিয়ে গেলেও ফাঁকে ফোকরে এবং গাদাবন্দী মৃতদেহের ভেতরে গ্যাস লুকিয়ে থাকে। দু ঘণ্টা পরেও ক্ষীণতম গ্যাস থাকলেও এবং ঈষৎ ঘ্রাণ লাগলেই দমফাটা কাশি আরম্ভ হয়।

এজন্যে এখন মৃতদেহ সরাবার জন্যে গ্যাস-চেম্বারে যারা যাবে তাদের গ্যাসমাস্ক পরতে হয়।

সে এক বীভৎস নারকীয় দৃশ্য। স্তূপাকারে নগ্ন নরনারীর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। পুরুষ নারী বোঝা যায় না। গা গুলিয়ে ওঠে। দুর্গন্ধে নাকে চাপা দিতে হয়। নিজের প্রাণ বাঁচাবার সময়ে আঁচড়া-কামড়া-কামড়ি করবার সময়ে রক্তপাত হয়েছে, দেহে কালসিটে পড়েছে এবং আতংকিত নরনারী বা শিশুরা মলত্যাগ করে ফেলেছে। রক্ত ও বিষ্ঠালিপ্ত দেহগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছেই হয় না যে একদল সুসভ্য মানুষ আর একদল নির্দোষ ও অক্ষম মানুষকে এইরকম নৃশংসভাবে হত্যা করতে পারে। সে দৃশ্য অবর্ণনীয়।

মুখে গ্যাসমাস্ক ও হাঁটু পর্যন্ত রবারের গামবুট পরে দমকলের ফায়ারম্যানদের মতো জেট-নজল্ লাগানো জলের পাইপ হাতে নিয়ে সনডারকমানডোর লোকেরা মৃতদেহের স্তূপ ঘিরে দাঁড়াল। তারপর জলের তোড়ে মৃতদেহগুলি সরিয়ে তাদের দেহ ও পরে ঘরের মেঝে পরিষ্কার করল।

লম্বা লম্বা আঁকশি দিয়ে লাসগুলিকে টেনে টেনে আলাদা করে পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সেই ঘরে ছিল চারটে বড় বড় এলিভেটর বা লিফট। লাসগুলিকে টেনে টেনে সেই লিফটে তোলা হল। এক একটা লিফটে কুড়িটা থেকে পঁচিশটা

লাস তোলা হল। তারপর ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়া হল অর্থাৎ মাল বোঝাই হয়েছে এবার লিফট তুলতে পার।

ওদিকে ইনসিনারেটরের চুল্লী রেডি। লিফট থেকে লাসগুলি ফেলা হয় এক একটা নালায়। নালা থেকে ঠেলে ফেলা হয় ফারনেসের মধ্যে। লাস পড়ছে আর মাঝে মাঝে জ্বালানি তেল ভেজানো ন্যাকড়া দেওয়া হচ্ছে। নীচে কাঠ আছে, ওপরেও কাঠ।

একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে। হতভাগ্যদের জামাকাপড় ও জুতো তো আগেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ওদের মাথার চুল-গুলোও দরকার। টাইম বোমা বা ইচ্ছে করে দেরিতে ফাটাবার জন্যে যে বোমা তৈরি হয় তাতে চুল দরকার হয়।

সেজন্যে ওদের গ্যাস-চেম্বারে পাঠাবার আগে বা মৃত্যুর পর হোস পাইপের জল দিয়ে দেহ সাফ করে মাথার চুল কামিয়ে নেওয়া হয়।

মাথা কামাবার পর 'টুথ-পুলার'-এর দল আসে। তারা সোনা বাঁধানো দাঁতগুলি খুলে নেয়। সেই দাঁত একটা বাকসে জমা করা হয়। কারও হাতে আংটি থাকে, কারও কানে গহনা থাকে। এসবই খুলে নিয়ে বাকসে জমা করা হয়। তারপর সেই বাকস চলে যায় রাইখসব্যাংকে। গহনা থেকে হীরেও পাওয়া যায়। অবিশ্যি ওদের ট্রেনে তোলার আগেই দেহ থেকে সমস্ত গহনা ছিনিয়ে নেওয়া হয় তবুও পরে যা পাওয়া যায় তা কম নয়। এইভাবে প্রতিদিন ১৮ থেকে ২০ পাউণ্ড ওজন সোনা সংগৃহীত হয়। শহর থেকে যারা আসে তাদের দেহ থেকেই বেশি সোনা পাওয়া যায়।

দাঁতের সোনা গালিয়ে ফেলা হত কিন্তু ইয়াররিং, ব্রেসলেট, আংটি, হার, ঘড়ির চেন, চশমার ফ্রেম, মূল্যবান পাথর ইত্যাদি সব রাইখসব্যাংকে জমা পড়ত। হিমলার এবং রাইখসব্যাংকের প্রেসিডেণ্ট ডঃ ওয়ালটার ফুংক-এর মধ্যে এক চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তির বলে ঐসব সোনা 'ম্যাক্স হিলিজার'-এর নামে এস এস-এর জন্যে জমা পড়ত।

বিভিন্ন ক্যাম্পে আনা ইহুদিদের কাছ থেকে এইভাবে যে সোনা পাওয়া গিয়েছিল তার পরিমাণ এত বেশি হয়েছিল যে ১৯৪২ সালেই ব্যাংকের ভল্ট পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

এইসব কুঁচো সোনা ত সংগৃহীত হয়েছিল হতভাগ্যেরা ক্যাম্পে আসবার পর তাহলে তার আগে সারা জার্মানিতে যখন ইহুদিদের ওপর অত্যাচার, ধড়পাকড় ও তাদের বাড়ি লুঠতরাজ আরম্ভ হয়েছিল তাহলে সেই সময়ে কী পরিমাণ সম্পদ নাৎসীরা সংগ্রহ করেছিল।

এছাড়া তো তাদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছিল।

নাৎসীরা তো ইহুদিদের মানুষ বলেই জ্ঞান করত না। ঐ যে আগে বলেছি স্নান করবার জন্যে ও উকুন মারবার জন্যে তাদের যখন 'বাথ হাউসে' ঢুকিয়ে উলঙ্গ করা হত তখন কোনো কোনো ক্যাম্পে অর্কেষ্ট্রা বাজান হত।

আর ঐ যে বললুম বাগানে পাইপের মুখের ঢাকনা খুলে গ্যাস দিত। গ্যাস দেবার আগে তারা হাসতে হাসতে ঠাট্টার সুরে বলত: নাও হে এদের এবার কিছু দাঁতে কাটতে দাও। অপরজন অমনি সঙ্গে সঙ্গে সবুজ টিন থেকে হাইড্রোজেন-সায়ানাইডের দানা নলের মুখে ফেলে দিত।

মারাত্মক গ্যাস। জার্মানির তথা পৃথিবীর বৃহত্তম রাসায়নিক কারখানা আই জি এন ফারবেন ইণ্ডাস্ট্রিতে তৈরি হত। ট্রেড নাম ছিল জিকলন-বি (ইংরেজরা বলত সাইক্লন)। আই জি এন কারখানা এবং আরও দুটো কারখানাতে তৈরী হত।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে আজকাল বহু প্রচলিত সালফা ড্রাগও ঐ আই জি এন ফারবেন ইণ্ডাস্ট্রি কারখানার অবদান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই সালফা ড্রাগ হাজার হাজার সৈনিকের প্রাণ বাঁচিয়েছে এমন কি উইনস্টন চার্চিল যখন ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তখন এই সালফা ড্রাগ তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিল।

যাইহক মৃতদেহগুলিকে চুল্লীর মধ্যে ভরে চুল্লীর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। কুড়ি মিনিটের মধ্যে পুড়ে ছাই। এইভাবে দৈনিক হাজার হাজার ইহুদি হত্যা করা হয়েছে।

এই নারকীয় বর্ণনা এখন থাক। এখন একটা অন্য বিষয় আলোচনা করা যাক।

আমি ভোরে উঠে জানালায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতুম ট্রেন থেকে কত রকমেরই না মানুষ নামছে। তারা ভিন্ন দেশ থেকে তো আসছে বটেই তাদের চেহারার মধ্যেও কত পার্থক্য। তাদের মধ্যে যমজ আসত। আসত বামন আবার দৈত্যাকার মানুষও আসত।

যমজ কেন হয় এবং শরীরের ভেতর যে সব এণ্ডোক্রিন গ্ল্যাণ্ড আছে ক্ষরণের তারতম্যের ফলে বামন বা দৈত্যাকার মানুষ সৃষ্টি হয় তাতো আমরা ডাক্তারী বইতে পড়েছি।

কিন্তু এদের শরীরের ভেতরে ক্রিয়াকর্মের বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনো বিশেষত্ব আছে কি না সে বিষয়ে গবেষণা করার আমার অনেক দিনের ইচ্ছা, সুযোগ পাইনি। সুযোগ না পাওয়ার প্রধান কারণ যে গবেষণা কাজে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হবে এমন মানুষ চাই এবং তাদের দেহ চিরে দেখবার জন্যে সেই রকম দেহ-বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃতদেহ চাই। বামন ও দৈত্যাকার ব্যক্তি ব্যতীত এমন একজোড়া যমজ যদি পাওয়া যায় যাদের একই সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে তাহলে আমার কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর পেতে পারি।

আমার মনের কথা প্রকাশ করেই ফেললুম। ডাক্তার মেনজিলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখন অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। ডাক্তার আমার জন্যে রোজ এক প্যাকেট সিগারেটের ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবং কিছু কফি ও চিনিও পাঠিয়ে দিয়েছে।

আমি ডাক্তারের কাছে আমার সম্ভাব্য গবেষণার বিষয় উল্লেখ

করলুম। আমার হাতে তো সময় প্রচুর, এ কাজটা আমি করতে পারি।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে রাজি হল এবং বলল যে এরকম গবেষণা তার নিজেরই করবার ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু তার সময় কোথায়? ডাক্তার আমাকে উৎসাহ দিল এবং কয়েক দিনের মধ্যেই ডাক্তারের সাহায্যে আমি একটা প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরি করতে পারলুম। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও কেমিক্যাল ইত্যাদি সবই পাওয়া গেল।

অসউইজ ক্যাম্পের ভেতরে যে সব ইহুদি আসে তাদের তো মৃত্যুর খাতায় নাম উঠেই থাকে এবং ক্যাম্পে প্রবেশ করার একঘণ্টার মধ্যেই এক দলকে গ্যাস-চেম্বারে পোরা হয়।

আর একদল যারা নাকি শক্ত সমর্থ তাদেরও মরতে হয় তবে কয়েকটা মাস পরে। অনাহার ও পরিশ্রমে তখন তাদের আর মানুষ বলে চেনা যায় না।

ডাক্তার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে। ট্রেন এলে যখন মানুষ বাছাই করা হয় সেই সময় যমজ, বামন, দৈত্যাকার বা অদ্ভুতদর্শন পুরুষ বা নারীকে আলাদা করা হয়। শিশুদের অনেক সময় তাদের মায়েরা ছাড়তে চায় না কিন্তু যখন তাদের বলা হয় যে চিকিৎসার জন্যে এদের হাসপাতালে পাঠান হবে তখন তারা রাজি হয়।

এরা হল সব আমার নমুনা। এদের আলাদা দলে রাখা হয় তারপর তাদের ব্যারাকের পৃথক একটি অংশে রাখা হয়। তাদের নিজস্ব পোশাকই তারা পরে থাকে তবে অন্য বন্দীদের সঙ্গে তাদের দেখাসাক্ষাৎ বা কথাবার্তা নিষিদ্ধ এবং সত্যিই অন্য বন্দীরা এদের যাতে দেখতে না পায় তার ব্যবস্থাও করা আছে। এদের ভাল খেতে দেওয়া হয়। বাংকে শুতে দেওয়া হয় এবং স্যানিটারি ব্যবস্থাও আছে।

১৪ নম্বর ব্যারাকের 'এ' ক্যাম্পে ওদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে এস এস গার্ডদের কড়া পাহারায় জিপসি

ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে ওদের নানারকম পরীক্ষা করা হয়, যেমন ব্লাড টেস্ট, লাম্বার পাংচার, যমজ ভাইদের মধ্যে রক্ত বদলাবদলি করে দেখা এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ কিছু কঠোর পরীক্ষা।

ডঃ এপষ্টিন এবং ডঃ বেনডেলের সঙ্গে জিপসি ক্যাম্পে ডিনা নামে সেই যে মেয়ে আর্টিস্টটি থাকে সে ওদের নাক, মুখ, কান ইত্যাদির গঠন, মাথার খুলির আকৃতি, হাত ও পায়ের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির ছবি আঁকে।

জীবন্ত মানুষের ওপর এই যে সব পরীক্ষা করা হয়, ডাক্তারী শাস্ত্রে তাকে বলে 'ইন ভাইভো'। 'ইন ভাইভো' পরীক্ষা হয়ে গেলে তাদের মৃতদেহ চেরাই করে দেহের ভেতরটা দেখার দরকার হয়। মেডিক্যাল কলেজে বা সাধারণ গবেষণাগারে এই সুযোগ পাওয়া যায় না।

সব রকম 'ইন ভাইভো' পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আমি ডাক্তার মেনজিলকে খবর পাঠিয়ে দিতুম। এই খবর পাঠাবার সময় সত্যিই আমার মন খুব খারাপ হয়ে যেত। আমিই যেন এই হতভাগ্য মানুষগুলির মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তাদের গ্যাস চেম্বারে পাঠাচ্ছি।

অথচ তারা তো অনেক আগেই মরে যেত তবুও তো পরীক্ষা ও গবেষণা করার সূত্রে তাদের যতদিন সম্ভব বাঁচিয়ে রেখেছি।

ডাক্তার মেনজিল তো ইতিমধ্যে 'ক্রিমিন্যাল ডক্টর' এই খ্যাতি অর্জন করেছিল কারণ অসউইজ ক্যাম্পে এই হাজার হাজার নরনারীর মৃত্যুর জন্যে ডাক্তার মেনজিলই যেন দায়ী।

আমার গবেষণায় ডাক্তারের আগ্রহ খুব বেশি। ডাক্তার রোজ আমার ল্যাবরেটরিতে আসত। আমার সঙ্গে সময় সময় কাজও করত এবং রিপোর্টও পড়ত।

রিপোর্টগুলি আমি লিখতুম বড় হাতের অক্ষরে কিন্তু কি জানি কেন ডাক্তার আমার বড় হাতের অক্ষর পড়তে পারত না। আমি এইভাবেই লিখতে শিখেছিলুম অ্যামেরিকায়।

১৯৩৯ সালের গোড়ায় একটা মেডিকাল ডেলিগেশনের সঙ্গে আমি অ্যামেরিকা গিয়েছিলুম, ছিলুম ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই সময়েই আমি ঠিক করেছিলুম যে আমার স্ত্রী ও কন্যাকে অ্যামেরিকায় নিয়ে এসে অ্যামেরিকায় বসবাস করব। সেইজন্যে আমি অ্যামেরিকা থেকে দেশে ফিরলুম কিন্তু তখন যুদ্ধের পরিস্থিতির জন্যে অ্যামেরিকায় ফিরতে তো পারলুমই না উলটে চলে আসতে হল ফাঁসির আসামী হয়ে সপরিবারে অসউইজ ডেথ ক্যাম্পে।

ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞাসা করল : টাইপ করতে জান ?

জানি বই কি।

কি টাইপরাইটার ব্যবহার করতে ?

অলিমপিয়া এলিট।

ঠিক আছে, আমি কালই তোমাকে একটা টাইপরাইটার পাঠিয়ে দোব। তুমি এবার থেকে তোমার সমস্ত রিপোর্ট টাইপ করে রাখবে।

বেশ তাই করব, আমি বললুম।

শোনো, ডাক্তার বলল, আমি দেখছি যে তুমি কিছু কিছু গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করতে পেরেছ। আমি তোমার রিপোর্টগুলি বারলিন-ডালেম-এর ইনস্টিটিউট অফ বায়োলজিক্যাল, রেসিয়াল অ্যাণ্ড ইভলিউশনারি রিসার্চ-এ পাঠাব।

আমি খুবই উৎসাহিত হই কারণ এই ইনস্টিটিউট হল পৃথিবীর অন্যতম সেরা ও খ্যাতনামা। আমার পরীক্ষা নিরীক্ষায় ও রিপোর্ট লেখায় আমি আরও ভাল করে মনোযোগ দিতে থাকি।

ডাক্তার আমার রিপোর্ট এবং অনেক সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও নমুনা ঐ ইনস্টিটিউটে এবং অ্যানথ্রপলজিক্যাল ইনস্টিটিউটেও পাঠাত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি প্যাকেট করে যখন পাঠান হত তখন প্যাকেটের ওপর লিখে দেওয়া হত 'ওয়ার মেটিরিয়াল : আর্জেণ্ট'।

ডাক্তার মেনজিলের কাছ থেকে আমি সবরকম সাহায্য ও সহযোগিতা পেতে থাকলুম। উক্ত দুটি ইনস্টিটিউটে আমার কাজ

প্রশংসিত হচ্ছিল। কিছু কিছু নতুন কাজ করতে গেলে করা অনেক জিনিস আগে ঠিক বোঝা যেত না, এখন এইভাবে রক্ত পাওয়ার ফলে অনেক জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

আমি মৃতদেহ চিরে যেসব নতুন তথ্যের সন্ধান পাচ্ছিনা হেলাফেলা করার মতো নয়। কিন্তু আমি জার্মান নই। আমি এখন ঘৃণিত ইহুদি অতএব আমার এই সমস্ত রিপোর্ট ইনস্টিটিউট কষ্টে প্রকাশ করবে না এবং যেহেতু আমি ইহুদি, আমার নামও উল্লেখ করবে না।

আমার মনে হতে লাগল যে আমার গবেষণা করা শেষ হলে ডাক্তার আমাকে গ্যাস চেম্বারে পাঠিয়ে দেবে। যারা আইনস্টাইন, ফ্রয়েড প্রমুখ মনিষীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে তারা তো আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবেই। অতএব আমার দিন ঘনিয়ে আসছে। তবুও আমার কাজ নিয়মিত করে যেতে লাগলুম। ফাঁকি দিতে শিখিনি, এখনও ফাঁকি দিচ্ছি না যদিও বুঝতে পারছি যে আমার দিন ঘনিয়ে আসছে।

সেদিন কাজ সারতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। ডাক্তার মেনজিলও একটু আগে চলে গেল। সেদিন যে কয়েকটা লাস পোস্ট মর্টেম করা হয়েছিল সেগুলোর রিপোর্ট পড়ল, কিছু মন্তব্য করল। কোথাও লাল পেন্সিলের দাগ দিল।

আমি এবার রিপোর্ট টাইপ করে দিয়েছিলুম। ডাক্তার বলল এবার থেকে রিপোর্ট আমি যেন টাইপ করে দিই।

ডাক্তার চলে যাবার পর আমি আমার অস্ত্রগুলি ধুয়ে গুছিয়ে তুলে রাখলুম। টাইপরাইটার বন্ধ করে আলমারিতে তুলে রেখে সবে একটি সিগারেট ধরিয়েছি, আর কোথায় এক রমনীর তীব্র ও করুণ আর্তনাদে আমার সারা দেহ যেন হিম হয়ে গেল।

১৯৩৭ নাদ শেষ হবার আগেই একটা গুলির আওয়াজ এবং তার আমি একটা দেহ পতনের শব্দ।

এই মিনিটখানেক পরেই আবার করুণ আর্তনাদ, আবার গুলির অ্যাওয়াজ এবং লাস পড়ার শব্দ। মর্মান্তিক কিছু একটা ব্যাপার আনিছ।

জন্যে আওয়াজটা আসছে ডিসেকটিং রুমের পাশের বড় ঘরটা থেকে। হল। ঠিক ঘর নয়, একটা গুদোম ঘর। চেরাই করবার আগে আমি ঘরে লাস রাখবার ব্যবস্থা করি। এ ছাড়া বন্দীদের পরিচ্ছদ ও অন্য জিনিষও এই ঘরে জমা করে রাখা হয়। ঘরটার ওধারে নিকটা খোলা জায়গা আছে।

আর্তনাদ সব ক্ষেত্রে শুনতে পাই নি। অনেক হতভাগী হয় তো ভয়ে চিৎকার করতেও ভুলে গেছে, হয় তো নীরবে অশ্রুমোচন করছে। তবে গুলির আওয়াজ শুনেছিলুম সত্তরবার। তাহলে কি সত্তরজন হতভাগীর জীবনলীলা আজ শেষ হল? গুলি কেন? গ্যাস কি ফুরিয়ে গেছে?

গুলির আওয়াজ যখন থেমে গেল, আর গুলির আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল না, সব চুপ তখন আমিও যেন আমার জ্ঞান ফিরে পেলুম। কতক্ষণ কেটেছে জানি না। ঘরে আলো জ্বালা হয় নি। আমি সেই একই স্থানে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে ছিলুম। সিগারেটটা টানতে ভুলেই গিয়েছিলুম। সেটা হাতেই রয়ে গিয়েছিল এবং পুড়তে পুড়তে প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। আমি সেটা ফেলে দিলুম।

তারপর পাশের ঘরে এলুম। এ ঘরেও আলো জ্বলছে না। আলো আঁধারিতে যা দেখলুম তাতে আমার সারা দেহ শিউরে উঠল। সারা ঘর জুড়ে এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে সত্তরটি উলঙ্গ রমনীর মৃতদেহ। দেহগুলি রক্তাপ্লুত। সে এক বীভৎস দৃশ্য। লাসগুলি কখন নিঃশব্দে রেখে গেছে, টের পাইনি।

সত্তরটি নির্দোষ, অক্ষম, দুর্বল, অসহায় নারীকে নৃশংসভাবে হত্যা

করা হয়েছে। সকল হতভাগীর তখনও মৃত্যু হয় নি। কয়েকজনের মধ্যে তখনও প্রাণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তবে বেশিক্ষণ নয়। তাদের মৃত্যু যন্ত্রণা অচিরেই শেষ হবে।

তাহলে গ্যাস চেম্বারে এবং ক্লোরোফরম বা বেঞ্জিন ইনজেকশন দিয়ে হত্যা ব্যতীত এইভাবে ঘাড়ে গুলি করেও হত্যা করার তৃতীয় একটি পদ্ধতিও রয়েছে।

কয়েকটি মৃতদেহ আমি নেড়েচেড়ে দেখলুম। লক্ষ্য করলুম যে প্রতি ক্ষেত্রেই ঘাড়ের স্পাইনাল মেডালা অংশে স্মল-ক্যালিবার বুলেট দিয়ে গুলি করা হয়েছে। এই বুলেটকে বলা হয় সফট বুলেট এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় না। কিছু সময় লাগে। তাই যাদের মধ্যে প্রাণের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল তাদের বোধহয় শেষের দিকে গুলি করা হয়েছে। এই গুলি সাধারণতঃ মাথার খুলিতে আটকে থাকে, দেহ থেকে বেরিয়ে যায় না। গুলিটা সেই ভাবেই করাও হয় যাতে একটা পথ ধরে চলে আটকে যায় এবং গুলি এমনভাবে তৈরি বা ওর জোর এমনভাবে কমিয়ে রাখা হয়েছে যে ঐ গুলি দেহ ভেদ করতে পারে না। কয়েক ক্ষেত্রে অবশ্য গুলি নির্ধারিত পথ থেকে কিছু সরে গেছে। তার কারণ যে জল্লাদ গুলি করেছে তার হাত হয়ত কেঁপেছিল।

কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই মৃত্যুপুরীতে একা দাঁড়িয়ে আমি আমার পত্নী ও কন্যার কথাই ভাবতে লাগলুম। তারা কি এখনও আছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে আমি পাশে খোলা জায়গায় গেলুম। সেখানে সনডারকমানডোর কয়েকজন লোক দাঁড়িয়েছিল। একজনকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম এইসব মেয়েদের কোথা থেকে আনা হয়েছে?

সে বলল ওদের আনা হয়েছে সি সেকশন থেকে। প্রতিদিনই ট্রাকে করে সত্তরজন মেয়ে আনা হয় এবং তাদের ঘাড়ে গুলি করে হত্যা করা হয়।

আমার মাথা ঘুরতে লাগল, গলা শুকিয়ে গেল। প্রতিদিন? এই

ভাবে নারী হত্যা হয়? যে জল্লাদ গুলি করে সে পাগল হয়ে যায় না? সে মানুষ নয় নিশ্চয়। পিশাচ ছাড়া আর কি হতে পারে?

মুখ তুলে চেয়ে দেখলুম এক নম্বর ক্রিমেটোরিয়মের চিমনি জ্বলছে না। দুই, তিন ও চার নম্বর ক্রিমেটোরিয়মের চিমনি থেকে যথারীতি অগ্নিশিখা অন্ধকার আকাশটাকে আলোকিত করছে। কাজকারবার তাহলে নিয়মিতই চলছে।

আমি আর দাঁড়াতে পারলুম না।

পিছনে গোলমাল শুনে ফিরে চাইলুম। সনডারকমানডোর কর্মীরা একটা ফুটবল এনেছে। তারা এখন আলো জ্বেলে খেলবে। তাদের উল্লাসে মাঠ ভরে উঠল। ওরা নির্বিকার। এইসব করুণ মৃত্যু ওদের স্পর্শ করতে পারে না। ওরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ওরা তো জানে যে চার মাস পূর্ণ হলেই ওদেরও মরতে হবে।

সেদিন রাত্রে ভাল করে খেতেই পারলুম না। শুতে যাবার আগে দুটো স্লিপিং ট্যাবলেট খেলুম।

স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমোলেও ঘুম গভীর হয়নি। সকালে যখন উঠলুম মাথা বেশ ভারি। এখানে, এই নতুন বাড়িতে স্নানের ব্যবস্থাটা বেশ ভালই।

এই ভাল ব্যবস্থা করা হয়েছে সনডারকমানডোর কর্মীদের জন্যে। মড়া পোড়ানোর ও পোড়াবার পর ওদের চুল্লী সাফাইয়ের কাজ করতে হয়। ওদের দু'বার করে স্নান করতেই হয়।

একটা বড় হলের মাথায় পরপর দশ বারোটা বড় বড় শাওয়ার লাগানো আছে। ভিশ্চুলা নদী থেকে জল পাম্প করে আনা হয়। অঢেল জল।

প্যান্ট খুলেই সবাই ঘরে ঢুকছে তারপর ট্যাপ খুলে শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে পড়ছে। এই স্নানটুকু ওদের বিলাস। আমিও ঐ

শাওয়ারে স্নান করে নিলুম। মাথা হালকা হয়ে গেল। শরীর শীতল হল।

আমাকে একটা মেডিক্যাল ব্যাগ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ব্যাগ নিয়ে আমাকে রাউণ্ডে যেতে হবে। সনডারকমানডো বা এস এস গার্ডদের ব্যারাকে এবং অন্যত্র যেতে হবে। চারটে ক্রিমে-টোরিয়মে ওদের ব্যারাক আছে। বেশ খানিকটা পথ হাঁটতে হবে।

রাউণ্ডে বেরোবার আগে মেডিক্যাল ব্যাগটা একবার খুলে দেখে নিলুম। স্টেথোস্কোপ আছে, ব্লাড প্রেসার মাপার যন্ত্র আছে, ইঞ্জেকশন দেবার জন্যে সিরিঞ্জ আছে, কয়েকটা অ্যামপুল, অ্যালকোহল এবং জরুরী প্রয়োজনের জন্যে ওষুধ, তুলো, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদিও আছে।

আমার নিজের বিল্ডিং নিয়েই প্রথম রাউণ্ড আরম্ভ করলুম। প্রথমেই গেলুম এস এস গার্ডদের কোয়ার্টারে। এদের মধ্যে অসুস্থ মানুষের সংখ্যা কম তবে বিশ্রাম পাবার আশায় অনেকে অসুস্থতার ভান করে। তবে ওরা অনিদ্রা বা স্নায়বিক চাপে ভোগে। সিডেটিভ ট্যাবলেট কয়েকটা দিলেই ওরা ঠিক হয়ে যাবে।

গ্যাস চেম্বারে যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে অনেক রকম ওষুধ পাওয়া গিয়েছিল। একজন কর্মী সেইসব ওষুধ একটা ঝুড়িতে রেখে দিয়েছিল। শিশিভর্তি নানারকম ট্যাবলেট।

আমাকে একজন সনডার কর্মী সেই ঝুড়িটি দিল। ওষুধগুলি বেশির ভাগ সিডেটিভ। তবে বিভিন্ন দেশের; গ্রীস, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, বিভিন্ন ভাষায় নাম লেখা আছে।

ইহুদিদের ধরবার আগেই তো তাদের ওপর ঝড় বইছিল। প্রায় সকলেই নারভাস টেনসনে ভুগত। নার্ভ শান্ত রাখবার জন্যেই সিডেটিভের প্রয়োজন। ওষুধগুলি আপাততঃ আমার ঘরে পাঠিয়ে দিলুম। পরে মেনজিলকে জিজ্ঞাসা করব এগুলি নিয়ে কি করা হবে।

এস এস-দের কোয়ার্টার থেকে সনডারকমানডোদের কোয়ার্টারে এলুম। আমি যা আশা করেছিলুম এরা তার চেয়ে অনেক ভাল

অবস্থায় আছে। এদের শোবার জন্যে পরিষ্কার বিছানা, চাদর ও কম্বল দেওয়া হয়েছে। ব্যারাকটাও পরিষ্কার, ভাল খাবার দেওয়া হয়। কাজ আদায় করতে হবে ত!

এদের মধ্যে রোগবালাই বিশেষ নেই। ঐ শুধু নারভাস টেনশন আর অনিদ্রা। হাত পা কিছু কেটে যাওয়া, ছড়ে যাওয়া, আগুনে পুড়ে ফোসকা ও তা থেকে ঘা দু একজনের হয়।

নারভাস টেনশনে ভুগবেই তো। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ কি ভাবে মরছে তা তো এরা জানে। তার ওপর আছে নিজেদের পরিবারের জন্যে চিন্তা। তারা তো এই নরক ক্যাম্পেই আছে। আছে না গেছে কে জানে। থাকলেও কি অবস্থায় আছে তাও তারা জানে না। অতএব দুশ্চিন্তাতে তো ভুগতে হবেই।

সনডারকমানডোর কর্মীরা অধিকাংশই যুবক। তাদের একটা অতীত আছে কিন্তু ভবিষ্যত যে কি তাতো তারা জানে। ক্যাম্প থেকে ক্রিমেটোরিয়মে এলেই তারা জানে যে এই তারিখ থেকে যেদিন চার মাস পূর্ণ হবে সেদিন তাদের লীলাখেলা শেষ।

সেই তারিখে রাইফেল হাতে ও মেশিনগান নিয়ে এস এস গার্ডরা আসবে তারপর তাদের ভেড়ার মতো জড়ো করে মাঠে নিয়ে যাবে এবং তারপর টার্ টার্ টার্ টার্ করে মেসিনগান চলবে।

আধঘণ্টা পরে নতুন একদল সনডারকমানডো আসবে। মৃতদেহ থেকে সমস্ত পোষাক খুলে নেবে এবং একঘণ্টার মধ্যে লাসগুলি ছাইগাদায় পরিণত হবে। এই মড়া পোড়ানো দিয়েই নতুন দলের হাতে খড়ি দেওয়া হয়।

তারপর আবার চার মাস শেষ হবে। এ দল ছাইগাদা হবে, আর এক দল আসবে।

এই জন্যে আমি ওদের ব্যারাকে গেলে সনডারকমানডোর অনেক ছোকরা চুপি চুপি আমার কাছে এগিয়ে আসত তারপর ফিস ফিস

করে কোনো বিষের বড়ি চাইত। আমি দিতে পারতুম না কিন্তু দিলে বোধহয় ভাল করতুম।

এরপর দু' নম্বর ক্রিমেটোরিয়মে, খানিকটা তফাতে। প্ল্যান ও ডিজাইন একই রকম। তফাত হল এইটুকু যে দু'নম্বরের ডিসেকটিং রুমটি অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়। এই রুমে সোনা গালাই করা হয়।

হতভাগা ইহুদিদের সোনা বাঁধানো দাঁতগুলি তো খুলে নেওয়া হয়ই তাছাড়া দেহতল্লাসী করে চশমার সোনার ফ্রেম, স্বর্ণমুদ্রা, আংটি ও কানের গহনা কেড়ে নেওয়া হয়। বড় বা ভারি গহনা সে সব তো এখানে আসবার আগেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ছোটখাট যে গহনা পাওয়া যায় এবং দাঁতের সোনা, এই গালিয়ে চারটি ক্রিমেটো-রিয়ম থেকে দৈনিক পাওয়া যায় ৬৫ থেকে ৭৫ পাউণ্ড খাঁটি সোনা। কিছু দামী পাথরও পাওয়া যায় তবে সেগুলি বা মূল্যবান আর কিছু যদি পাওয়া যায় তাহলে সেগুলি অন্যত্র জমা দেওয়া হয়।

সব সোনা গালাই ঘরে গিয়ে পৌঁছায় না। যে সব ডাক্তার বা সহকারী সোনা বাঁধানো দাঁত খোলে তারা কিঞ্চিৎ সোনা পকেটে লুকিয়ে রাখে।

মৃত্যুপথযাত্রী সনডারকমানডোর ডাক্তার বা তাদের সহকারীরা এই সোনা নিয়ে কি করবে? তাদের কি কাজে আসবে? এটা আমি ঠিক বুঝতুম না। পরে জানলুম এই টুকরো সোনা সনডারকমানডোদের পকেট থেকে যায় এস এস গার্ডদের পকেটে।

এঞ্জিনের ড্রাইভার বা ঠিকাদারদের ড্রাইভারের সঙ্গে এস এস গার্ডদের যোগাযোগ আছে। সেই সোনার বিনিময়ে বাইরে থেকে গোপন পথে আসে সিগারেট, খবরের কাগজ, কিছু চিজ কিছু হ্যাম বা বেকন।

বিপদ আছে পদে পদে। যদি কোনো সনডারকমানডোর দেহে সামান্য কুঁচি সোনাও পাওয়া যায় তাহলে তাকে প্রচণ্ড শাস্তি পেতে

হয়। তবে একদল এস এস গার্ড সহযোগিতা করে সিগারেটের লোভে। তাদের বরাদ্দ মাত্র দু'টি সিগারেট কিন্তু এই পথে অনেক সিগারেট এবং সময় সময় সুরাও পাওয়া যায়।

খবরের কাগজও আসত এই পথে। খবরের কাগজ পড়বার সুযোগ সবাই পেত না, দু একজন পেত, যেমন আমি। আমি সেই খবর পড়ে একজনকে বলে দিতুম, সে আর একজনকে, এইভাবে যুদ্ধের শেষ খবর সারা অস্‌উইজ ক্যাম্পে দৈনিক প্রচারিত হত।

পুরুষ বা মহিলা বন্দীদের তো দুর্দশার শেষ ছিল না। গোরু ছাগলও এদের চেয়ে অনেক ভাল অবস্থায় থাকে। ছাতা ধরা রুটি. পচা মারগারিন, কখনও কখনও এক আধ টুকরো আলু বা পেঁয়াজ, স্যুপ নামে কিসের যেন একটা ঝোল দেওয়া হত। তাই কেউ এক আধ টুকরো আলু বা পেঁয়াজ বেশি পেয়ে গেলে তাদের মধ্যে সময় সময় মারামারি লেগে যেত।

যে ছিল কারখানার মালিক সে হয়তো তারই ড্রাইভারের সঙ্গে আলুর টুকরো নিয়ে মারামারি করছে, যে ঝি-গিরি করত সে হয়তো এক জমিদার গৃহিনীর গালে একটা চড় কসিয়ে দিল।

সবাই তো ভেড়া ছাগল হয়ে গেছে। কাউকে তো চেনবার উপায় নেই। মাথায় চুল না থাকলে কি হয় গা ভর্তি উকুন। গায়ে যা লেপটে আছে সেটি শতছিন্ন।

একটা ক্রিমেটোরিয়মের গেট থেকে কিছু দূরে ৫০০ মেয়ে কাজ করত। তারা ছিল রাস্তা তৈরি করার দলে। তাদের পাহারা দিত দু'জন এস এস গার্ড আর চারটে পুলিস ডগ। এদের কাজ ছিল থলেতে ভর্তি করে পাথর কুঁচি বয়ে আনা।

এই সময়ে সনডারকমানডোর কিছু পুরুষ কর্মী এস এস গার্ডদের সহযোগিতায় মেয়েদের কিছু কিছু সামগ্রী পাচার করে দিত যেমন রুটি, বেকন বা সিগারেট।

বলা বাহুল্য এস এস গার্ডরা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকত।

কারণ সে তো তার ভাগ আগেই আদায় করে নিয়েছে। পুরুষ কমানডোরা এইভাবে যতদূর পারত মেয়ে বন্দীদের খাবার ও সিগারেট সরবরাহ করত।

আমি নিজেও ওদের অনেক সাহায্য করেছি। আমার স্টোর-রুমে প্রচুর পরিমাণে মালটিভিটামিন ট্যাবলেট ছিল, সালফা ট্যাবলেট এবং অন্য ওষুধও ছিল।

আমি রাউণ্ডে গেলেই ওদের ঐ সব ট্যাবলেট খাইয়ে আসতুম। অনেকেরই দেহে চুলকানি বা ঘা হত। তারজন্যে ওষুধও দিয়ে আসতুম। ওরা তো মরবেই জানি। যে কোনোদিনই তাদের গ্যাস চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হবে। তবু একটু যদি আরাম পায়।

হয় তো খবর এল যে অমুক ব্যারাকের অমুক ইউনিটে খাবার কম পড়ে গেছে কিংবা কোনো রোগে একই দিনে বেশ কয়েকজন মারা গেছে। মড়ক লেগে যেতে পারে। অতএব সেইসব ইউনিটের সমস্ত বন্দীদের তখনই গ্যাস-চেম্বারে নিয়ে যাও। সংখ্যায় ৫০০ হতে পারে আবার পাঁচ হাজারও হতে পারে। সেইদিনই তাদের খতম করে দেওয়া হল। দু'দিন আগে আর পরে। এইতো!

যাইহক আমি একে একে আমার রাউণ্ড শেষ করলুম কিন্তু কি দেখলুম! আমি নিজেও বোধহয় আর মানুষ নেই। নইলে এইসব মর্মান্তিক দৃশ্য সহ্য করছি কি করে? আমি যদি কোনো দিন এখান থেকে ছাড়া পাই এবং আমার এই তিক্ততম অভিজ্ঞতা নিয়ে কোনো বই লিখি তাহলে আমার স্থির বিশ্বাস যে সেই কাহিনী কেউ বিশ্বাস করবে না।

একটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটল।

নিজের ঘরে একা বসে খবরের কাগজ পড়ছি। পুব আর দক্ষিণ ফ্রণ্টে জার্মানির অবস্থা সঙ্গীন, পশ্চিম ফ্রণ্টেও সুবিধের নয়। জার্মানি কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। মিত্রশক্তির বিমানহানা বেড়েই চলেছে।

আমাদেরও ভয় বাড়ছে। অসউইজ, বেলজেন প্রমুখ নরক ক্যাম্পগুলি জার্মানি নিশ্চয় প্রদর্শনী করে সাজিয়ে রাখবে না। রুশ ও মার্কিনরা আর একটু এগোলেই মুহূর্তে নাৎসীরা এই বর্বর ক্যাম্পগুলি ধ্বংস করবে। বন্দীসমেত বোমা মেরেই উড়িয়ে দেবে। জার্মান বিমান-বাহিনীর বিমান কোনদিন এসে বোমা ফেলে সেই ভয়ে আমরা শংকিত।

ঘরের বাইরে করিডরে ভারি বুটের আওয়াজ হতেই আমি খবরের কাগজখানা লুকিয়ে ফেললুম। ঘরে ঢুকল ক্রিমেটোরিয়ম কমাণ্ডার।

আমি উঠে দাঁড়ালুম। স্বয়ং কমাণ্ডার যখন এসেছে তখন গুরুতর কিছু ঘটেছে বোধহয়। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই কমাণ্ডার বলল :

আজ বেলা দু'টোয় একটা জরুরী কমিশন আসবে, ডিসেকটিং রুম রেডি রাখবে। কমিশনের মেম্বারদের বসবার ব্যবস্থা করে রাখবে।

কিসের কমিশন? কতজন আসবে? কি জন্যে? কমাণ্ডার কিছুই বলল না। কথা শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষাও করল না। কথাগুলো আমি ঠিক বুঝেছি কি না জানা যে প্রয়োজন তাও বোধ করল না।

বেলা দু'টো বাজবার কয়েক মিনিট আগে কালো কাপড় ঢাকা ঠেলাগাড়ী ডিসেকটিং রুমে এসে ঢুকল। কালো কাপড়খানা তুলতে একটা বাক্স দেখা গেল। বাক্সের মধ্যে একটি মৃতদেহ।

কার মৃতদেহ? কোনো বন্দীর মৃতদেহ নিশ্চয় এমন যত্ন করে আনা হবে না। তবে কার মৃতদেহ?

মৃতদেহটা ডিসেকটিং টেবিলের ওপর রাখা হল। তখনও তার পরিধানে পুরো ইউনিফরম রয়েছে। তাই দেখে বুঝলুম লোকটি একজন এস এস ক্যাপটেন এবং একজন জার্মান।

দু'টো বাজার সঙ্গে সঙ্গে কমিশন এসে হাজির। কমিশনের

মেম্বারদের প্রত্যেকের ইউনিফরম বা পোশাক বেশ কেতাদুরস্ত, নিভাঁজ উত্তম বস্ত্রের তৈরী। দলে আছে উচ্চপদস্থ একাধিক এস এস অফিসার একজন এস এস মেডিকাল কোর কর্ণেল, একজন জজ অ্যাডভোকেট, দু'জন গেস্টাপো অফিসার এবং একজন কোর্ট-মার্শাল রেকর্ডার।

এই দলে মেনজিল ছিল না। সে এল কয়েক মিনিট পরে।

আমি আগেই চেয়ার সাজিয়ে রেখেছিলুম। এখন প্রত্যেককে বসতে অনুরোধ করলুম। তারা বসল এবং নিজেদের মধ্যে কিছু আলাপ আলোচনা করল।

সকলে যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল তখন গেস্টাপো অফিসারেরা আমাকে বলল তাদের সহযোগী ঐ গেস্টাপো ক্যাপটেনের কি ভাবে মৃত্যু ঘটেছে।

তারা বলল যে কেউ তাদের বন্ধুকে খুন বা হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করেছে। হত্যা বলতে ওরা বোঝাতে চাইছে শত্রুপক্ষের কোনো ব্যক্তি গুলি চালিয়েছে অর্থাৎ যাকে বলে অ্যাসাসিনেশন। আত্মহত্যা করে নি কারণ ক্যাপটেনের রিভলভার তার কোমরের বেল্টেই ছিল এবং গুলিভর্তিই ছিল, একটাও গুলি খরচ হয়নি।

গেস্টাপো অফিসারদের মধ্যে একজন এটা খুন বলে মনে করছেন এবং সম্ভবতঃ অন্য একজন অফিসার এই কুকাজটি করেছে। কিংবা অধস্তন কোনো ব্যক্তিও খুনী হতে পারে, তার হয়তো কোনো নালিশ ছিল।

অপর গেস্টাপো অফিসার বিশ্বাস করে এটি অ্যাসাসিনেশন কারণ পোল্যাণ্ডের গ্লাইউইৎস শহরে বর্তমানে এটি প্রায়ই ঘটছে। একদল গেরিলা এই কাজ করছে।

মনে মনে উল্লসিত হলুম। তাহলে সক্রিয় গেরিলাদের আবির্ভাব ঘটছে। তারা কিছু বদলা নেবার চেষ্টা করছে।

লাস চেরাই করে নির্ধারণ করতে হবে গুলি কোনদিক দিয়ে প্রবেশ করে কোনদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সাধারণতঃ দেখা যায়

যে গুলি যেদিক দিয়ে প্রবেশ করে সেদিকের গর্ত ছোট এবং যেদিক দিয়ে বেরিয়ে যায় সেদিকের গর্ত বড় হয়। আপাতদৃষ্টিতে এই রকমই দেখা যায়।

কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে উভয় গর্তই সমান। সামনে দিক থেকে অথবা পিছন দিক থেকে গুলি করা হয়েছিল কি না ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আরও নির্ধারণ করতে হবে যে-অস্ত্রটি থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে সেটি কি ধরনের, বুলেটের ক্যালিবার কি? কত দূর থেকে গুলি করা হয়েছে? এইগুলি নির্ধারণ করতে হবে।

লোকটিকে তাহলে পোল্যাণ্ডের গ্লাইউইৎস শহরে হত্যা করা হয়েছে। গ্লাইউইৎস এখানে থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে।

ওরা বলল করোনারের যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ডাক্তার ঐ শহরে না থাকায় লাস এইখানে আনা হয়েছে। এখানে সন্তোষজনকভাবে ময়না তদন্ত করার ব্যবস্থা আছে জেনেই ওরা লাস এখানে নিয়ে এসেছে।

আমি ওদের কথা চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনছিলুম। বসবার সাহস হয় নি। প্রথমত আমি একজন প্রিজনার এবং দ্বিতীয়ত আমি ইহুদি, ওদের কাছে অস্পৃশ্য। আমি ওদের বিশেষ করে মেনজিলের আদেশ শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। আমি একবারও চিন্তা করি নি যে আমার মতো একজন ইহুদি ডাক্তারকে মৃত হলেও একজন জার্মান গেস্টাপো অফিসারের দেহে ছুরি চালাতে বলা হবে। ওরা যে শুদ্ধ ও পবিত্র আর্যজাতি আর আমরা ওদের কাছে রাস্তার ন্যাংলা কুকুরের চেয়েও অধম! জার্মানের দেহ স্পর্শ করার সাহসই আমরা রাখি না তো ছুরি ঠেকানো! ওরে বাবা! এতে ওদের দেহ নোংরা হয়ে যাবে না?

অতএব মেনজিল আমাকে যখন বলল: দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছ কি? কাজ আরম্ভ কর, কোট খোল। এপ্রন পর। হাত ধোও গ্লাভস পর।

আমি সত্যিই অবাক হলুম। এই ঘটনাকে আমি অবিশ্বাস্য মনে করি। কিন্তু বিপদে পড়লে অনেক অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হল।

প্রথম সমস্যা হল লাস থেকে ইউনিফরম খোলা। বুটটা খুলতেই তো দু'জন লোক লাগবে। যারা খুলবে তারা সনডারকমানডোর লোক এবং অস্পৃশ্য জু।

আমি মেনজিলের অনুমতি চাইলুম। সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দেওয়া হল। যতক্ষণে সেই গেস্টাপো ক্যাপটেনের ইউনিফরম খোলা হচ্ছিল এবং শবব্যবচ্ছেদের জন্যে দেহ রেডি করা হচ্ছিল ততক্ষণ কমিশনের কোনো মেম্বারই এদিকে একবারও দৃষ্টিপাত করে নি, তারা নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কিতে ব্যস্ত ছিল।

ভয়ে ভয়ে কাজ আরম্ভ করলেও একটু পরেই সহজ হলুম এবং যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কাজ করতে লাগলুম।

বুলেটের গর্ত দুটি ভাল করে পরীক্ষা করলুম। দুটি গর্তই সমান, ছোট বড় নয়। বুকে গুলি ঢুকে কাঁধের পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে, এই হল আমার অনুমান। গুলিটা বেরোবার সময় তার গতি খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছিল সেইজন্যে পরের গর্তটা বড় হয় নি। এই হল আমার অনুমান।

ডাক্তার মেনজিল বলল :

তা নয়, গুলি ঢুকেছে বুক দিয়ে, ক্যাপ্টেন মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে তখন আততায়ী পিছন দিকে গুলি করেছে।

আমি বললুম : এটা কি বললেন ডক্টর মেনজিল? তাহলে তো বডির ভেতরে দু'টি বুলেটই থাকবে কিন্তু বুলেট তো একটাও নেই।

ঠিকই তো। মেনজিল নিজের ত্রুটি সংশোধন করল। আমার কাজ ও মন্তব্য শুনে কমিশনের মেম্বাররা সন্তুষ্ট। তারা বলল ময়না-

তদন্তের জন্যে এবার থেকে সমস্ত লাস আমার কাছে পাঠান হবে। আমাকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হল। গ্লাইউইৎস ডিস্ট্রিক্ট এবং অসউইজ ক্যাম্পের আমি ফোরেনসিক মেডিসিন সংক্রান্ত ব্যাপারে করোনার নিযুক্ত হলুম।

কিন্তু কতদিনের জন্যে?

আর এক বীভৎস দৃশ্য আমাকে দেখতে হল। দেশে যখন নাৎসী-দের ওপর উৎপীড়ন শুরু হল তখন অনেক দুঃস্বপ্ন দেখে বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়েছে। স্বপ্ন দেখে ভয় পেলেও তবু মনে হয়েছে এতো স্বপ্ন।

কিন্তু স্বপ্নে যা দেখেছি তার চেয়ে ভয়ংকর কিছু যে বাস্তবে দেখতে হবে এমন কল্পনা আমার মনে স্থান পায় নি।

একদিন সকালে আমাকে টেলিফোন করে একটি 'শ্মশানে' যেতে বলা হল। সেই শ্মশানে যাদের দাহ করা হবে তাদের পরিত্যক্ত ওষুধ ও চশমাগুলি আমাকে এনে এক নম্বর ক্রিমেটোরিয়মে পৌঁছে দিতে হবে। ঐ সব ওষুধ শ্রেণীবিভক্ত করে জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান হবে।

ঐ শ্মশান, চার নম্বর ক্রিমেটোরিয়ম থেকে পাঁচ ছ'শো গজ দূরে বিরকেনাউয়ের বার্চ বনের ওপাশে। শ্মশানের চারপাশে পাইন গাছের বন। অসউইজ ক্যাম্পের বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবাহিত কাঁটাতারের বেড়া প্রায় শ্মশান পর্যন্ত চলে এসেছে।

ওখানে শ্মশান বলে কিছু ছিল না কারণ পোল বা জার্মানরা মৃতদেহ দাহ করে না। হতভাগ্য ইহুদিদের দেহ পোড়াবার জন্যে এই শ্মশান নাৎসীরাই করেছিল।

জিনিষগুলি বয়ে আনবার জন্যে দু'জন লোকও গেটপাস নিয়ে আমি অসউইজ ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়লুম। গেট থেকে বেরোবার

পরই বার্চ গাছের বনের ওপারে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পেলুম। সেই ধোঁয়া লক্ষ্য করে আমরা হাঁটতে লাগলুম।

এই ধোঁয়া প্রায় দিনরাত্রিরই দেখা যায়। রাত্তিরে আকাশটা লাল হয়ে থাকে। অন্ধকার অরণ্যের আড়ালে লাল আকাশ কোনো প্রেতরাজ্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

যেতে যেতে দেখলুম মাঝে মাঝে এস এস গার্ডরা পাহারা দিচ্ছে। যেসব হতভাগ্যদের ট্রেন থেকে নামিয়ে সরাসরি এই শ্মশানে নিয়ে আসা হয় তাদের মধ্যে থেকে যদি কেউ পুলিস ডগ এবং প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসে তাহলে তাদের এইসব গার্ডদের হাতে ধরা পড়তে হবে। সেইজন্যে শ্মশান থেকে দূরে হলেও এখানেও পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গার্ডরা আমাদের কিন্তু কোনো প্রশ্ন করল না বা পাস দেখতে চাইল না।

বার্চ গাছের বন পার হয়ে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা। তারপর পাইন বন। চারদিক বেশ শান্ত। আসলে ভেতরে যে বিরাট বধ্যভূমি আছে তা বোঝবার উপায় নেই।

পাইন বন পার হবার আগেই তারের বেড়া তবে ভেতরে ঢোকবার একটা গেট আছে। ক্রিমেটোরিয়মের গেটের মাথায় যেমন লেখা আছে এখানেও গেটের মাথায় তেমনি লেখা আছে :

বিনা কাজে প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এমন কি যে সব এস এস গার্ড এখানকার রক্ষী নয়, তাদেরও প্রবেশ নিষেধ।

যদিও বড় বড় অক্ষরে ঐ রকম একটি সাইনবোর্ড লেখা রয়েছে তবুও আমি আমার সঙ্গীদের নিয়ে গেট পার হলুম। ভয় কিসের? আমার সঙ্গে তো গেট পাস আছে। কিন্তু কেউ আমাদের গেট পাস দেখতে চাইল না। কোনো প্রশ্নও করল না কেউ।

তবে একটা কারণ আছে। যে এস এস গার্ডরা পাহারা দিচ্ছিল এবং যে সকল সনডারকমানডো ডিউটি দিচ্ছিল তারা সকলে

ক্রিমেটোরিয়মের লোক, এখানে ডিউটি দিতে এসেছে। সেইজন্যে আমাদের পাস দেখতে বা আমাদের কোনো প্রশ্ন করতে তাদের কোনো আগ্রহ দেখা গেল না।

গেট পার হয়ে আমরা এগিয়ে চললুম। একটা খোলা জায়গায় পৌঁছলুম। দেখে মনে হল জায়গাটা কোনো বাড়ির কম্পাউণ্ড ছিল। বেড়া ভেঙে ফেলা হয়েছে, গাছপালা এবং কিছু কাঠামো ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

আমার অনুমান অমূলক নয়। কারণ সামনেই বড়সড় একটা বাঙলো বাড়ি দেখলুম। বাড়িটা খুব পুরনো, অনেকদিন সংস্কার হয় নি।

এইখানেই বিরকেনাউ গ্রাম ছিল। এই বাংলোটা সম্ভবতঃ ঐ বিরকেনাউ গ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাছে অসউইজ ক্যাম্প স্থাপন করবার সময় গ্রামখানা ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে এবং গ্রামবাসীদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

সমস্ত বাড়ি ভেঙে ফেলা হল কিন্তু এই একখানা বাড়ি রাখবার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য আর কিছু নয়। কাছেই তো একটা শ্মশান করা হয়েছে। নানা কারণে বাড়িখানা কাজে লাগানো হবে। ঐ বাড়িতেই হতভাগ্যদের জামাকাপড় খুলে নগ্ন করা হয় এবং তাদের পরিত্যক্ত জামাকাপড়, জুতো এবং অন্যান্য সামগ্রী জমা রাখা হয়। ঝড়বৃষ্টি এসে গেলে গার্ড, ঘাতক ও কর্মীরা আশ্রয় গ্রহণ করে।

যখন চারটে ক্রিমেটেরিয়মে স্থান সংকুলান হয় না অথচ দ্রুত কয়েক শত বা হাজার ব্যক্তিকে ছাইগাদায় পরিণত করতে হবে তখনই এই শ্মশান কাজে লাগে। কিন্তু আমি তো আমার ঘর থেকে দেখতে পাই এদিকে সব সময়েই ধোঁয়া উঠছে। রাত্রে আকাশও লাল হচ্ছে। ঠিক আছে, থাক, বেশি কৌতূহল ভাল নয়। যা চলছে চলুক। বেশি জানলে বিপদ আছে।

কিন্তু এখানে মানুষগুলিকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

ক্রিমেটোরিয়মগুলিতে হতভাগ্যদের গ্যাস-চেম্বারে ঢুকিয়ে গ্যাস ছাড়বার আগে পর্যন্ত হতভাগ্যরা বুঝতে পারে না যে এবার তাদের মরতে হবে কিন্তু এখানে এসে পায়ার অর্থাৎ পর পর সাজানো চিতা ও ধোঁয়া দেখেই তারা বুঝতে পারে তাদের ভাগ্যে কি আছে। পোড়া মাংসর গন্ধ জানাতে কিছু বাকি রাখে না। চুল পোড়ার গন্ধও আছে। পরিবেশ ভয়াবহ!

আমি কি দেখলুম। প্রথমে তো দূর থেকে ধোঁয়া ও আগুণ দেখেছি। আরও কাছে আসতে পোড়া মাংস ও চুল পোড়ার গন্ধ নাকে ধাক্কা মারল। তখনই বুঝেছি কি বীভৎস দৃশ্য আমাকে দেখতে হবে।

কি যে দেখতে হবে তা কিন্তু আমি মোটেই অনুমান করতে পারি নি। আমি ভেবেছিলুম গিয়ে হয় তো দেখব যে সারি সারি কয়েক শত মৃতদেহ জ্বলছে কিন্তু যা দেখলুম তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

আমি দেখলুম একটা ফাঁকা মাঠে হাজার পাঁচেক হতভাগ্য নর-নারীকে জমায়েত করা হয়েছে। ভয়ে তারা বিহ্বল। কেউ অঝোরে কাঁদছে, কেউ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে, কেউ প্রার্থনা করছে। কেউ হাসছে, বোধহয় পাগল হয়ে গেছে।

আর এই হতভাগ্যদের ঘিরে রয়েছে লাইট মেসিনগান হাতে এস এস গার্ড আর নেকড়ের মতো হিংস্র পুলিস ডগ। যদি কেউ কোনো ফাঁক দিয়ে ছিটকে সরে পড়ে তাহলে পুলিস ডগের সতর্ক দৃষ্টি থেকে তাদের নিস্তার নেই।

চোখের পলক পড়ার আগেই পুলিস ডগ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তারপর গলার নলি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে।

ভীতিবিহ্বল জনতা থেকে মাঝে মাঝে তিন চারজন নরনারীকে সেই বাংলোর মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে তাদের উলঙ্গ করা হচ্ছে। যে রাজী হচ্ছে না তার চুলের মুঠি ধরে টেনে নেওয়া হচ্ছে। ঘুসি মারা হচ্ছে। চড় চাপট দেওয়া হচ্ছে, তারপর রাজি না হলে

জোর করে কাপড় খুলে নেওয়া হচ্ছে। যুবতী বা কিশোরী হলে তো অপমান ও লাঞ্ছনার শেষ নেই।

উলঙ্গ করে তাদের তখন ঘরের অন্য একটা দরজা দিয়ে বাইরে বার করে আনা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আর একদলকে ঘরে ঢোকানো হচ্ছে।

প্রথম দলকে গাছের আড়ালে বধ্যভূমিতে আনা হচ্ছে। পাশেই শ্মশান। জল্লাদ প্রস্তুত।

সনডারকমানডোর লোক হতভাগ্যদের হাত ধরে টেনে এনে সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে আর জল্লাদের দল খুব কাছ থেকে তাদের ঘাড়ে একটা করে গুলি করছে।

কেউ সঙ্গে সঙ্গে মরছে কারও হয় তো মরতে দেরি হচ্ছে। তাতে কি? পাশেই লম্বা লম্বা নালায় চিতা সাজানো আছে। আগুনও জ্বলছে।

গুলির শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সনডারকমানডোর লোক মানুষ-টাকে চিতার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। অন্য দল তাদের ওপর আরও কাঠ, জ্বালানি তেল মাখানো ন্যাকড়া ফেলে দিচ্ছে। দাউ দাউ করে চিতা জ্বলে উঠছে।

করুণ ক্রন্দন। এস এস গার্ডদের চিৎকার। কাঠ ফাটার আওয়াজ ও পোড়া মাংসের দুর্গন্ধ। সে এক ভয়ংকর পরিবেশ। এমন নৃশংস দৃশ্য সহ্য করা যায় না। ইচ্ছে হচ্ছিল পালিয়ে যাই। কিন্তু আমার সে সাহস হল না।

হঠাৎ দেখি একটি উলঙ্গ ক্ষিপ্ত যুবতী তার রক্ষীর হাত ছাড়াবার চেষ্টায় তার পা ও অপর মুক্ত হাত দিয়ে প্রহরীকে আঘাত করছে। অদূরে এক বৃদ্ধা হাত নেড়ে কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না।

যুবতী হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল তারপর প্রহরীকে অনুনয় করে বলল ঐ বৃদ্ধা রমনী তার মা, তাকে তার মায়ের পাশে নিয়ে যেতে। মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে সে মরতে চায়।

তার ভাষা রক্ষী বুঝল না। সে টানতে লাগল মেয়েটিকে। কাছে ছিল একজন এস এস গার্ড, তার হাতে ছিল একটা পিস্তল। সেও কিছু বুঝল না। সে মেয়েটির মাথায় পিস্তলের নল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপল।

রক্ষী মেয়েটির হাত ছাড়েনি। মেয়েটি মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। রক্ষী তাকে মাটিতে পড়তে দিল না। দেহটাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে চিতায় ফেলে দিল।

মেয়েটির মা এই দৃশ্য দেখে উন্মাদ হয়ে গেছে। সে যে কী করুণ ভাবে কেঁদে উঠল তা কি করে আমি বোঝাব? তার ভাগ্য ভাল যে বেশিক্ষণ তাকে মেয়ের শোক সহ্য করতে হল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাকেও জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করা হল।

চিতার এক একটা নালা ৫০ গজ লম্বা। ৬ গজ চওড়া আর ৯ ফুট গভীর। একটা এইরকম চিতা-নালায় একসঙ্গে অনেক মৃতদেহ পোড়ানো হয়।

এইখানে যেসব ঘাতক রয়েছে অর্থাৎ যারা ইহুদিদের ঘাড়ে গুলি করে হত্যা করছে তাদের একজন কর্তা রয়েছে। তার নাম মোলি। একে আমি আগে দেখেছি। তবে সে যে এমন সাংঘাতিক একটা কসাই তা আমি জানতুম না।

পিস্তল হাতে সে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানেই দেখছে সনডার-কমানডোর কোনো কর্মী কোনো হতভাগ্যকে বাগ মানাতে পারছে না বা হতভাগাটা বাধা দেবার চেষ্টা করছে বা হয়তো কোনো কথা বলছে মোলি আর অপেক্ষা করছে না, নিজেই হতভাগাটার যেখানে পারছে গুলি করে লোকটা মরে গেল কিনা দেখছে না, সঙ্গে সঙ্গে তাকে জ্বলন্ত চিতায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে। শয়তান না হলে এমন কাজ কেউ পারে না। মোলি একটা শয়তান হয়ে গেছে। তাকে খুনের নেশা পেয়ে বসেছে। সে নাকি এই রকম ভাবে গুলি করতে করতে সনডারকমানডোর মানুষদেরও গুলি করছে।

ডাক্তার মেনজিল নাকি নিষ্ঠুর ঘাতক। তবু সে তো ওপরওয়ালার আদেশ পেয়ে বা তাকে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তারই বলে সে বন্দী হত্যার আদেশ দেয়। নিজে হাতে কাউকে সে হত্যা করে না কিন্তু মোলি কি? মানুষগুলোকে যেন আরশোলা পেয়েছে, যেন পায়ে টিপে পটাপট করে মারছে। তার কাছে বৃদ্ধ, নারী, শিশু, যারা ভয়ে মরেই রয়েছে তারা সবাই সমান।

এখানে যখন দুটো চিতা পাশাপাশি জ্বলে তখন দিনে পাঁচ থেকে ছয় হাজার মানুষ পোড়ানো হয়। মানুষগুলো এখানে দু'বার মরে, একবার গুলি খেয়ে আর একবার আগুনে পুড়ে।

আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। হাত পা অবশ হয়ে আসছে। আমার ওপর যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল আমি সেই কাজ অর্থাৎ ওষুধগুলি একটা থলেতে ভরে এবং সেই সঙ্গে চশমার ফ্রেম; নিজেই কাঁধে তুলে নিলুম।

এই জিনিসগুলি বয়ে আনবার জন্যে আমি যে দু'জন লোক নিয়ে গিয়েছিলুম, সে কথা আমি ভুলেই গেলুম। তারা এখন কোথায় তাও জানি না, তাদের খোঁজও করলুম না।

আমি আমার ঘরে ফিরে এসে থলেটাকে এক কোনে ফেলে রাখলুম। ওষুধগুলো এখন বাছবার প্রবৃত্তি হল না। দুটো ঘুমের বড়ি খেয়ে খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লুম। তারপর নিজেই নিজের মাথা চেপে ধরলুম।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে খাটের ওপর বসে ভাবতে লাগলুম আজ না জানি আবার কি কাণ্ড ঘটবে। তবে ক্রমশঃ আমি যেন এই নারকীয় পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। আর কিছুদিন এখানে থাকলে আমি বোধহয় আর মানুষ থাকব না। অমানুষ হয়ে যাব,

হয়ে যাব গরু ছাগলের সামিল। কিংবা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মানুষ নামে ঐ জীবগুলোর মতো।

কনসেনট্রেশন ক্যামপে মানুষ নামে ঐ জীবগুলো কি ওখানে আসবার আগে কখনও চিন্তা করতে পেরেছিল যে শোবার জন্যে মাত্র এক ইঞ্চি জায়গা নিয়ে ওরা অশ্লীল ভাষায় পাশের মানুষকে গালাগালি দেবে।

ওদের মধ্যে কেউ হয়ত কলেজের অধ্যাপক, কেউ হয় তো স্বনাম-খ্যাত লেখিকা, কেউ এঞ্জিনিয়ার, কেউ সাধারণ গায়িকা, কেউ রেস্তরাঁর ওয়েটার আবার কেউ হয় তো নার্স। কিন্তু এখন ওরা সব ভুলে গেছে। নিজের অধিকার সামলাতে সামলাতে ওরা ইতর হয়ে গেছে।

এবং মানুষই মানুষকে এইরকম করেছে।

হ্যাঁ, নতুন একটা খবর শুনলুম। একজন সনডার আমাকে খবরটা দিল। এই সনডার আমাদের গেজেট। সে প্রায়ই খবর সংগ্রহ করে আনে এবং খাঁটি খবর।

প্রথম খবর সে দিল যে সমস্ত ক্যামপে কড়া কোয়ারানটাইন জারি করা হয়েছে। ব্যারাক থেকে কেউ বেরোতে পারবে না। হাতে লাইট মেসিনগান আর পুলিস ডগ নিয়ে এস এস গার্ডরা টহল দিচ্ছে।

দ্বিতীয় যে খবরটি দিল সেটি দু'দিন আগে শুনলে আমি নিশ্চয় চমকে উঠতুম, আমার গলা শুকিয়ে যেত, বুক ঢিব ঢিব করত। কিন্তু গতকাল ক্যামপের বাইরে বিরাট শ্মশানে নারকীয় কাণ্ড দেখে আমি কঠিন হয়ে গেছি তাই তার এই দ্বিতীয় খবরে আমি মোটেই বিচলিত হলুম না।

দ্বিতীয় খবরটি হল যে চেক ক্যাম্প আজ লিকুইডেট করা হবে। তার সরল অর্থ এই হল যে দু'বছর আগে চেকোস্লোভাকিয়ার থেরিসিয়েনস্টাড ইহুদি ঘেটো থেকে যে পনেরো হাজার ইহুদিকে ধরে আনা হয়েছিল এবং যাদের মধ্যে এখনও বারো হাজার হতভাগ্য বেঁচে আছে আজ তাদের হত্যা করা হবে।

দু বছর আগে ট্রেনে বোঝাই করে এই যে পনেরো হাজার নরনারীকে এখানে আনা হয়েছিল, ওদের আর বাছাই করা হয় নি। ওরা যে অবস্থায় এসেছিল সেই অবস্থাতেই ওদের সরাসরি ব্যারাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা ব্যারাকে আবদ্ধ হয়েই থাকত।

সমস্ত ব্যারাকে স্থানাভাব। শোওয়া দূরের কথা, বসবার বা দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যায় না। ব্যারাকগুলি অপরিষ্কার। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। মানুষগুলিকে তো পাখির আহার দেওয়া হয়, অসুখে ওষুধ দেওয়া হয় না। প্রতিটি মানুষ ও শিশু নরকংকালে পরিণত, গায়ে চুলকানি ও খোসপাঁচড়া, মাথায় উকুন, ভিটামিন অভাবে শিশুরা দাঁড়াতে পারে না, চোখে দেখতে পায় না। তার ওপর টাইফাস ও রক্ত আমাশয়ের মড়ক লেগেই আছে। প্রতিদিন পঞ্চাশ ষাটজন করে মরছে।

ক্যামপে জনসংখ্যা বাড়লেও রেশন বাড়ানো হয় নি। যা বরাদ্দ আছে তাই ভাগ করে দেওয়া হয়। আরও লোক আসবে অতএব দাও কয়েক হাজারকে খতম করে। যাদের মারা হবেই তাদের অযথা খাইয়ে কি লাভ?

পরদিন দেখলুম চেক ক্যাম্প নিস্তব্ধ। ছাই ভর্তি কয়েকটা লরি ক্রিমেটোরিয়ম থেকে বেরিয়ে ভিশ্চুলা নদীর দিকে যেতে দেখেছিলুম। অতএব সেই তারিখে অসউইজ কনসেনট্রশন ক্যামপের জনসংখ্যা বারো হাজার কমে গেল। ক্যামপের ডাইরিতে সেই তারিখে লেখা হল:

> The Czech section of the Auschwitz Concentration camp was liquidated this date due to a prevalence of typhus among the prisoners.
>
> *Signed :* Dr. Mengele, *Hunptsturmfuihver I Lazerazt*

পুরো বারোহাজার নয়, আটজন কম ছিল। সেই আটজন ছিল

ডাক্তার। জিপসি ক্যামপের সেই ডাক্তার এপস্টিনের হস্তক্ষেপের ফলে সেই আটজন ডাক্তারের প্রাণ বেঁচেছিল।

ঐ ডাক্তারদের 'এফ' ক্যামপের ব্যারাকের হাসপাতালে পাঠান হয়েছিল। পরদিন আমাকে ঐ ডাক্তারদের দেখবার জন্যে এফ ক্যামপে পাঠানো হয়েছিল।

ডাক্তারদের মধ্যে একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর নাম ডক্টর হেলার। তাঁকে আমি ভাল করেই চিনতুম কিন্তু হায় সেদিন আটজনের মধ্যে তাঁকে আমি চিনতেই পারি নি।

যখন তাঁর পরিচয় পেলুম তখন তাঁর কথা বলবার ক্ষমতা নেই। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়েছে। স্নায়ুগুলি পর্যন্ত নীরেট হয়ে গেছে, চিমটি কাটলেও কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। চেষ্টা করেও ডাক্তারদের বাঁচিয়ে রাখা যায় নি। তারা তখন চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে; অবশ্য যেটুকু চিকিৎসার সুযোগ ক্যামপের কাঁটাতারের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল সেইটুকু চিকিৎসার কথাই বলছি।

ক্যামপে লোকসংখ্যা কমানোর অনুরূপ আরও একটা অনুরূপ ঘটনা ঘটল। ব্যাপার-স্যাপার দেখে স্তম্ভিত। মস্তিষ্কে এই রকম ধাক্কার পর ধাক্কা লাগলে আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব।

চেক ক্যামপের কাছেই 'সি' ক্যাম্প। 'সি' ক্যামপে থাকে হাঙ্গেরির ইহুদি মেয়েরা। ক্যামপে আছে মোট ষাট হাজার মেয়ে। ক্যামপের ধারণ ক্ষমতার অনেক বেশি। এই ক্যাম্প থেকে দৈনিক যেমন অনেক মেয়ে অন্য ক্যামপে চালান যায় তেমনি দৈনিক আসেও অনেক মেয়ে।

'সি' ক্যামপেও ডাক্তার যায়। ডাক্তারের সংখ্যা তো নগণ্য। বিন্দুতে সিন্ধু!

ডাক্তার আসুক আর না আসুক, বন্দীরা নির্বিকার। তবুও নতুন

যারা আসে তারা হয় তো ডাক্তারের কাছে এগিয়ে যায়। পুরনো যারা আসে তারা আর ডাক্তারকে দেখায় না। কারণ তারা জানে যে ওষুধ নেই। উলটে তাদের কাছে যে সব ওষুধ ক্যামপে আসবার আগে পাওয়া গেছে সেগুলিই জার্মান নাগরিকদের চিকিৎসার জন্যে কেড়ে নেওয়া হয়।

তবুও ডাক্তাররা যথাসাধ্য করে। যতটুকু পারে ভাল কথা বলে, আশ্বাস দেয়, সংগ্রহ করতে পারলে ওষুধও দেয় কিন্তু পূর্ণ মাত্রার ওষুধ দিতে পারে না।

'সি' ক্যামপের একটা ব্যারাকে একজন ডাক্তার দেখল একটি মেয়েকে ঘিরে কয়েকজন মেয়ে জটলা করছে। ডাক্তারকে দেখতে পেয়ে একজন বলল: ঐ তো ডাক্তার এসেছে।

কি ব্যাপার? ডাক্তার এগিয়ে গেল। মেয়েটি রীতিমতো অসুস্থ। ডাক্তার মেয়েটিকে পরীক্ষা করল। আরে সর্বনাশ! এ তো স্কারলেট ফিভার মনে হচ্ছে। এ রোগ তো এখনি ছড়িয়ে পড়বে। ওরই মধ্যে ডাক্তার কোনোরকমে মেয়েটিকে আলাদা করে মেনজিলকে খবর দিল।

ডাক্তার মেনজিল খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে ক্যামপে ও আশপাশ এলাকায় কোয়ারানটাইন জারি করল। ব্যারাক থেকে কেউ বেরোবে না। কড়া আদেশ। রাইফেল হাতে পুলিস ডগ নিয়ে এস এস গার্ডরা টহল দিতে লাগল।

কিন্তু কোয়ারানটাইন আর কতক্ষণই বা রইল? বারো ঘণ্টাও নয়। কারণ মড়ক যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার দ্রুত ও শর্টকাট ব্যবস্থা ডাক্তার মেনজিলের জানা আছে। এখানে তো সে শুধু ডাক্তার নয়, ক্যামপের কমাণ্ডার। তার মুখের আদেশেই কাজ হয়, হাজার হাজার হতভাগ্যের যে কোনো সময়ে প্রাণ যায়।

'সি' ক্যামপে ছিল তিনটে ব্যারাক। বিকেল বেলায় ব্যারাকের সামনে ট্রাকের পর ট্রাক এসে হতভাগীদের বোঝাই করে ক্রিমেটোরিয়মে নিয়ে যেতে লাগল।

তাদের বলা হল ক্যামপে মড়ক লেগেছে। তাদের অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেখানে তাদের স্নান করিয়ে শরীর জীবাণুমুক্ত করা হবে, তারপর ভালো জায়গায় পাঠানো হবে।

চেক ক্যাম্পের মতো 'সি' ক্যাম্পও সাফ হয়ে গেল। যে সব ট্রাক জ্যান্ত মেয়েগুলিকে ক্রিমেটোরিয়মে নিয়ে গিয়েছিল সেই সব ট্রাকই আবার তাদের ছাইগুলি তুলে নিয়ে গিয়ে ভিশচুলা নদীতে বিসর্জন দিল।

সকলকেই গ্যাস চেম্বারে হত্যা করে ক্রিমেটোরিয়মে পোড়ানো সম্ভব হয়েছিল কিনা জানি না। কিছু হয় তো বিরকেনাউয়ের বনের মধ্যে সেই শ্মশানে নিয়ে যেয়ে ঘাড়ে গুলি করে হত্যা করে চিতায় পোড়ানো হয়েছিল। না, তাদের ছাই বিসর্জন দেওয়া হয় নি।

এইসব দেখে শুনে সব ডাক্তার পাগল হয়ে যায় নি। তাদের মধ্যে তখনও কিছু মানুষ ছিল। মড়ক বন্ধ করার এই শর্টকাট পদ্ধতি দেখে ডাক্তাররা সাবধান হয়ে গেল।

ব্যারাকে ছোঁয়াচে রোগ দেখলে তারা আর ডাক্তার মেনজিলকে খবর দিত না। তারা যতদূর পারত সাবধানতা অবলম্বন করে ঐ ব্যারাকের মধ্যেই রোগীকে লুকিয়ে রাখত। ডাক্তাররা জানত এরা তো মরবেই তবুও যতদিন বাঁচিয়ে রাখা যায়।

ডাক্তার মেনজিলও সত্যি আর মানুষ ছিল না। সে যা স্থির করত বা মত প্রকাশ করত তার প্রতিবাদ করা চলত না। তাছাড়া ডাক্তার নাকি রোগ নির্ণয় করত নির্ভুল।

একবার একটা ব্যারাকে দুটি বালিকার মৃত্যু হল। সেই ব্যারাকের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার ছিল দু'জন মহিলা। তারা বলল মেয়ে দু'টির টাইফয়েডে মৃত্যু হয়েছে অথচ তখন ব্যারাকে রোজ রক্ত আমাশয়ে দশ বারোজন মরছে।

মেনজিল বলল হতেই পারে না, তোমরা কিছুই জানে না। আমি জানি ওদের টাইফয়েড হয় নি, ওরা ডিসেনট্রিতে মরেছে। তোমাদের

শাস্তি পেতে হবে। মহিলা দু'টি ডাক্তার বলেই প্রাণে বেঁচে গেল নইলে মৃত্যু তাদের অবধারিত ছিল।

মৃত বালিকা দু'টির লাস আমার কাছে পাঠান হয়েছিল পোস্ট-মর্টেমের জন্য। পোস্টমর্টেম করে দেখলুম টাইফয়েডেই মেয়ে দু'টির মৃত্যু হয়েছে।

মহিলা ডাক্তারদের ডায়াগনোসিস যে নির্ভুল এ কথা তাদের মেনজিল জানায় নি এবং শাস্তিটাও লাঘব করে নি। এ ক্ষেত্রে আমি নিজেকে দোষী মনে করলুম। আগে জানলে আমি হয়তো মেনজিলকে মিথ্যা রিপোর্ট দিতুম। বলেই দিতুম যে ডিসেনট্রিতেই মৃত্যু হয়েছে। মহিলা দুজন তো আমার মতোই ডাক্তার।

একদিন সকালে সবে ব্রেকফাস্ট শেষ করেছি এমন সময় একজন মোটর সাইকেলে আরোহী দূত এসে হাজির। মোটর সাইকেলে প্রেরিত দূত মানেই জরুরী। নিশ্চয় কোথাও না কোথাও আমার ডাক পড়বে, আমি তাড়াতাড়ি জুতোর ফিতে বেঁধে নিলুম। একটা সিগারেট ধরাব ভাবছিলুম সেটা আর হল না।

যা ভাবছিলুম ঠিক তাই। মেনজিল আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। সে আমার জন্যে 'এফ' ক্যাম্পে অপেক্ষা করছে। আমি যেন এখনি যাই, দেরি না করি। যো হুকুম।

সাইকেল-মেসেঞ্জার চলে গেল। তার অন্য কাজ আছে।

ক্রিমেটোরিয়ম থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, তার ওপর এখনি দুটো মড়া কাটবার কথা ছিল। ভাল লাগছিল না। ডাক পেয়ে ভালই লাগল। কিছুক্ষণ এই বিশ্রী পরিবেশ আর কাজ থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেল। এ যেন আমার কাছে সিনেমা দেখার সামিল।

হাঁটতে হাঁটতে যাওয়া যাবে। যাবার পথে পুরনো দু একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতেও পারে তো। বাইরের একটু বাতাসও পাওয়া যাবে। ঘর থেকে বেরোবার পথে আমি পকেটে কিছু ওষুধ

আর কয়েক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে নিলুম। কয়েকদিন থেকে অজস্র সিগারেট পাওয়া যাচ্ছে। জানি না আবার কবে বন্ধ হয়ে যাবে।

ক্রিমেটোরিয়মের লোহার গেট পার হবার সময় গেটে যে ডিউটিতে ছিল সে আমার নম্বর ও সময় লিখে নিল।

খানিকটা যেতেই মেয়েদের 'এফ. কে. এল.' ক্যাম্প। ক্যাম্পের বিরাট খোলা মাঠে তখন হাজার খানেক বা তারও বেশি মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই রোদ ও খোলা হাওয়া তাদের নিশ্চয় ভাল লাগছে।

কিন্তু কি কুৎসিত দেখাচ্ছে তাদের। যুবতী, বালিকা বা বৃদ্ধা, এদের মধ্যে পার্থক্য করাই যাচ্ছে না। সবার মাথা নেড়া, শতছিন্ন ও মলিন একটা কিছু দেহে আটকে আছে। কারও কারও আবার তাও নেই। রোদটুকু পুরোপুরি উপভোগ করবার জন্যে জীর্ণ বস্ত্রখানি কোথাও ফেলে রেখেছে। লজ্জা তারা অনেক আগেই বিসর্জন দিয়েছে।

ক্যাম্পে ঢোকার পর তিন মাসের মধ্যেই হতভাগীদের এই অবস্থা হয়েছে।

আমার স্ত্রী ও মেয়ে এদের মধ্যে আছে নাকি? থাকলে তাদেরও চেহারা নিশ্চয়ই এই রকমই হয়েছে। আমার দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করার সময় নেই। দাঁড়িয়ে করবই বা কি? তাদের তো আমি চিনতে পারব না। ওরা আমাকে দেখলে হয়তো চিনতে পারবে কারণ আমার সামান্য কয়েক পাউণ্ড ওজন কমে যাওয়া ছাড়া চেহারার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি।

তারের জালের বেড়া, কনক্রি.টর থাম আর সাইনবোর্ডের জঙ্গল পিছনে ফেলে আমি 'এফ' ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে গেলুম। 'এফ' ক্যাম্পের গেটে হাজির হলুম। গেটে তখন যে লোকটা ডিউটি দিচ্ছিল তার চেহারার তুলনায় একজন কসাই বোধহয় রুডলফ ভ্যালেনটিনো।

নিয়ম অনুসারে নম্বর দেখাবার জন্যে হাতের আস্তিন গুটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নম্বরটা পড়তে লাগলুম। আস্তিন গোটাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার রিস্টওয়াচটাও বেরিয়ে পড়ল। ইহুদি বন্দীদের পক্ষে রিস্টওয়াচ পরা এই ক্যাম্পে নিষিদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে সেটি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

এই রিস্টওয়াচটি আমাকে ডাক্তার মেনজিল দিয়েছিল আমার কাজের জন্যেই। ঘড়ি ছাড়া ডাক্তারের কাজ চলে না। মেনজিল নিজেও তা জানে।

আমার হাতে ঘড়ি দেখে তো ডিউটি অফিসার রাগে অগ্নিশর্মা। নাকের ডগা আর কান টকটকে লাল, যেন অঙ্গার। কর্কশ কণ্ঠে আমাকে বলল

তুমি কে হে লাটসাহেব যে হাতে ঘড়ি বেঁধেছ? আর এই 'এফ' ক্যাম্পে তোমার কি কাজ?

আমি এখানকার ব্যাপার জেনে গেছি। হাত না সরিয়ে, আস্তিন না নামিয়ে শান্ত স্বরেই বললুম,

সে কথাটা তুমি তাহলে ডাক্তার মেনজিলকেই জিজ্ঞাসা কর আর যদি তুমি আমাকে 'এফ' ক্যাম্পে ঢুকতে না দাও তাহলে আমি আমার দফতরে ফিরে যেয়ে ডাক্তারকে বরঞ্চ টেলিফোন করি।

ডাক্তার মেনজিলের নাম করার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের মতো কাজ হল। তার রাগ উবে গেল। সুর পাল্টে বলল,

ভেতরে কতক্ষণ থাকবে? দেখি নম্বরটা? এ-৮৪৫০, হ্যাঁ, কতক্ষণ? এসব আমায় লিখে রাখতে হবে তো।

তখন বেলা দশটা বেজেছে। আমি বললুম কি কাজ তা তো আমি জানি না, ঠিক আছে, তুমি লিখে রাখ আমি বেলা দু'টো পর্যন্ত থাকব। ততক্ষণে আমার কাজ নিশ্চয় শেষ হয়ে যাবে।

কথা বলতে বলতে আমি পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করে তার হাতে দিলুম। সে এবার কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে উঠল। সিগারেট পেয়ে সেই এস এস ক্রীতদাস যেন কুকুর হয়ে গেল।

আমি ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকে গেলুম। কমাণ্ডারের অফিসের বাইরে লবিতে যে ক্লার্ক ছিল তাকে বললুম ডাক্তার মেনজিলকে খবর দিতে, সে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। আমার নাম ও নম্বর বললুম।

একটু পরেই ক্লার্ক আমাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল। সাজানো ঘর, দামী ফারনিচার, মেঝেতে কারপেট, দেওয়ালে ছবি। অনেক ছবি নয়, একখানি মাত্র ছবি। ছবিখানি হল গেস্টাপো চিফ হিমলারের, যার ভয়ে সারা জার্মানি কাঁপে।

মেনজিল ছাড়া ঘরে আরও দু'জন বসে রয়েছে। আমাকে বসতে বলা হল না। আমি দাঁড়িয়েই রইলুম।

প্রথমে আমার পরিচয় দিয়ে অপর দু'জনের সঙ্গে মেনজিল আমার পরিচয় করিয়ে দিল। একজনের নাম ডাক্তার টিলো, ক্যাটজেটের সার্জন, অপরজনের নাম ডাক্তার উলফ, মেডিক্যাল সারভিসের ডিরেকটর জেনারেল।

এই দু'জন ডাক্তার আমার সাহায্য চায়। সাহায্য আর কি, আমাকে খাটিয়ে নিতে চায়। তাদের কিছু কাজ করিয়ে নেবে। এই আর কি। ওদের চোখে আমরা ইহুদিরা কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজী।

হিটলারের তো সেইখানেই ভয়। শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য, বিজ্ঞান এমনকি মুলধনী কারবারেও ইহুদিরা যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে একদিন শুধু জার্মানি নয় সারা ইউরোপটাই ওরা গ্রাস করে ফেলবে।

ডাক্তার উলফের বক্তব্য হল যে এই ক্যাম্পে এবং অন্যত্র পেটের ব্যারামে বিশেষ করে আমাশয়ে প্রচুর লোক মরে। এই রোগের লক্ষণ ইত্যাদি সবই তো জানা আছে, ওষুধও দেওয়া হয় তবুও রোগী মরে। তাহলে পেটের ভেতরে কি ঘটে তা জানা যাচ্ছে না। আমাশায় রোগের প্রভাবে পেটের ভেতরে পাকস্থলী বা অন্য অংশের কি পরিবর্তন হয়, কি রকম ক্ষত সৃষ্টি হয়, এসব জানা দরকার।

আমাশায় ভুগে রোগী মরে গেলে কে আর পোস্টমর্টেম করাচ্ছে। কিন্তু এখানে সে সুযোগ আছে।

ডাক্তার উলফ বলল তার ইচ্ছে অন্ততঃ দেড়শ' রোগীর পেট চিরে তার অন্ত্র, লিভার ইত্যাদি সব পরীক্ষা করে দেখা হক আমাশয় হলে আসলে পেটের ভেতর কি হয়। এই দেড়শ রোগীর পেট চিরে প্রত্যেকের রিপোর্ট ডাক্তার উলফকে দাখিল করতে হবে। এজন্যে ডাক্তার উলফ আমার সহযোগিতা চায়।

বুঝলুম সহযোগিতা নয়, আদেশ।

মেনজিল বলল : তোমাকে রোজ তাহলে সাতটা করে অটোপসি করতে হবে, তাহলে তিন সপ্তাহে কাজটা শেষ হয়ে যাবে।

রোজ সাতটা। এছাড়া আমার অন্য কাজও আছে। রোজ সাতটা ডেডবডি অটোপসি করা সম্ভব নয়। অতএব আমি বললুম :

আমাকে ক্ষমা করবেন, রোজ সাতটা লাস চেরাই করতে হলে আমার মনে হয় কাজটা ভাল করে করা যাবে না, নিখুঁত হবে না, কিন্তু রোজ তিনটে লাস চেরাই করলে কাজটা ভাল হবে, তবে আপনাদের কিছু দেরি হয়ে যেতে পারে, আপনারা কি বলেন?

আমার কথা শুনে ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আমার প্রস্তাবেই রাজি হল। আমাকে আর দাঁড় করিয়ে রাখল না, মেনজিল আমাকে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিল তুমি যেতে পার। আমিও আর অপেক্ষা করলুম না।

সেদিন আমার হাতে কোনো কাজ না থাকায় আমি আমার কয়েক জন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তারাও ডাক্তার। ডাক্তার বলেই এখনও বেঁচে আছে এবং আমার অনেক আগে ওরা ক্যামপে এসেছে। তবে এটা ঠিক যে আমরা এই নরক ক্যামপের যে সব নারকীয় কাণ্ড কারখানা দেখলুম ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলুম তা আমরা যাতে কোনোদিন বাইরে যেয়ে প্রকাশ করতে না পারি তার

ব্যবস্থা নাৎসীরা উত্তমরূপেই করবে। প্রাণ নিয়ে আমরা এই ক্যামপের বাইরে বেরোতে পারব না।

বন্ধুরা আমাকে দেখে আনন্দিত হল। তারা আমার আগে এসেছে এবং এখানকার অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে সঞ্চয় করেছে কিন্তু আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে চেক ক্যামপের 'এফ' ক্যামপের বন্দীদের যে ভাবে একদিনে শেষ করা হল এবং বিরকেনাউয়ের মশানে যে বীভৎস দৃশ্য দেখলুম তা আমাকে সহসা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে। আমি মাথা থেকে সে ভার নামাতে পারছি না। রোজ রাত্রে স্লিপিং পিল না খেলে আমার ঘুম আসে না। ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্ন দেখি সেইসব ভয়াবহ দৃশ্যের।

বন্ধুদের জন্যে আমি ওষুধ ও সিগারেট এনেছিলুম। এগুলি পেয়ে তারা খুবই খুশি হল। এসব ওরা পায় না। আহারের সঙ্গে ওরা একটু বেশি পরিমাণে চিজ ও মারগারিন পায়, মাঝে মাঝে বুঝি এগ পাউডার দেওয়া হয় আর দৈনিক বুঝি একটা করে মাল্‌টিভিটামিন ট্যাবলেট বরাদ্দ আছে। তাই তাদের ওজন এখনও কমে ৫০ বা ৬০ পাউণ্ড হয়ে যায় নি। এসব অবিশ্যি দেওয়া হয় যাতে তাদের খাটিয়ে নেওয়া যায়।

আমি ওদের কিছু যুদ্ধের খবর শোনালুম। ফিস ফিস করে আলোচনা করলুম। জার্মানরা তখন সব ফ্রণ্টেই পিছু হটছে। পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়াতে মুক্তিফৌজ গঠিত হচ্ছে এবং তারা ক্রমশঃ সক্রিয় হচ্ছে, এমন খবরও আমাদের কানে আসছে।

মনে মনে নিজে আশাবাদী না হলেও বন্ধুদের সান্ত্বনা দিলুম, উৎসাহিত করলুম। তাদের বললুম হয় মুক্তিফৌজ নয় তো রেড আর্মি আমাদের উদ্ধার করবে। তাদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বিদায় নিলুম। ক্যামপে একটা কথা চলিত আছে, বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া মানে মৃত্যুর পথে যাত্রার গতিবেগ কিছু কমল। অর্থাৎ এই ক্যামপে আমাদের শীগগির মরতে হবেই কিন্তু

বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে মনে একটু আনন্দ সঞ্চার হয়, মৃত্যুভীতিটা একটু কমে।

আমি ডাক্তার উলফের কাজ নীরবে করে যেতে লাগলুম, দশদিনে তিরিশটা অটোপাস করেই ক্লান্ত অনুভব করলুম। একঘেয়ে লাগে। আমি একা, দিনের পর দিন একই কাজ করতে ভাল লাগে না। তবু যথাসাধ্য করি, রিপোর্ট লিখি। অন্ত্রের মধ্যে আমাশয় রোগের চরিত্র আমার সঠিক জানা ছিল না। আমি নিজেও কিছু শিখছি।

সেদিন দুপুরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। মাসফেল্ডের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিরক্ত হলুম কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করবার উপায় নেই।

মাসফেল্ড সঙ্গে তিন জন বন্দী এনেছে। হাই তুলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে জিজ্ঞাসা করি, কি ব্যাপার ওবেরসাবফুরের?

মাসফেল্ড বলল, ডক্টর মেনজিল তোমাকে তিন জন অ্যাসিস্ট্যান্ট পাঠিয়ে দিয়েছে। ওরা তোমার কথামতো কাজ করবে। আমি চললুম। মাসফেল্ড চলে গেল। আমরাও বাঁচলুম।

কিন্তু আমি আমার সহকারীদের দেখে খুব দুঃখ অনুভব করলুম। তখনও অবশ্য এদের পরিচয় পাই নি কিন্তু বেচারীদের দেখেই বোঝা গেল ওরা পেট ভরে খেতে পায় না। ছেঁড়া ও মলিন ছাড়া জামা-কাপড় পরতে পায় না। দেখে মনে হয় যেন দুঃস্থ ও ভিখিরি।

যাই হক নিজেদের মধ্যেই পরিচয়ের পালা সেরে নিলুম। একজন হল ডক্টর ডেনিস গোরোগ। চিকিৎসক ও প্যাথোলজিস্ট। বয়স ৪৫, চোখে পুরু চশমা, হাঙ্গেরিয়ান, অত্যন্ত ভদ্র। দ্বিতীয় জনের নাম অ্যাডলফ ফিশার, প্রাগ প্যাথোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, চেক। পাঁচ বছর অসউইজ ক্যামপে আছে। আর তৃতীয়জন ডঃ যোসেফ কোলনার, ফ্রান্সের নাইস শহর থেকে এসেছে। তিন বছর বন্দী আছে। বয়স মাত্র বত্রিশ।

মেনজিল এদের 'ডি' ক্যামপ থেকে উদ্ধার করে আমার কাছে

পাঠিয়েছে। এবং যোগ্য ব্যক্তিদেরই পাঠিয়েছে। আমার কাজের লাঘব হবে।

দু'জন ডাক্তার ও ল্যাব-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-এর চুল ছাঁটাই ও দাড়ি কামাতে ও স্নান করতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। স্নান শেষ করে এলে ওদের নতুন পোষাক আর জুতো দেওয়া হল। তারপর কিছু খাওয়ানো হল। তিনজনেই রুগ্ন হলেও এখন ভদ্র দেখাচ্ছে।

আশা করা যাচ্ছে যে নতুন পরিবেশে শীঘ্রই তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

এদিকে আমি নিজের মানসিক আঘাত সামলাতে না সামলাতে আরও একটা ধাক্কা খেলুম। ভোরে উঠে দেখলুম যে চারটে ক্রিমেটোরিয়মই জ্বলছে এবং সারারাত ধরেই জ্বলছে। চিমনির ওপরে লাইটনিং কণ্ডাক্টরগুলি আগুনের তাপে বেঁকে গেছে।

খবর পেলুম পরে।

ভূমধ্য সাগরে করফু দ্বীপ। ইহুদিদের অন্যতম প্রাচীনতম বাসস্থান। নাৎসীরা তাদের ধরে আনে। দীর্ঘ সাতাশ দিন আহার দূরের কথা, তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে কেউ এক বিন্দু জল পায় নি।

প্রথমে তাদের স্টিমারে বোঝাই করা হয়েছিল তারপর মালগাড়ির ওয়াগনে। যখন তাদের অসউইজ ক্যাম্পে আনা হল এবং ওয়াগনের দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে বলা হল, কেউ বেরিয়ে এল না।

বেরিয়ে আসবে কি? অর্ধেক মানুষ তো মরে গেছে আর বাকি অর্ধেক মৃতপ্রায়, নড়বার শক্তি নেই, জ্ঞান নেই। মরেই আছে।

কাল রাত্রে তাদের দেহ থেকে বস্ত্র খুলে নিয়ে জীবিতদের গ্যাস-চেম্বারে হত্যা করে ক্রিমেটোরিয়মে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। নাৎসী জার্মানিকে বেশি গ্যাস খরচ করতে হয় নি। বাকি হতভাগ্যেরা তো মরেই ছিল। গ্যাস-চেম্বারে নিয়ে যাবার কি দরকার ছিল? একবারে ক্রিমেটোরিয়মে ফেলে দিলে হতভাগ্যদের জ্বালা আগেই জুড়িয়ে যেত।

অসউইজ ক্যাম্পের বিষয়ে অন্য কিছু বলি। আপনাদের শুনতে কেমন লাগবে জানি না কিন্তু আমি যখন ঐ ক্যামপে থাকতুম তখন সেগুলি লক্ষ্য করে আমার বেশ মজা লাগত। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের এমন চরম নিদর্শন মানুষই তৈরি করতে পারে।

যেমন গ্যাস চেম্বারের প্রবেশ পথে সাতটি পৃথক ভাষায় লেখা ছিল 'বাথ' অর্থাৎ স্নানঘর। হতভাগ্যদের তো আগেই উলঙ্গ করা হয়েছে, স্নান করাবার জন্যেই বুঝি। তা স্নান তাদের করানো হতো। কি দিয়ে স্নান করানো হতো? সাইক্লন গ্যাস দিয়ে, যে গ্যাসের প্রধান উপাদান হল সায়ানাইড, ক্লোরিন এবং নাইট্রোজেন। ঐ তিনটি উপাদানের কয়েকটি অক্ষর নিয়ে 'সাইক্লন' কথাটি তৈরি করা হয়েছে।

সাইক্লন গ্যাসের টিনে লেখা থাকত, 'পয়জন ফর দি ডেস্ট্রাকশন অফ প্যারাসাইটস'; বিষ: পরজীবি ধ্বংসের জন্য। তা প্যারাসাইট. পরজীবি কীট বা আগাছা কারা? ইহুদি ছাড়া আর কে হতে পারে?

একটা সাইনবোর্ড পড়ে আমি বেশ কৌতুক অনুভব করতুম। ক্যামপের গেটে লেখা ছিল, বেশ বড় বড় অক্ষরে: কাজের মধ্য দিয়েই মুক্তি, ফ্রিডম থ্রু ওয়ার্ক।

সাইনবোর্ডের ভাষা যে কি মর্মান্তিক তারই একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

অসউইজ ক্যামপের যাত্রী খালাস করা প্ল্যাটফরমে একদিন একটা ট্রেন এসে থামল। ট্রেন থেকে নামল ৩০০ জন কংকালসার যাত্রী যারা তাদের দেহটা কোনরকমে টেনে টেনে চলেছে। তিনশ জন কেন? এদের মালপত্তরই বা কোথায়? এরা কোথা থেকে আসছে?

ক্রিমেটোরিয়ম প্রাঙ্গনে এরা যখন জল খাচ্ছিল তখন এদের একজনের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ হয়েছিল। সেই হতভাগ্য বলল

যে মাত্র তিন মাস আগে তিন হাজার ইহুদিকে একটা সালফিউরিক অ্যাসিড কারখানায় কাজ করতে পাঠান হয়। কিন্তু জায়গাটা এতই অস্বাস্থ্যকর এবং পরিবেশ এতই নোংরা যে এই তিনমাসের মধ্যে সাতাশশো জন মরে সাফ হয়ে গেল। তারা তিনশ জন মাত্র সেই নরক থেকে ফিরে আসতে পেরেছে।

এবার তাদের মুক্তি, কর্ম করেছে তো! তাই এই মুক্তিলাভ! আমি হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদভাগবত গীতা পড়ি নি। শুনেছি তাতে নাকি লেখা আছে কর্মে আনন্দ, কর্মেই মুক্তি। জানিনা আমার এই বই কোনো হিন্দু মহাশয় পড়বেন কিনা কিন্তু পড়লে নিশ্চয় ব্যাপারটা অনুভব করতে পারবেন।

তা ঐ বাকি তিনশ' জনের কি করে মুক্তিলাভ ঘটল?

সেই হতভাগ্য বলল, এখানে পাঠাবার আগে তাদের বলা হয়েছে যে আরোগ্যলাভের জন্যে তাদের একটা রেস্ট ক্যাম্পে পাঠানো হবে। বাঃ বেশ! বেশ!

আধঘণ্টা পরে আমি কি দেখলুম? ক্রিমেটোরিয়ম চুল্লির সামনে তাদের রক্তাক্ত দেহগুলি পড়ে রয়েছে। মেসিন গান চালিয়ে তাদের হত্যা করা হয়েছে। কর্ম থেকে মুক্তি না পেলেও সালফিউরিক অ্যাসিড পয়জনিং থেকে তারা চিরতরে মুক্তি পেয়ে গেল।

কিন্তু একটা সাইনবোর্ডের আবরণে কোনো মিথ্যা লেখা ছিল না। সে সাইনবোর্ড লটকানো থাকত কাঁটা তারের বেড়ায়। সাবধান, ৬০০০ ভোল্ট, ছুঁলেই মৃত্যু।

অনেক হতভাগ্য তো আত্মহত্যার অন্য উপায় না পেয়ে কাঁটা তারের বেড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ত।

একদিন দেখেছিলুম মাসফেল্ডের বিরাট উলফহাউণ্ড কুকুরট লাফাতে লাফাতে কিভাবে কাঁটাতারের গায়ে গিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।

হতভাগ্য বন্দীদের নিয়ে মাঝে মাঝে কর্তারা বেশ রসিকতা

করত। সমস্ত বন্দীকে একখানা করে পোস্টকার্ড দেওয়া হল। ইউরোপে তাদের পরিবারের কাউকে বা বন্ধুদের চিঠি লেখবার জন্যে কিন্তু খবরদার পোস্টকার্ডের মাথায় তোমার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের নাম লিখবে না। লিখবে "অ্যাম ওয়ালডসি"। অ্যাম ওয়ালডসি হল সুইটজারল্যাণ্ডের সীমান্তের কাছে একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। চিঠিতে কি লিখতে হবে তাও নিশ্চয় বলে দেওয়া হল।

মতলব নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। আত্মীয় বন্ধুদের জানানো যে এইসব হতভাগ্য যাদের পরিবার থেকে উপড়ে আনা হয়েছে কে বললে তাদের কনসেনট্রেশন ক্যামপে রাখা হয়েছে? তারা নিজেরাই জানাচ্ছে যে স্বাস্থ্যকর স্থানে তারা তখনও ভাল আছে এবং বেঁচে আছে।

প্রতিটি চিঠির উত্তর এসেছিল। পাঁচ হাজার চিঠি এসেছিল। একটা ঠিকানা পেয়ে অনেকেই চিঠি লিখেছিল। উত্তর এসেছিল সেই অ্যাম ওয়ালডসি-এর ঠিকানায়।

উত্তর যখন এসে পৌঁছেছিল তখন কিন্তু সবাই মরে ভুত হয়ে গেছে এবং সেই হাজার হাজার চিঠি অসউইজ ক্যাম্পে এনে পুড়িয়ে ফেলা হল।

এসব ভাবতে মোটেই ভাল লাগে না কিন্তু চোখের সামনে যা ঘটছে সে বিষয়ে না ভেবেও তো থাকা যায় না। ইচ্ছে করলেও তো চিন্তা ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলা যায় না।

একই দিনে পরপর দুটো ঘটনা ঘটল যা আমি আজও ভুলতে পারি নি। অবিশ্যি সেই নারকীয় ক্যাম্পের কোনো ঘটনাই ভোলবার নয় তবুও ওরই মধ্যে কিছু মর্মান্তিক ঘটনা এমনভাবে মনে রেখাপাত করেছে যে আজও আমি সেগুলি ভুলতে পারি নি।

সেদিন রাউণ্ডে বেরিয়েছি। চার নম্বর ক্রিমেটোরিয়মে গিয়ে শুনলুম যে সনডারকমানডোর একজন শফার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। তার অবস্থা সংকটজনক। তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে।

শুনলুম সে প্রচুর পরিমাণে স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়েছে। যেসব হতভাগ্যদের গ্যাস চেম্বারে আনা হয় তাদের অনেকের পকেটে এই বড়ি পাওয়া যায়। অনেকে এই বড়ি সংগ্রহ করে লুকিয়ে রাখে কারণ এই বড়ি হল আত্মহত্যার একটি সহজ উপায়।

আমি দেখলুম শফার আমাদের সকলেরই পরিচিত। তাকে সবাই 'ক্যাপটেন' বলে ডাকে, আসল নাম কেউ জানে না। এখানে সে ট্রাক চালালেও আসলে সে আর্মিতে ক্যাপটেন ছিল। গ্রীসের এথেনসে তার বাড়ি এবং রাজ পরিবারেব শিশুদের সে গৃহশিক্ষক ছিল। অত্যন্ত ভদ্র ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে সকলে তাকে খাতির করত। ক্যাম্পে সে তিন বছর আছে। তার স্ত্রী ও সন্তানরা তারই সঙ্গে এই ক্যাম্পে এসেছিল কিন্তু তারা আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের গ্যাস চেম্বারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আমি ক্যাপটেনকে পরীক্ষা করে দেখলুম যে যদিও সে তখন গভীর ঘুমে অচেতন কিন্তু মৃত্যুর আশংকা নেই। একটা ইঞ্জেকশন দিলেই সে ঠিক হয়ে যাবে। ইঞ্জেকশন না দিলেও সে বেঁচে উঠবে তবে দেরি হবে।

আমার কাছে যে ক'জন সনডার ছিল তারা ভাবল ক্যাপটেনের মৃত্যু বুঝি আসন্ন। তাই তারা আমাকে বলল, ডাক্তার ওকে মরতে দাও, ইঞ্জেকশন দিয়ো না, বেঁচে উঠলে ওকে তো মাসফেল্ডের গুলিতে মরতেই হবে, আজ না হয় কাল। তার চেয়ে ওকে শান্তিতে মরতে দাও।

কিন্তু আমার যে কিছু করবার নেই। ওতো মরবে না। আমাকেই তাহলে মারতে হয়। জেনেশুনে একটা মানুষকে মারব কি করে? তাছাড়া তাকে মারবার কোনো ওষুধও আমার কাছে নেই। ক্যাপটেন বেঁচে থাকলে হয় তো এই ক্যাম্প থেকে বেরোলেও বেরোতে পারে একদিন। আমার কিছু দরকার নেই।

আমি ওদের কিছু বললুম না। নীরবে সিরিঞ্জ রেডি করতে

লাগলুম এবং প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন দিয়ে সেখান থেকে চলে এলুম। আগামী পাঁচ ছ দিনের মধ্যে ক্যাপটেনের যদি নিউমোনিয়া না হয় তাহলে সে বেঁচে উঠবে। তারপর কি হবে আমি বলতে পারি না।

সনডারকমানডোর লোকেরা কিন্তু আমার কাজে সন্তুষ্ট হল না। কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করল। আমি নিজেও খুব দুঃখিত। লোকটার জীবনের ওপর দিয়ে পরপর যে দারুণ ঝড় বয়ে গিয়েছে তারই স্মৃতি নিয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হবে যদি নাকি সে কোনোদিন এই নরক থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু ক্যাপটেন শেষ পর্যন্ত মুক্তি পায় নি। মাসফেল্ডের গুলিতেই তাকে মরতে হয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরে এক নম্বর ক্রিমেটোরিয়মে পৌঁছে খবর পেলুম যে গ্যাস-চেম্বারে তিন হাজার নরনারীকে হত্যা করা হয়েছে। হোস পাইপ দিয়ে তাদের ধোয়া হয়েছে। এইবার তাদের চুল্লীতে প্যাক করে পোড়ানো হবে। প্রস্তুতির আওয়াজ আমি শুনতে পাচ্ছিলুম।

আমি একটা শোফায় বসে সিগারেট ধরালুম। এই শোফাগুলি আমাদের বসবার জন্যে দেওয়া হয় নি। যে সব ইহুদিদের ধরে আনা হত এগুলি তাদেরই সম্পত্তি। অনেক ধনী ইহুদি তো আসত। তাদের মধ্যে অনেক বৃদ্ধ ও রোগী থাকত। ট্রেনে যাতে তাদের কষ্ট না হয় সেজন্য তাদের ছেলে-মেয়েরা বাপমাকে শোফায় বসিয়ে দিত। এই রকম কিছু শোফা ক্রিমেটোরিয়ম প্রাঙ্গনে পড়েছিল। তারই একটিতে বসে আমি ধূমপান করতে আরম্ভ করলুম। ক্যাপটেনের কথাই ভাবছিলুম।

এমন সময় গ্যাস-চেম্বার কমানডোর চিফ দেখি হাঁফাতে হাঁফাতে আমার দিকে ছুটে আসছে। রীতিমতো উত্তেজিত, চোখ বড় বড়। আমাকে দেখতে পেয়েই বলল :

ডাক্তার, ডাক্তার, শীগগির এস। একটা মেয়ে এখনও বেঁচে আছে। মরে নি। শীগগির এস।

আমি সিগারেটটা ফেলে দিয়ে মেডিক্যাল ব্যাগ হাতে নিয়ে তার পিছনে পিছনে ছুটলুম।

আমি গিয়ে দেখলুম সনডারের লোকেরা মেয়েটিকে অন্য মৃতদেহ থেকে সরিয়ে এনে দেওয়ালের ধারে ভিজে মেঝেতে শুইয়ে রেখেছে। মেয়েটি অজ্ঞান তবে মাঝে মাঝে যেন চমকে উঠছে। মেয়েটি মৃত-দেহের স্তূপের নীচে পড়েছিল। তার নাকে হয় তো গ্যাস পৌঁছয় নি। চাপা পড়ে হাওয়ার অভাবেই সে মৃতপ্রায় হয়েছে।

মেয়েটির বয়স অনুমান করলুম পনেরো-ষোলো হবে কিন্তু বড়ই রোগা, পুষ্টির অভাবে তার দেহের বিকাশ হয় নি। উলঙ্গ হয়ে পড়ে আছে। মুখটি বড়ই মিষ্টি। আমার নিজের মেয়ের কথাই মনে পড়ল। যদি আমারই মেয়ে হত? আমার হৃদপিণ্ড যেন লাফিয়ে ওঠে।

আমি মেয়েটিকে দু হাত দিয়ে পাঁজাকোলা করে তুলে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে শুইয়ে দিলুম। একজন একটা ভারি ওভারকোট এনে তাকে ঢেকে দিল।

প্রায় শ্বাস নেওয়ার মতো মেয়েটি জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানছে। এ কিন্তু বেশিক্ষণ বাঁচবে বলে মনে হয় না। তবুও আমি ডাক্তার, প্রাণ বাঁচানোর জন্যে চেষ্টা করাই আমার কাজ।

আমি মেয়েটিকে পর পর তিনটি ইন্‌ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন দিলুম। ইতিমধ্যে কেউ কেউ কিচেনে ছুটে গেছে, গরম চা ও গরম সুরুয়া এনেছে। সকলেই সাহায্য করতে ব্যগ্র, যেন তার নিজের মেয়ে।

ইঞ্জেকশনের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হতে দেরি হল না। মেয়েটির কাশি আরম্ভ হল। কাশতে কাশতে কিছু শ্লেষ্মা বেরিয়ে গেল। নিঃশ্বাস ঘন হল, নাড়ী অতি ক্ষীণ ছিল, আস্তে আস্তে ফিরে আসছে।

ইঞ্জেকশন পুরো মাত্রায় শোষিত হতে নাড়ী এবং নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হল, গালের পাণ্ডুর ভাব দূর হল। এবার সে ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইল। অবাক হয়ে আমাদের দিকে চাইছে, বুঝতে

পারছে না এখানে কেন, কি হয়েছে জানে না, বুঝতেও পারছে না। জেগে আছে না স্বপ্ন দেখছে?

আস্তে আস্তে মাথা, হাত ও পা নাড়তে লাগল তারপর সহসা আমার কোটের কলার দু'হাত দিয়ে ধরে ওঠবার চেষ্টা করল। আমি তাকে শুইয়ে দিলুম এবং ইশারা করে তাকে চুপ করে শুয়ে থাকতে বললুম। তবুও সে কয়েকবার ওঠবার চেষ্টা করল। আমি তাকে চুপ করে শুয়ে থাকতে বললুম। তার সঙ্গে কথা বললুম। ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল সে ট্রানসালভানিয়া থেকে আসছে, তার বয়স ষোলো। তার বাবা মাও তার সঙ্গে এই ক্যামপে এসেছে।

একজন সনডারকমানডো তাকে গরম সুরুয়াটুকু খাইয়ে দিল। আগ্রহের সঙ্গে সবটুকু খেয়ে ফেলল। সনডারকমানডোর লোকেরা আরও কিছু খাবার এনেছিল কিন্তু আমি নিষেধ করলুম।

মেয়েটির মাথা পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে বললুম, চুপ করে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।

এবার আমি ও আর সকলে চিন্তা করতে লাগলুম। মেয়েটি বেঁচে তো উঠল কিন্তু এবার একে নিয়ে কি করা যাবে। এই হল আমাদের সমস্যা। ওকে তো এখানে বেশিক্ষণ রাখা যাবে না। ক্রিমেটোরিয়ম বাড়ি থেকে জীবিত অবস্থায় কেউ তো বেরোতে পারে না। ক্রিমেটোরিয়ম রহস্য যাতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে সে জন্যে নাৎসীদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। একে নিয়ে আমরা কি করব? একে না বাঁচালেই বোধহয় ভাল ছিল কারণ একে মরতেই হবে। একে কোথাও লুকিয়ে রাখা যাবে না। ছোট মেয়ে, কিছুই গোপন রাখতে পারে না, এখান থেকে বাইরে বেরোলেই গ্যাস-চেম্বারের কথা বলে ফেলবেই। তখন আমরাও বিপদে পড়ব।

আমার হাতেও সময় বেশি নেই। নানারকম চিন্তা করছি, নানারকম পরামর্শ, আলোচনা। কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়।

এমন সময় মাসফেল্ড ঘরে ঢুকল, সে এসেছে তদারক করতে।

আমাদের কয়েকজনকে জটলা করতে দেখে প্রশ্ন করল এখানে কি হচ্ছে। আমরা উত্তর দেবার আগেই মাসফেল্ড মেয়েটিকে দেখতে পেল।

মাসফেল্ড স্বভাবতই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাইল। আমি তখন সনডারকমানডোর সকলকে ঘর থেকে চলে যেতে বললুম।

আমি জানি সফল হব না তবুও একবার চেষ্টা করে দেখি। এই নরকে তিন মাস বাস করছি তো! এখানে বিচার, দয়া, মায়া বলে কিছু নেই। তবুও কোনো কোনো জার্মানদের সঙ্গে আমার কিছু ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। জার্মান মাত্রেই তো আর ইহুদী বিদ্বেষী নয়। জার্মানরা কিন্তু কাজের মানুষকে হাতে রাখে অবিশ্যি যতক্ষণ তাকে প্রয়োজন আছে।

এই যেমন মাসফেল্ড। সে এখানকার প্রথম সারির ঘাতক হলেও ডাক্তারদের খাতির করে, বিশেষ করে আমাকে। কারণ সে জানে যে ক্যামপের একনম্বর ব্যক্তিটি যে সবচেয়ে বড় ঘাতক, সেই ডাক্তার মেনজিল আমাকে পছন্দ করে। আমার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করে। আমাকে অনেক ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়।

তাই মাঝে মাঝে মাসফেল্ড আমার সঙ্গে গল্প করতে আসত। ক্যামপের এবং বাইরের কিছু কিছু খবরও দিত। মাসফেল্ডের অধীনে আরও তিনজন ঘাতক আছে। এদের সকলের কাজ হল ঘাড়ে গুলি করে হত্যা করা। যখন কোনো কারণে ৫০০ বা তার কম মানুষকে হত্যা করতে হয় তখনই মাসফেল্ডেদের ডাক পড়ে।

তিন হাজার মানুষকে হত্যা করতে যে পরিমাণ সাইক্লন গ্যাস প্রয়োজন, ৫০০ জনকেও হত্যা করতে সেই পরিমাণ গ্যাস প্রয়োজন। কিন্তু সাইক্লন উৎপাদন এখন সহজ নয় তাই সংখ্যা কম হলে গুলি করে মারা হয়। মাসফেল্ড আমাকে মাঝে মাঝে তার সমতুল্য মনে করত। সে বলত, আমি জ্যান্ত মানুষকে মারি তুমি আবার সেই মড়াকে কাটাছেঁড়া কর, ও তো একই ব্যাপার।

আর এই রকম কসাইয়ের কাছে আমাকে একটি নির্দোষ বালিকার জন্যে প্রাণভিক্ষা করতে হবে! আমি তাকে ধীরে ধীরে সব কিছু বুঝিয়ে বললুম। লজ্জাশীলা কিশোরী বিবস্ত্র হবার সময় যে মানসিক আঘাত পেয়েছিল এবং তারপর গ্যাসের ঘ্রাণ পেতে না পেতেই ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল ও তারপর তাকে যখন কেউ পদদলিত করতে লাগল; বেচারী তো তখনি মরে গেছে। সব শাস্তিই তো সে পেয়েছে, অথচ এ সব শাস্তি তার প্রাপ্য নয়। এই বালিকাটির জন্যে কি কিছু করা যায় না?

মাসফেল্ড আমার সব কথা শুনল কিন্তু বুঝতে পারল না সে কি করবে? আমার মুখের দিকে চাইল, সমস্যার সমাধান কি আমার মুখে লেখা আছে?

কমানডোর কিছু মহিলা কর্মী ক্রিমেটোরিয়মের বাইরে কাজ করতে আসে। তারা ক্রিমেটোরিয়ম গেটে কাজ বুঝে নিয়ে নিজের নিজের কাজে চলে যায় তারপর কাজ শেষ হলে আবার গেটে জমায়েত হয়। গেট থেকে ওরা নিজের নিজের ব্যারাকে ফিরে যায়। মেয়েটাকে ওদের দলে ভিড়িয়ে দিলে ব্যারাকে চলে যেতে পারে এবং সেখানে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে পারে তারপর ওর কপালে যা আছে তাই হবে।

আমি প্রস্তাবটা মাসফেল্ডকে বললুম। মাসফেল্ড শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, পারবে না।

কি পারবে না? আমি জিজ্ঞাসা করি।

গ্যাস চেম্বারে যা দেখেছে সে কথা সে চেপে রাখতে পারবে না। আর একটু বড় হলে গুরুত্ব বুঝত। মৃত্যুভয়ে ব্যাপারটা চেপে যেতে পারত কিন্তু এখন ওর বয়ঃসন্ধি, এই বয়সের ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হয়, মানসিক ভারসাম্য থাকে না।

আরে? কে বলে মাসফেলড একটা কসাই। বেশ কথা বলে তো! ভেবে চিন্তে কথা বলতেও পারে এবং যা বলেছে তার মধ্যে যুক্তি আছে, ওর কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মাসফেল্ডের কথা তখনও শেষ হয় নি। সে বলল : এই ঝুঁকি নেওয়া যায় না। ধরা পড়লে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুদণ্ড। অতএব মেয়েটিকে মরতেই হবে।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলি যা ইচ্ছে কর কিন্তু দোহাই মাসফেল্ড আমার সামনে কিছু কোরো না।

আমি তাড়াতাড়ি আমার ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে সেখান থেকে চলে আসি।

আধ ঘণ্টা পরে মাসফেল্ড ওকে ফারনেস রুমে নিয়ে গিয়েছিল। ঠিক নিয়ে গিয়েছিল বলা যায় না। তাকে একরকম তুলে নিয়েই গিয়েছিল এবং তার ঘাড়ে প্রায় পিস্তলের নল ঠেকিয়েই গুলি করেছিল।

প্রতিদিন রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে বিছানায় শুয়ে আমি কিছুক্ষণ বই পড়ি। এ আমার অনেক দিনের অভ্যাস। সেদিন রাত্রেও আমি শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলুম। হঠাৎ দপ করে সব আলো নিবে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ম সাইরেন বেজে উঠল।

এই রকম সাইরেন বাজলে এস এস গার্ডরা আমাদের সনডার-কমানডো শেলটারে নিয়ে যেত। সেই শেলটার বা আশ্রয়স্থল কোথায়? শেলটার হল গ্যাস চেম্বার।

এস এস গার্ডরা অন্ধকারে আমাদের গ্যাস চেম্বারে নিয়ে গেল। কমানডোর সকলেই আমরা ২০০ জন গ্যাস চেম্বারে হাজির হলুম। এই গ্যাস চেম্বারে হাজার হাজার হতভাগ্যের কি করে মৃত্যু হয়েছে সে করুণ কাহিনী আমরা সকলেই জানি অতএব অ্যালার্ম সাইরেনের কারণ কি তা না জেনে সেই অভিশপ্ত ঘরে অপেক্ষা করা যে কি ভয়াবহ ব্যাপার তা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছিলুম।

এ ছাড়া আমরা তো জানি যে বর্তমান সনডারকমানডোর মেয়াদ

শেষ হয়ে আসছে। ইচ্ছে করলেই এস এস গার্ডরা এখনই গ্যাস চেম্বারের দরজাগুলি বন্ধ করে দিয়ে চিমনির ভেতর দিয়ে চার টিন সাইক্লন গ্যাস ফেলে দিলেই হল।

মেয়াদের আগেই যে সনডারকমানডোদের হত্যা করেনি তা নয়। এমন ঘটনাও ঘটেছে।

একাদশ সনডারকমানডোর একটা অংশকে 'ডি' কোয়ার্টার থেকে সীমাবদ্ধ এলাকা ১৩ নম্বর ব্যারাকে বদলি করা হল। তাদের বলা হল, ওপর থেকে আদেশ এসেছে যে এই দলকে আর ক্রিমেটোরিয়মে রাখা হবে না। এবার থেকে ওদের ব্যারাকে রাখা হবে। তারা চুল্লীতে যেমন কাজ করছিল তেমনি কাজই করবে। ব্যারাক থেকে তাদের ক্রিমেটোরিয়মে নিয়ে যাওয়া হবে।

সেইদিনই তাদের স্নান ও পোশাক বদলের জন্যে 'ডি' কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হল। সত্যসত্যই তাদের স্নান করানো হল এবং তারপর তাদের পাশেই একটা ঘরে ঢোকানো হল। ঘরটা গ্যাস চেম্বার নয় তবে এই ঘরে মানুষের দেহ থেকে জীবাণু, উকুন বা অন্য কোনো কীটাণু মুক্ত করার ব্যবস্থা আছে। ঘরখানাকে বলা হয় ডিসইন-ফেকটিং চেম্বার এবং এজন্যে দরজা জানালা চেপে বন্ধ করার ব্যবস্থা আছে যাতে বাইরের বাতাস ঘরে না ঢুকতে পারে।

সনডারকমানডোর লোকেরাও জানে যে এই ঘরে ইহুদিদের পরিচ্ছদ থেকে উকুন ধ্বংস করা হয় এবং তাদের দেহ থেকেও। উকুন টাইফাস রোগ জীবাণু বহন করে তাই উকুনকে এত ভয়। টাইফাস বড় ছোঁয়াচে রোগ। টাইফয়েড এবং টাইফাস এক রোগ নয়।

হতভাগ্য সেই ৪০০ সনডারকমানডোকে এই ঘরে ঢুকিয়ে চিমনির ভেতর দিয়ে সাইক্লন গ্যাস ছেড়ে দিয়ে তাদের হত্যা করা হল। তারপর সেখান থেকে তাদের লাস ট্রাকবোঝাই করে নিয়ে যেয়ে বাইরে কোন শ্মশানে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।

আমাদের সন্দেহ ভিত্তিহীন নয়। এই অন্ধকারে আমাদের

গাদাবন্দী করে রাখা হয়েছে। দরজাগুলো এখনও খোলা আছে। যে কোনো মুহূর্তে বন্ধ করে দিলেই হল এবং তারপর ওপরে চিমনির ভেতর দিয়ে গ্যাস বর্ষণ। আমরা সকলে মনে মনে প্রস্তুত হয়েই রইলুম।

সে এক অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রনা। ক্রমশঃ মিনিট থেকে ঘণ্টা পার হল। এইভাবে অন্ধকারে আমাদের তিনঘণ্টা আটকে রাখা হয়েছিল। কেন যে আটকে রাখা হয়েছিল তা জানতে পারলুম না। তারপর আমাদের বাইরে আনা হল। তখন আলো জ্বলেছে। সার্চলাইটগুলিও জ্বালানো হয়েছে। ঘরে ফিরে আমি ঘুমোবার চেষ্টা করলুম কিন্তু তিনঘণ্টা ধরে ঐ রকম অব্যক্ত যন্ত্রনা ভোগ করার পর ঘুম আমার মাথায় উঠেছে।

কেন এই সাইরেন? কেন এই ব্ল্যাকআউট? বোঝা গেল না। চিন্তা করতে করতে শেষ রাত্রে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

সকাল বেলায় দু নম্বর ক্রিমেটোরিয়মে রাউণ্ড দেবার সময় গত রাত্রের ব্যাপারটা জানা গেল। দু নম্বরের সনডারকমানডোর চিফ আমাকে খবরটা দিল। বাইরে থেকে মুক্তিবাহিনীর কয়েকটা যোদ্ধা কোথায় কোন দুর্বল জায়গায় কি ভাবে কাঁটাতারের বেড়া কেটে ক্যামপের ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। তারা ধরা পড়েছে কি না জানা যায় নি তবে তারা যাবার আগে আমাদের ব্যবহারের জন্যে তিনটে মেসিন গান এবং কুড়িটা হ্যাণ্ড গ্রেনেড রেখে গেছে। সনডারকমান-ডোর লোকেদের সেগুলি আজ ভোরে চোখে পড়েছিল। সেগুলি লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। এস এস গার্ডরা কিছুই টের পায় নি।

এই খবরে একটু আনন্দিত হলুম। তাহলে আমাদের মুক্তির জন্যে কেউ চেষ্টা করছে এবং মুক্তিযোদ্ধার দল নিশ্চয় আমাদের ক্যামপের কাছে কোথাও লুকিয়ে থাকে এবং নজর রাখে।

এরপর থেকে মাঝে মাঝে রাত্রে সাইরেন বেজে ওঠে, আলো নিবে যায়। বেশ, বেশ। এই রকম আরও কয়েকবার হক। তাহলে

আমাদের হাতে আরও কিছু অস্ত্র এসে গেলে বিদ্রোহ করে আমরা ক্যামপের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারব।

কিন্তু আমরা তো আমাদের অবস্থা বাইরের জগতে কাউকে জানাতে পারছি না। মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারছি না।

বাইরের জগতকে আমাদের খবর জানাবার জন্যে একটা কাজ আমরা করেছি। সেটা কি তাই বলছি।

বন্দীদের মধ্যে কিছু ছুতোর মিস্ত্রিও আছে। সেই ছুতোর মিস্ত্রিদের দিয়ে মাসফেল্ড গোপনে বেশ বড় একটা সোফা তৈরি করাল। তারপর সেই সোফার ভেতরে ক্যামপের ক্যানটিন থেকে চুরি করে আনা মাখন, চিজ, মারগারিন, সিগারেট, ভিটামিন ট্যাবলেট ইত্যাদি ভর্তি করে ছাইগাদার ট্রাকে ভর্তি করে বাইরে পাচার করে দিল। বাইরে তার লোক আছে। তারা সেই সোফাটি তার পরিবারে পৌঁছে দেবে।

ঐ সোফা যখন তৈরি হচ্ছিল তখন আমার মাথায় বুদ্ধিটা খেলেছিল। আমি আমাদের কাহিনী লিখে এবং তার নীচে যতজনের পেরেছিলুম সই নিয়ে সেই কাগজ একটি টিনের চোঙে ভরে একসময়ে ঐ সোফার ভেতরে ভরে দিয়েছিলুম। জানি না কার হাতে এটা পড়বে তবুও বাইরের জগতে আমাদের খবরটা তো পাঠাতে পেরেছি।

ঐ রকম বিবৃতি ও টিনের চোঙা দুই প্রস্থ করেছিলুম। বন্দীদের মধ্যে যেমন ছুতোর মিস্ত্রি ছিল তেমনি টিন মিস্ত্রিও ছিল। তাদের দিয়ে টিনের চোঙা তৈরি করিয়েছিলুম।

একটা চোঙা ক্যামপের ভেতরে ক্রিমেটোরিয়মের প্রাঙ্গণে মাটিতে পুঁতে রাখলুম। ভবিষ্যতে হয় তো আমাদের করুণ কাহিনী কেউ জানতে পারবে। কসাইয়ের হাতে আমরা পোকার মতো মরেছি এ খবর তারা হয় তো জানতে পারবে।

সোফা পাঠাবার পর এবং অপর টিনের চোঙাটি মাটিতে পোঁতবার

কয়েকদিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময় হন্তদন্ত হয়ে মাসফেল্ড আমার ঘরে এসে হাজির। চোখ লাল, চুল ইতস্ততঃ, গায়ের জামা বিপর্যস্ত। কি ব্যাপার? মাসফেল্ড কিছু টের পেয়েছে নাকি? টিনের চোঙা তো তার বাড়িতেই পৌঁছেছে।

মাসফেল্ড ধপ করে আমার সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল। তার বসার ধরন দেখে বুঝলুম যে অন্য কিছু হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলুম একখানা ট্রাক জনা পঞ্চাশ মৃতপ্রায় বৃদ্ধকে নিয়ে ক্রিমেটোরিয়মে ঢুকল। এরকম মাঝে মাঝে যায় তবে ঐ বৃদ্ধদের গ্যাস-চেম্বারে পুরে গ্যাস খরচ করা হয় না। ঘাড়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। কাজটা মাসফেল্ড বা সহকারীরা করে।

মাথার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে মাসফেল্ড বলল, 'ডাক্তার আমাকে একবার দেখ তো। আমার শরীর কেমন করছে। গা বমি করছে'। গ্লাভস পরলে কি হবে ক্রমাগত ট্রিগার টিপে টিপে হাতে কড়া তো পড়েছেই, কয়েকটা ফোসকাও পড়েছে। পিস্তলটা আগুনের মতো গরম হয়ে যায়।

তাহলে আজ বোধ হয় ঐ পঞ্চাশজন বুড়োকে মাসফেল্ডকে একাই গুলি করে শেষ করতে হয়েছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পঞ্চাশজন অসহায় বৃদ্ধকে হত্যা করা। একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া তো হবেই।

মাসফেল্ডকে টেবিলে শুইয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলুম। নিজের মনে বকবক করতে করতে বলে ফেলল, আজ তার সহকারীরা কেউ ছিল না, একাই তাকে পঞ্চাশটা বুড়োকে খতম করতে হয়েছে।

বুকে স্টেথোস্কোপ বসালুম, নাড়ী দেখলুম, ব্লাড প্রেসার দেখলুম। এ লোকের যে কোনো সময়ে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। তাকে বললুম, তুমি অন্য ডিউটি নাও, জল্লাদগিরি ছেড়ে দাও। তোমার ব্লাড প্রেসার রীতিমতো হাই এবং এক্ষুনি যে কাজ করে এলে এসব তারই প্রতিক্রিয়া।

মাসফেল্ড বিরক্ত হয়ে উঠে বসল। আমাকে বলল:

দূর তুমি কচু ডাক্তার, কিছুই জান না, আমার কাছে পাঁচটা লোক মারাও যা একশোটা লোক মারাও তাই, ওতে আমার কিসসু হয় না। আজকাল মদ্যপানের মাত্রাটা কিছু বেড়ে গেছে, তাই আমার এই অবস্থা।

আর কিছু না বলে টেবিল থেকে নেমে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এবার কাদের পালা?

এবার পালা জিপসি ক্যামপের। সাড়ে চার হাজার জিপসি আছে। তাদের মেয়াদ শেষ হয়েছে।

তাদের কী ধোঁকা দেওয়া হবে? কিছু একটা দেওয়া হবে নিশ্চয়। দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না।

জিপসিদের ব্যারাকে ব্যারাকে কোয়ারানটাইন জারি হয়ে গেল। লাইট মেসিন গান আর পুলিস ডগ নিয়ে এস এস গার্ডরা পাহারা দেয়, মাঝে মাঝে পিলে চমকানো হুংকার ছাড়ে। শিশুরা ভয় পেয়ে মাকে আঁকড়ে ধরে।

এক সময়ে সমস্ত জিপসিকে ব্যারাক থেকে বার করে দিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। তাদের পাঁউরুটি আর সালামি খেতে দেওয়া হল। খাওয়া শেষ হলে তাদের বলা হল, এবার চল, অন্য ক্যামপে যেতে হবে। তারা মেনে নিল। কেউ কেউ ভয় পেয়েছিল, ব্যারাক থেকে বার করে দেওয়া হল কেন? এখন ভয় ভেঙ্গে গেল। ধোঁকা দেবার বেশ ভাল উপায়।

ক্রিমেটোরিয়মের চিন্তা কারও মাথায় এল না, তাহলে রেশন বিলি করা হল কেন? রুটি আর সালামি?

এইভাবে ধোঁকা না দিলে তো এতবড় একটা জনতাকে সামলানো সহজ নয়। বিনা ঝামেলায় কাজ উদ্ধার করা যায়। অনেক কম গার্ডের সাহায্যে ওদের গ্যাস চেম্বারে নিয়ে যাওয়া যায়। বলে স্নান

করতে হবে তো, পোশাক থেকে উকুনগুলো মারতে হবে। চুলেও অনেক উকুন। নেড়া হতে হবে। অতএব সবাই উলঙ্গ হও। রুটিন মতো ঠিক ঠিক কাজ চলে। তারপর গ্যাস, তারপর ছাইগাদা।

সেদিন সারারাত্রি ধরে এক নম্বর আর দু' নম্বর ক্রিমেটোরিয়মের চিমনি দিয়ে লক লক করে আগুনের শিখা বেরোচ্ছিল। দূর থেকে যারা আকাশ দেখতে পাচ্ছিল তারা হয় তো ভাবছিল ওখানে বুঝি একটা অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে। নিশ্চয় বনজঙ্গলে আগুন লেগেছে।

পরদিন দেখি জিপসি ক্যামপ ফাঁকা। জোরে হাওয়া দিচ্ছিল। ব্যারাকের দরজা-জানালাগুলো সেই হাওয়ায় আছড়ে পড়ছে, দেওয়ালে, চৌকাঠে ঘা দিচ্ছে। একটা বেড়াল কোথা থেকে ঢুকে পড়েছিল। জিপসিরাই হয় তো নিয়ে এসেছিল। এখন কাউকে দেখতে না পেয়ে শূন্য ঘরে মিউ মিউ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সাড়ে চার হাজার জিপসি এক দিনে শেষ? কিন্তু ওরা তো ইহুদি নয়; ওরা রোমান ক্যাথলিক খৃশ্চান তবে নাৎসী বা জার্মান নয়।

তবে আমি জানি সাড়ে চার হাজার জিপসি সেদিন ছাই হয় নি, চব্বিশ জন বাকি ছিল। এই চব্বিশ জন অর্থাৎ বারো জোড়া ও বিভিন্ন বয়সের যমজকে বেছে আমার ডিসেকটিং রুমে জমা করে দেওয়া হয়েছিল। এদের পোস্ট মর্টেম করে দেখতে হবে এই যমজদের কি বিশেষত্ব আছে। বিজ্ঞান সাধনার কি চমৎকার পরিবেশ।

যমজ নিয়ে গবেষণার কাজ করছিলেন ডঃ এপস্টিন। তিনি কিছু তথ্য চেয়েছিলেন। বারো জোড়া যমজের পোস্টমর্টেম করে যে সব তথ্যগুলি ডঃ এপস্টিন জানতে চেয়েছিলেন সেগুলি এবং আমার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য আমি ডাক্তার মেনজিল মারফত ডঃ এপস্টিনকে জানিয়ে দিয়েছি।

রিপোর্ট টাইপ করবার সময় সামান্য এক ফোঁটা তেল ফাইলের ওপর কিভাবে পড়ে গিয়েছিল, কোনো লেখার ওপর নয়, এক পাশে। সেটি মেনজিলের নজরে পড়েছিল এবং সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল। সেই পৃষ্ঠা আমাকে আবার টাইপ করে দিতে হয়েছিল। সব কিছু নিখুঁত হওয়া চাই।

আমি মনে মনে মেনজিলের প্রশংসা করেছিলুম। লোকটা নিষ্ঠুর। পরোক্ষভাবে হলেও হাজার হাজার ইহুদির মৃত্যুর জন্য সে দায়ী। তার ওপর এক নারকীয় পরিবেশে বাস করেও লোকটার রুচি এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। সব কিছু শুকিয়ে যায় নি।

একবার একটি বৃদ্ধের পেট চিরে কয়েকটা চমৎকার গলস্টোন পেয়েছিলুম। মেনজিলের এই সব গলস্টোন সংগ্রহের বাতিক ছিল। পাথরগুলি আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে লম্বা একটি গ্লাস জারে ভরে মেনজিলের জন্যে রেখে দিয়েছিলুম।

মেনজিল সেদিন দুপুরে আমার ঘরে আসতে আমি সেই পাথরগুলি তাকে দিলুম। গ্লাস জারটি হাতে তুলে নিয়ে মেনজিল সেটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। পাথরগুলি তার পছন্দ হয়েছে। প্রশংসা করতে করতে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল

যোদ্ধা ওয়ালেনস্টাইনের গাথাসঙ্গীত পড়েছ?

কাগজে তেল পড়ার ব্যাপারে যত না অবাক হয়েছিলুম এবার তার চেয়ে বেশি অবাক হলুম। সাহিত্যেরও খবর রাখে মেনজিল! ওয়ালেনস্টাইনের ব্যালাড স্কুলে ছাত্রজীবনে কবে পড়েছিল তাও তার এখনও মনে আছে? লোকটাকে এমন একটা নারকীয় পরিবেশে নিষ্ঠুর কাজ করবার জন্যে পাঠানো উচিত হয় নি। উচিত ছিল কোনো রিসার্চ ইনস্টিটিউটে পাঠান।

আমি বললুম ব্যালাড পড়ি নি তবে গল্পটা জানি।

মেনজিল তখন জার্মান ভাষায় আবৃত্তি করছে সেই ব্যালাডের কয়েকটা লাইন। অনুবাদ করলে অর্থ দাঁড়ায় ওয়ালেনস্টাইন

পরিবারে মূল্যবান স্টোন অপেক্ষা গলস্টোনের সংখ্যা অনেক বেশি।

মেনজিল ঐ দুই লাইন আবৃত্তি করে থামল না, সুর করে বেশ কয়েক পংক্তি আবৃত্তি করল।

সেদিন মেনজিলের মেজাজ খুব ভাল। আমার সঙ্গে ঠাট্টাও করছে, খুব হাসাহাসিও করছে, সে যেন আমার ইয়ার, মনিব নয়। আমি সুযোগ বুঝে মেনজিলকে বললুম আমার স্ত্রী আর মেয়ের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দেবে? বলে ফেলেই কিন্তু আমার ভয় হল। এরকম অনুরোধ করা অন্যায়। কে জানে কি শাস্তি হয়। কিন্তু ঢিল তো ছোঁড়া হয়ে গেছে।

মেনজিল যেন অবাক হল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল

তুমি বিবাহিত? তোমার মেয়ে আছে?

হ্যাঁ ক্যাপটেন, আমি বিবাহিত। আমার মেয়ের বয়স পনেরো। আবেগে আমার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়।

তুমি তাদের কোনো খবর জান কি? তারা কি এই ক্যাম্পে আছে?

আছে বলে তো জানি, তিন মাস আগে আমরা যখন অসউইজে এলুম তখন তুমিই তাদের ডান দিকের লাইনে পাঠিয়ে দিলে, তারা হয় তো কোথাও কোনো কাজ করছে।

অন্য ক্যাম্পে পাঠানো হয়ে থাকতে পারে, মেনজিল বলে।

অন্য ক্যাম্পে? আমি কোনো উত্তর দিই না। সেই সময়ে, চিমনির ধোঁয়া আমার চোখে পড়ে। অন্য ক্যাম্পে? ঐ শেষ ক্যাম্পে নয় তো? যে ক্যাম্প থেকে কোনো মানুষ কোনোদিনই ফিরে আসে না। সেই ক্যাম্পে ওদের পাঠানো হয় নি তো?

ঠিক আছে, কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মেনজিল বলে, আমি তোমাকে একটা পাস দিচ্ছি কিন্তু খবরদার···ঠোঁটে আঙুল দিয়ে মেনজিল যা বলতে চায়, তা আমি বুঝতে পারি, ক্রিমেটোরিয়মের কোনো কথা কাউকে যেন না বলি তাহলে আমিও বলি হব।

ব্যস্ত হয়ে আমি বলি, নিশ্চয় ক্যাপটেন, আমি জানি, তুমি না বললেও ক্রিমেটোরিয়মের কথা আমি বলতুম না, বললে তো আগেই আমি ব্যারাকে ব্যারাকে বলতে পারতুম আমার রাউণ্ড দেবার সময়।

মেনজিলের সঙ্গে ব্যাগ ছিল সেই ব্যাগের ভেতরেই ছাপা কার্ড ছিল। কার্ডে আমার নাম ও নম্বর বসিয়ে নীচে মেনজিল সই করে কার্ডখানা আমার হাতে দিল।

ড্যাংকে ক্যাপটেন। ধন্যবাদ।

ক্যাপটেন অর্থাৎ ডাক্তার মেনজিল কোনো উত্তর দেয় না, ব্যাগ বন্ধ করে চলে যায়।

আমি উল্লসিত। আমি এখন কার্ড দেখিয়ে সারা অসউইজ ক্যাম্পের যেখানে ইচ্ছে যেতে পারি। সেই কথাই আমাকে দেওয়া ছাড়পত্রে লেখা আছে। ক্যাম্পের ইতিহাসে এমন ঘটনা আর ঘটে নি। একজন ঘৃণিত ইহুদি বন্দীকে এমন পাস আগে আর কখনও দেওয়া হয় নি।

কিন্তু আমি আরম্ভ করব কোথায়? এ তো বিশাল ক্যাম্প, কত ব্যারাক। আমি জানি মেয়েরা আছে সি, বি-থ্রি এবং এফকে-ফোর ক্যাম্পে। খোঁজ নিয়ে জানলুম হাঙ্গেরির অধিকাংশ মেয়ে আছে সি ক্যাম্পে। তাহলে সি ক্যাম্প থেকেই আরম্ভ করা যাক।

সারা রাত্রি ঘুম হল না। আমার স্ত্রী ও কন্যাকে দেখতে পাব তো? তারা বেঁচে আছে তো। তাদের কি আমি চিনতে পারব? এখানে ব্যাপার সবই দেখছি তো। তিন মাসে অনেক কিছু ঘটে যায়। গ্যাস চেম্বারে যাবার আগে ব্যাধি অনেককেই শেষ করে।

পরদিন সকালে আমি এস এস গার্ডদের জানিয়ে সি ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলুম। এখন অগস্ট মাস, রোদ বেশ কড়া। সোজা যাবার উপায় নেই। এ রাস্তা, ও রাস্তা এবং কাঁটাতারের বেড়াজাল কাটিয়ে তিন কিলোমিটার হাঁটতে হবে।

একটা নিউট্রাল জোন আছে। মাঝখান দিয়ে রাস্তা। দু'পাশে

কাঁটাতার এবং কাঁটাতারের গায়ে ঝুলছে সতর্ক বাণী, ৬০০০ ভোল্ট। রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়েই হাঁটছি, অন্যমনস্ক হয়ে যেন কাঁটাতার ছুঁয়ে না ফেলি। মনে মনে ভাবছি, মেয়ে ও তার মাকে দেখতে পাব তো? তাদের চিনতে পারব তো? তারা বেঁচে আছে তো? নানারকম চিন্তা অতএব অন্যমনস্ক।

মাঝে মাঝে মোটর সাইকেলে চেপে মিলিটারি পুলিস যাচ্ছে, গলায় ঝুলছে 'ক্যাম্প পুলিস' লেখা ছোট একটা বোর্ড। এরা সতর্ক না করে গুলি করে না। এই একটা সুবিধে আছে। তাছাড়া আমার গলায় ঝুলছে স্টেথোস্কোপ। হাতে মেডিক্যাল ব্যাগ, পকেটে মেনজিলের দেওয়া পাস। ভয় নেই। ভয় হল যে উদ্দেশ্যে যাচ্ছি আমার সে উদ্দেশ্য সফল হবে তো?

সি ক্যাম্পে পৌঁছে দেখি সামনেই লোহার বিরাট গেট। কাঁটা-তার কণ্টকিত, দুপাশে পোর্সিলেনের অনেক ইনসুলেটর। গেটের সামনেই গার্ড হাউস। কয়েকজন এস এস সোলজার রোদে দাঁড়িয়ে আছে, কাঁধে ঝুলছে হালকা মেসিন গান।

ওরা আমাকে লক্ষ্য করতে লাগল কিন্তু কিছু বলল না। গার্ড হাউসে একটা জানালা রয়েছে এবং জানালার ওধারে একজন এস এস গার্ড বসে রয়েছে। আমি তার কাছে গিয়ে আমার নম্বর বলে ডাক্তার মেনজিলের সই করা পাস বার করে তার হাতে দিলুম।

একখানা খাতায় সে আমার নম্বর ও পাস লিখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল ভেতরে কতক্ষণ থাকবে।

দুপুর তো হবেই।

যদি বলতুম দু ঘণ্টা তাহলে রাজি হত না। বলত অতক্ষণ থাকা চলবে না। তবে আমি আমার সময় সীমা উল্লেখ করে পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করে তাকে দিলুম। তার মুখে হাসি ফুটল। ফলে আমি দুপুরের পর আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারব। কিছু বললে আর এক প্যাকেট সিগারেট দোব।

গেট খুলে দেওয়া হল। আমি গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকলুম। রাস্তার দুধারে সবুজ রঙের ব্যারাক। ব্যারাকে মেয়েদের কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

কয়েকজন মেয়ে লোহার চাকাওয়ালা একটা ঠেলা গাড়িতে মস্ত বড় একটা ডেকচি চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘড় ঘড় আওয়াজ হচ্ছে। ডেকচির মধ্যে গরম স্যুপ। এখন বেলা ১০টা। দুপুরের খাবার এখনই দিয়ে দেওয়া হয়।

কয়েকজন নারী বন্দীকে দেখলুম ঝুড়ি করে পাথর কুঁচি নিয়ে যাচ্ছে। ক্যাম্পের মধ্যে কোথাও রাস্তা মেরামত হচ্ছে বোধহয়।

কয়েকজন মেয়েকে দেখলুম রোদে বসে পরস্পরের উকুন বাচছে। মেয়েদের জন্যে কোনো পৃথক পোশাক দেওয়া হয় নি। যে যা পরে এসেছিল সেই পরেই থাকে। অনেকের পোশাক এত বেশি ছিঁড়ে গেছে যে সেটা না পরলেও চলে। অনেকের শরীরের অনেক অংশ উন্মুক্ত, মাথা সকলেরই নেড়া। গায়ে, পিঠে, পায়ে ঘা, চুলকানি, খড়ি উঠছে। সকলেই গা চুলকোচ্চে। সকলেই এত রুগ্ন যে দেখে বোঝা যায় যে এদের আয়ু আর বেশি দিন নয়। এইরকম মেয়েদেরই আগে গ্যাস-চেম্বারে পাঠানো হয়।

যে সব মেয়েদের কাজ করবার জন্যে অন্য ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে তারা বাঁচবার একটা সুযোগ পায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর একটু ভাল খাবার পায় কারণ তাদের খাটিয়ে নিতে হবে তো! কিন্তু এখানে যারা আছে তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েই আছে।

আমি প্রথম ব্যারাকের দিকেই পা বাড়ালুম। সকলের চেহারা এক। কে হাঙ্গেরিয়ান, কে অস্ট্রিয়ান, কে পোল আর কে চেক, চেনবার উপায় নেই।

কিন্তু আশ্চর্য! ওরা অনেকেই আমাকে চিনতে পারল এমন কি আমার নাম ধরে ডাকতেও লাগল। তাহলে এরা হাঙ্গেরিয়ান। আমি তো হাঙ্গেরিতে ডাক্তারি করতুম তাই অনেকে আমাকে চেনে।

আমি কাউকে চিনতে পারছি না। কেউ হেঁটে, কেউ খুঁড়িয়ে, কেউ হামা দিয়ে, আবার কেউ নিজের নগ্নতা ঢাকতে ঢাকতে আমার সামনে এসে হাজির।

কল কল করে নানা প্রশ্ন করতে লাগল বিশেষ করে তাদের স্বামী, পুত্র বা ভাইদের খবর জানতে চাইল। আমি তো কাউকেই চিনতে পারছি না। কি উত্তর দোব? আমার চেহারার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। একটু রোগা হয়েছি, এই পর্যন্ত, তাই ওরা আমাকে চিনতে পারছিল।

আমি নিজেকে অসহায় ও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। কি উত্তর দোব? ওদের প্রশ্ন ও সংখ্যা বাড়তে লাগল। তিন মাসের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে এখানে।

কয়েকজন মহিলা আমাকে ক্রেমেটোরিয়ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগল, আমরা যা শুনি তা কি সত্যি? ঐ চিমনিগুলো থেকে কিসের আগুন আর ধোঁয়া বেরোয়? ইত্যাদি প্রশ্ন।

আমি তাদের প্রশ্ন উড়িয়ে দিই। সান্ত্বনা দিই, বলি যুদ্ধ তো শেষ হয়ে আসছে, আমরা শীগগির ক্যাম্প থেকে ছাড়া পাব, আবার সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে, নিজের নিজের বাড়িতে ফিরে যাব। যা বললুম তা আমি নিজেও বিশ্বাস করি না। কিন্তু এ ছাড়া আর কিই বা বলতে পারি?

কিন্তু ওরা আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারল না। ওরা আমার মেয়ে ও তার মায়ের কোনো খবর জানে না। ওদের ছেড়ে আমি ব্যারাকের আর এক অংশে গেলুম।

এই ব্যারাকে একজন ওভারসিয়ার আছে, স্লোভাকিয়ার একটি মেয়ে। এই ব্যারাকের ভেতরে থাক থাক বাংকে ওপরে নীচে গাদাগাদি করে ৮০০ থেকে ১০০০ হাজার মেয়েকে গাদাবন্দী করে রাখা হয়েছে। ভেতরে গোলমাল, সকলেই কথা বলছে, চেঁচাচ্ছে, ডাকাডাকি করছে, ডাক ছেড়ে কাঁদছে।

ব্যারাকে ঢুকে মেয়েটি আমার স্ত্রী ও মেয়ের নাম ধরে ডাকতে লাগল কিন্তু কাজ সোজা নয়। তার স্বাভাবিক গলার জোরও কমে গেছে, তবুও সেই গোলমালের মধ্যে ঘুরে ঘুরে অনেক ডাকাডাকি করল। না, এখানে ওরা দু'জন নেই।

ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি দু'নম্বর ব্যারাকে গেলুম। এখানেও ঐ একই অবস্থা। যেন একটা হাট। তবুও অনেক চেষ্টা করা হল।

এবার তিন নম্বর ব্যারাক। এখানেও একজন ওভারসিয়ার আছে। সে দু'টি মেয়েকে ডেকে ব্যারাকের ভেতরে দু'দিকে পাঠিয়ে দিল। মেয়ে দুটি বাংকের কাছে গিয়ে আমার স্ত্রী ও মেয়ের নাম ধরে ডাকতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা আমার মেয়ে ও তার মাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল।

আমি দেখি কি ওরা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আসছে যেন না জেনে কিছু অপরাধ করেছে। পাখির ডানা দিয়ে মা যেন মেয়েকে আগলাচ্ছে আর মেয়ে মাকে আঁকড়ে ধরেছে।

একি চেহারা হয়েছে! মাথা নেড়া, বেশবাস মলিন, গায়ে ময়লা জমেছে, হাতে পায়ে চুলকানি হয়েছে, দৃষ্টি বিহ্বল। আমি অন্যত্র দেখলে চিনতে পারতুম না।

ওরা আমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিল এবং চিনতে পেরে স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। এমন যে একটা অঘটন ঘটবে এটা বোধহয় ওরা বিশ্বাস করে নি।

আমি এগিয়ে গিয়ে ওদের দুজনকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরলুম। ওরা দুজনে আমাকে ধরে নীরবে কাঁদতে লাগল। আমি ওদের সান্ত্বনা দিতে লাগলুম কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের চারদিকে লোক জমতে শুরু করেছে। একান্তে কথা বলা যাবে না।

আমি তখন ওভারসিয়ারকে অনুরোধ করলুম সে তার ছোট ঘরখানিতে আমাদের যদি কিছুক্ষণ বসতে দেয়। মেয়েটি রাজি হল। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা তিন জনে তার ঘরে বসলুম।

গত তিন মাসের নানা দুঃখের করুণ ইতিহাস আমি শুনলুম। তবে এখনও পর্যন্ত তাদের কোনো কাজ করতে দেওয়া হয় নি। বাইরে কাজ করতে পেলে তবু গায়ে একটু রোদ হাওয়া লাগত। এখানে ছাদ ফুটো, বৃষ্টি হলেই জল পড়ে, জামাকাপড় ভিজে যায়, শুকোয় না। সর্দি কাশিতে সর্বদা ভুগতে হয়।

খাবার? সে তো অখাদ্য। নিরন্তর ক্ষুধা। ঘুম? অসম্ভব। সাতজনের জায়গায় বারোজনকে ঠেসে দেওয়া হয়েছে। এক ইঞ্চি জায়গার জন্যে ঝগড়া হাতাহাতি লেগেই আছে। সকলেই অমানুষ হয়ে গেছে। ভেড়ার পাল এর চেয়েও ভাল কারণ ভেড়া সেই জীবনেই অভ্যস্ত।

এদেরও ঐ চিমনির আগুন ও ধোঁয়ার ভয়। ওখানে কি জ্যান্ত মানুষ পোড়ানো হয়? গন্ধ কিসের? জেনে শুনেও কিছু বলতে পারি না। আমি শুধু ওদের অন্য কথা বলে বোঝাতে চেষ্টা করি।

আমি কি করি তাও বলি। আমি এখানকার ডাক্তার। মেনজিল আমাকে এখনও সুনজরে দেখে। পরদিন আবার আসব বলে বিদায় নিই।

আমার স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে শুনে ক্রিমেটোরিয়মের সকলে অবাক। এমন অসম্ভব ব্যাপার এখানে আর কখনও ঘটে নি। তবে সকলে খুব খুশি হল।

পরদিন যাবার সময় আমি ক্রিমেটোরিয়ম স্টোর থেকে মা ও মেয়ের জন্য গরম জামা, মোজা, টুথব্রাশ, নেলকাটার, চিরুনি, একখানা ছুরি, মুখে মাখবার ক্রিম, ভিটামিন ট্যাবলেট, মলম এসব তো নিলুম, এছাড়া বেশ কিছু পরিমাণে চিনি, মাখন, জ্যাম আর পাঁউরুটি নিলুম যাতে ওরা নিজেরা খেয়ে কাছাকাছি কাউকে কিছু ভাগ দিতে পারে।

তিন সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন আমি ওদের কাছে যেতুম। কিছুক্ষণ সময় বেশ আনন্দেই কাটত। কিছু ভাল খাবার ও ভিটামিন খাবার

ফলে ওদের হাতপায়ের চুলকানি সেরে গেল, গায়ে একটু জোরও পেল।

সময় যত পার হচ্ছে ওদের জন্যে আমার দুশ্চিন্তাও তত বাড়ছে। কে জানে কোন দিন হয় তো গ্যাস-চেম্বারে পাঠিয়ে দেবে। চেক ক্যামপ আর জিপসি ক্যামপের পরে হাঙ্গেরিয়ান ক্যামপের পালা অবধারিত। এখন মনে হচ্ছে ওদের সঙ্গে দেখা না করলেই ভাল হত।

আমার আশংকা অমূলক নয়। একদিন সমন এসে গেল। শিয়রে শমন।

একদিন বিকেলে ল্যাবরেটরিতে আমি আমার টেবিলে বসে কাজ করছি। ডাক্তার মেনজিল এবং ডাক্তার টিলো অন্য চেয়ারে বসে ক্যামপের প্রশাসন নিয়ে আলোচনা করছে। আমি যে ঘরে আছি তা যেন ওরা জানে না। তা নয়, আমাকে ওরা গ্রাহ্য করে না। জানে তো গোপন কথা ফাঁস হলে আমার ঘাড়ে একটা গুলিই যথেষ্ট।

আমি স্বকর্ণে ও স্পষ্ট শুনলুম ডাক্তার মেনজিল বলছে সি ক্যাম্পের মানুষগুলোকে আমি আর খাওয়াতে পারছি না। আসছে সপ্তাহ দু'ইয়ের মধ্যে ওদের সাফ করে দেওয়া যাক। কি বল?

সর্বনাশ! আমার শরীরের সমস্ত রক্ত বুঝি জল হয়ে গেল। মাইক্রোস্কোপে একটা স্লাইড দেখছিলুম, সেটা ঝাপসা হয়ে গেল। আর বড়জোর দু সপ্তাহ ওদের পরমায়ু।

একটা কিছু এখনি করতে হয়। একটা ব্যাপার আমি আগে থাকতে চিন্তা করছিলুম। আমার মেয়ে আর তার মাকে যদি অন্য কোথাও বদলি করা যায় যেখানে ওরা কাজ করতে পারবে তাহলে আপাততঃ ওদের বাঁচানো যাবে।

মেনজিল আর টিলো বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেরিয়ে পড়লুম। হাজির হলুম ডি ক্যাম্পে। এই ক্যাম্পে একজন এস এস অফিসার ছিল। তার কাজ ছিল বাধ্যতামূলক শ্রমের জন্যে বন্দীদের জার্মানির বিভিন্ন জায়গায় পাঠান। কতজন এবং কোন দলকে

কোথায় পাঠান হবে, সেটা ঐ অফিসার মোটামুটি ঠিক করে দিত। সেই অনুসারে বদলি করা হত।

আমার ভাগ্য ভাল। এস এস অফিসার ঘরেই বসেছিল। আমি তার জন্যে দু প্যাকেট সিগারেট নিয়ে গিয়েছিলুম। আমি নিজের পরিচয় দিয়ে পাস দেখালুম। সিগারেট পেয়ে অফিসার খুব খুশি। তখনি একটা ধরিয়ে ফেলল।

আমি তাকে আমার স্ত্রী ও মেয়ের কথা বললুম। কি করে তাদের সঙ্গে আমি দেখা করেছি তাও বললুম এবং তাদের যে শ্রমিক দলে রাখা হয়েছে সে কথাও। সি ক্যাম্পের মাথায় খাঁড়া ঝুলছে। তা ইতিমধ্যে অফিসার কি আমার স্ত্রী ও মেয়েকে কোনো কাজের জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পারে?

অফিসার কয়েকটা চার্ট দেখল। কাকে যেন ফোন করল তারপর বলল, ঠিক আছে ডাক্তার, তুমি ভেবো না, আমি ওদের ভার নিলুম। কি করব এখনই বলতে পারছি না তবে কিছু নিশ্চয় করব। তুমি কাল খোঁজ নিয়ো।

আমার বুকের ওপর থেকে পাঁচ মন পাথরটা কে যেন নামিয়ে নিল। অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলুম।

পরদিন এসে ভাল খবরই শুনলুম। আমি একশ সিগারেটের একটা বাক্স নিয়ে গিয়েছিলুম। সেটা তার টেবিলে রাখলুম।

এক সপ্তাহের মধ্যেই সি ক্যাম্প থেকে তিন হাজার বন্দীকে পশ্চিম জার্মানিতে অস্ত্র তৈরির কারখানায় পাঠান হবে। ওখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা বেশ ভাল যাতে ওদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ কাজ আদায় করা যায়। ব্যারাকে যেয়ে বন্দীদের ডাকা হবে তখন যেন আমার মেয়ে ও তার মা যেতে রাজি হয়। বাকি যা করবার অফিসার করবে।

আমি তো তখনি সি ক্যাম্পে যেয়ে হাজির হলুম। ওদের বললুম যে শীগগির এখান থেকে ওয়েস্ট জার্মানির ওয়ার প্ল্যান্টে

লোক পাঠান হবে। সেখানে খাওয়ার ব্যবস্থা অনেক ভাল, ওরা যেন যেতে রাজি হয় কারণ আমি ওদের আর বেশিদিন রুটি মাখন বা ভিটামিন খাওয়াতে পারব না। আসল কারণ তো ওদের বলতে পারি না। ওদের এ কথাও বলে দিলুম যে ওরা যেন অন্য বন্দীদেরও ওয়েস্ট জার্মানি যেতে বলে।

প্রথমে রাজি হয় নি। শেষে রাজি হল। চিমনি আগুন আর মড়া পোড়ার গন্ধ ওরাও সহ্য করতে পারছিল না। সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। আমি এখানে ভাল আছি। সে অবশ্য ওরা দেখছে। শেষ পর্যন্ত আমাকে ছেড়ে যেতে রাজি হল।

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে সি ক্যাম্প থেকে তিন হাজার নারীকে পশ্চিম জার্মানি পাঠান হল। অনেকেই আমার স্ত্রীর পরামর্শ শুনে যেতে রাজি হয়েছিল। অনেকে রাজি হয় নি। তারা বলেছিল এখানে বেশ আছি, কাজ করতে হচ্ছে না। ওখানে গেলে কাজও করতে হবে, পেট ভরে খেতেও দেবে না।

ওরা যাবার আগে আমি দেখা করে এসেছিলুম। পথে খাবার জন্যে ও সঙ্গে রাখবার জন্যে কিছু খাবার, ভিটামিন বড়ি দিয়ে বিদায় নিয়ে এসেছিলুম।

ওরা চলে যেতে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম। যা খবর পাচ্ছিলাম তাতে বেশ বুঝতে পারছিলুম যে যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে। ওরা বেঁচে গেলেও বেঁচে যেতে পারে।

আমাদের বারো নম্বর সনডারকমানডোর মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। আর বোধহয় দু'তিন সপ্তাহ আমাদের আয়ু, তারপর শেষ। তার আগেও কিছু হয়ে যেতে পারে। মেয়ে আর তার মায়ের জন্যে আর ভাবি না। আপাততঃ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তো ওদের বাঁচিয়েছি এরপর ওদের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

ওরা চলে যাবার পরই সি ক্যাম্প লিকুইডেট করবার কাজে মেনজিল হাত দিল। রোগে, মড়কে মরে ও বেশ কিছু চালান হয়ে

যাবার পরও পঁয়তাল্লিশ হাজার মেয়ে তখনও সি ক্যাম্পে আছে। এদের তাড়াতাড়ি শেষ করাও সোজা কথা নয়।

প্রতি সন্ধ্যায় পঞ্চাশখানা ট্রাকে চার হাজার হতভাগিনীকে ক্রিমেটোরিয়মে নিয়ে আসা হত। এক একটা ট্রাকে থাকত আশি জন মেয়ে। এরা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে এদের মেরে ফেলবার জন্যেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কারণ ট্রাকে তোলবার আগেই এদের উলঙ্গ করা হত। সেপ্টেম্বরের শেষ, তখন বাইরে বেশ ঠাণ্ডা।

ওরা ভয়েই আধমরা হয়ে থাকত। কেউ চুপ করে বসে থাকত, কেউ নীরবে অঝোরে কাঁদত, ছেলে, মেয়ে বা স্বামীর নাম ধরে চিৎকার করে কাঁদত।

ওদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত, মার্জিত ও রুচিশীল পরিবারের মেয়ে ছিল। বেশভূষার দিকে যত্ন ছিল, অনেকের সুন্দরী বলে খ্যাতি ছিল, সমাজে কেউ কেউ বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিল।

তারপর একদিন নাৎসীরা তাদের শান্ত পরিবেশ থেকে জিনিসপত্র লুটপাট করে, টাকাপয়সা বাজেয়াপ্ত করে বাড়ি থেকে ওদের টেনে হিঁচড়ে বার করে নিয়ে গিয়ে ঘেটোতে পুরল। ঘেটোগুলিও প্রায় এই ক্যামপের মতোই নরক। সেখানে তাদের ওপর অত্যাচার চলত; খবর আদায়ের জন্যে অমানুষিক নিপীড়ন চলত, 'বল তোর ছেলে কোথায় পালিয়েছে, বল তোরা আরও টাকা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস, বল তুই অমুক লোকের সঙ্গে কেন কথা বলিস্‌নি'।

এই অমানুষিক অত্যাচারের ফলে তারা তাদের মনুষ্যত্ব ভুলেই গিয়েছিল। তারপর যেটুকু কোমল বৃত্তি বাকি ছিল সেটুকুও শুকিয়ে গেল কনসেনট্রেশন ক্যামপে এসে। উলঙ্গ করে লরীতে তোলবার সময় সামান্যতম প্রতিবাদ করবার শক্তি তারা কবেই হারিয়ে ফেলেছে।

অনাহার, অনিদ্রা ও রোগ তাদের একেবারেই শেষ করে দিয়েছিল। এদের হাঁটবার ক্ষমতা নেই তবুও যদি কেউ পালিয়ে

গিয়ে থাকে এজন্যে রোজ গুণতি মিলান হত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। যে দাঁড়াতে পারত না, পড়ে যেত, তাকে জোর করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়া হত। লাথি ও চড় তো ফাউ।

দশ দিনের মধ্যেই সি ক্যাম্পের পঁয়তাল্লিশ হাজার নারী বন্দী খতম।

বারো নম্বর সনডারকমানডোর আমরা এখন দিন গুণছি। আমাদের চার মাস উত্তীর্ণপ্রায় কিংবা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, আমার ঠিক মনে পড়ছে না। এবার যে কোনো দিন আমাদের ঘাতকেরা এসে যাবে এবং তারপরই আমরা ছাইগাদায় পরিণত হয়ে যাব। আমরা তৈরি হয়ে আছি।

৬ অকটোবর ১৯৪৪ তারিখে শেষ রাত্রে গুলির আওয়াজ শুনলুম। একটা ওয়াচ টাওয়ার থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। একজন রাশিয়ান বন্দী পালাবার চেষ্টা করছিল। সে আর একটা ক্যামপ থেকে পালাবার চেষ্টা করে ধরা পড়েছিল। তারপরই তাকে এখানে বদলি করা হয়। এরপর সে একেবারেই পালিয়ে গেল!

লোকটা যদি ইহুদি হত তাহলে তো কোনো কথাই ছিল না, তাকে সরাসরি পুড়িয়ে ফেলা হত, কিন্তু রাশিয়ান যুদ্ধবন্দী হয়েই মুশকিল হল। যুদ্ধবন্দীদের জন্যে নানারকম আইন মেনে চলতে হয়।

অতএব কয়েকজন সহযোগী নিয়ে ডাক্তার মেনজিল ইনকুয়ারি করল কিভাবে তার মৃত্যু হল। তারপর তার বডি পোস্টমর্টেম করা হবে এবং আগাগোড়া সম্পূর্ণ একটি রিপোর্ট তৈরি করে রাখতে হবে।

বেলা ন'টার সময় মেনজিল রাশিয়ানের ডেডবডি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বলে পাঠাল বেলা আড়াইটের মধ্যে তার রিপোর্ট চাই।

ইতিমধ্যে একজন সনডারকমানডো আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে আজ ৬ অকটোবর, আমাদের শেষ দিন, অদ্য রজনী শেষ রজনী।

আমার মেজাজ তখন থেকেই খারাপ নইলে তো বেলা দশটার মধ্যেই আমি পোস্টমর্টেম শেষ করে রিপোর্ট লিখে রাখতে পারতুম। মৃত্যু ভয় হক বা যাই হক দারুণ আলস্য আমাকে চেপে ধরল। কাজ করবার সব উৎসাহ একেবারে নিবে গেল।

ডিসেকটিং রুমে রাশিয়ানের লাস পড়ে রইল। আমি আমার ঘরে ঢুকে সিগারেটের পর সিগারেট টানতে লাগলুম। অনেকগুলো স্লিপিং ট্যাবলেট খাব কি না ভাবতে লাগলুম।

হঠাৎ অস্থির হয়ে পায়চারি করতে আরম্ভ করলুম। ঘুরতে ঘুরতে সেই ঘরে গেলুম, যে ঘরে চুল্লিগুলো আছে, মড়া পোড়ানো হয়। দেখলুম তখনও অনেক লাস পড়ে রয়েছে। সনডারকমানডোর কর্মীরা গয়ংগচ্ছভাবে কাজ করছে। মাঝে মাঝে থেমে ফিস ফিস করে কথা বলছে।

ওপরে গেলুম, যে ঘরে কমানডোরা থাকে। ঘরে ঢুকে বুঝলুম কিছু একটা হয়েছে। যারা রাত্রে ডিউটি করে তারা ব্রেকফাস্ট খেয়ে এই সময়ে ঘুমোয় কিন্তু দেখলুম সকলেই জেগে রয়েছে। সকলেই স্পোর্টস শার্টের ওপর সোয়েটার চড়িয়েছে, পায়ে বুট। সোয়েটার কেন? ঘর তো রোদে ভর্তি। কোনোদিন এসময়ে ওদের তো এ সাজে দেখিনি। এখানেও দেখলুম ওরা ফিসফিস করে কথা বলছে। কেউ কেউ নিজের জামাকাপড় প্যাক করছে। কি ব্যাপার?

এরা আমাকে বা আমার সামনে হয় তো কিছু বলতে চায় না। পাশের ঘরেই থাকে কমানডো চিফ। তার ঘরে ঢুকলুম।

ঘরে ঢুকে দেখি নাইটশিফটের অনেকেই টেবিল ঘিরে বসে কিছু আলোচনা করছে। কমানডো ছাড়া এনজিয়ার, মেকানিক, হেড শফার এবং গ্যাস কমানডোর চিফও রয়েছে।

আমিও ওদের সঙ্গে বসে পড়লুম। কমানডো চিফ সঙ্গে সঙ্গে একটা বোতল থেকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি একটা গেলাসে ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিল। বেশ কড়া পোলিশ ব্র্যাণ্ডি। আমি এক চুমুকেই সবটুকু খেয়ে ফেললুম। বোতলে আর ছিল না তাহলে আর একটু খাওয়া যেত। যাই হক ব্র্যাণ্ডিটুকু পান করে মনে একটু জোর পেলুম।

এইবার আমার বন্ধুরা আমাকে অবস্থাটা বুঝিয়ে বলল। তারা যতদূর জানে আগামী কালের আগে আমাদের কিছু হবে না হয়তো আরও একদিন মেয়াদ বাড়তে পারে। আমরা আছি মোট ৬৮০ জন এবং আজই রাত্রে ক্যামপ থেকে পালাবার একটা প্ল্যান তৈরি হয়েছে।

ক্যামপ থেকে বেরোতে পারলে আমরা দুই কিলোমিটার দূরে ভিশচুলা নদীর বাঁকের কাছে যাব। বছরের এই সময়ে নদীতে জল কম থাকে। হেঁটে পার হওয়া যায়। ওপারে পৌঁছে আট কিলোমিটার হাঁটতে হবে। তারপর গভীর বন, পোল্যাণ্ডের বর্ডার পর্যন্ত। বনে বেশ কয়েক সপ্তাহ লুকিয়ে থাকা যায়, দরকার হলে কয়েক মাসও থাকা যায়। পথে বা বনে হয় তো মুক্তিফৌজের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতেও পারে।

ইতিমধ্যে কিছু অস্ত্র ও বিস্ফোরক যোগাড় করা গেছে। কাঁটাতারের বেড়া ভেঙে মুক্তিফৌজ আগেই পাঁচটা মেসিন গান আর কুড়িটা হ্যাণ্ড গ্রেনেড ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। সেগুলো আছে। আর যোগাড় হয়েছে এক বাক্স জোরালো বিস্ফোরক। রেল লাইন উড়িয়ে দেবার জন্যে জার্মানরা এগুলি ব্যবহার করে। পোলিশ জু-এরা এই বিস্ফোরক উনিওর কারখানায় তৈরি করেছে। যেভাবে হক সেই হাই এক্সপ্লোসিভ এক বাক্স সংগ্রহ হয়েছে। কিছু রিভলভারও আছে।

গ্রুপের একজন বলল রিভলভার হাতে এস এস গার্ডদের

অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের এল এম জি-গুলি ছিনিয়ে নেওয়া হবে, তারপর তাদের ডরমিটরিতে হানা দিয়ে তাদের বন্দী করা হবে কিংবা আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসব ও সময় বুঝে তাদের হত্যা করব বা তাড়িয়ে দেব। তারা সঙ্গে থাকলে তাদের দিয়ে গেট খোলানো যাবে নয় তো বিস্ফোরক দিয়ে গেট উড়িয়ে দেব।

নির্ধারিত সময়ে আক্রমণের সিগন্যাল দেবে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে এক নম্বর ক্রিমেটোরিয়ম। সেই আলো ফেলে দু'নম্বর সিগন্যাল দেবে তিন নম্বরকে এবং তিন নম্বর থেকে চার নম্বরে।

তখন খালি এক নম্বর ক্রিমেটোরিয়মেই চুল্লি জ্বলছে, তাও সন্ধ্যা ৬টার সময় বন্ধ হয়ে যায়। আজ আর সনডারকমানডোদের নাইট ডিউটি নেই। ক্রিমেটোরিয়মে গার্ড থাকবে মাত্র তিনজন এবং সনডারকমানডো না থাকলে আজ তারা নির্ঘাৎ ঘুমোবে।

মিটিং-এ স্থির হল যে সিগন্যাল না পাওয়া পর্যন্ত সকলে নিজের নিজের ডিউটি ঠিকমতো করে যাবে যাতে কেউ কিছু সন্দেহ না করতে পারে। মিটিং শেষ হল। মরতে তো হবেই তবে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক।

নীচে নেমে চুল্লী ঘরে দেখলুম ওখানকার কর্মীরা আরও ধীর গতিতে কাজ করছে। ওদের আমি প্ল্যানটা শুনিয়ে দিলুম। আমার ঘরে ফিরে এলুম তবে আমার ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্টকে আপাততঃ কিছু বললুম না। অ্যাকশন আরম্ভ হলে ওকেও নামিয়ে দেওয়া যাবে এখন।

সময় বসে থাকে না। লাঞ্চ টাইম এসে গেল। আমরা আস্তে আস্তে খাওয়া শেষ করলুম। ক্রিমেটোরিয়মের মাঠে গিয়ে একটু রোদ পুইয়ে এলুম। দেখলুম এস এস গার্ডরা কোথাও নেই। এমন মাঝে মাঝে হয়, ওরা কেউ থাকে না। নিজের নিজের ঘরে বসে থাকে তবে বাইরে পাহারা থাকে। গেট তো বন্ধ থাকেই।

আমি বেশ মৌজ করে একটা সিগারেট টানতে লাগলুম আর

ভাবতে আরম্ভ করলুম আমার ভাগ্যের কথা। আর কয়েক ঘণ্টা পরে মুক্তি, হয় এদিকে নয় ওদিকে। দেখা যাক কি হয়। ক্ষতি কিছু নয়, লাভ হতে পারে।

দেড়টা বেজেছে। আমার এখানকার শেষ কাজ, রাশিয়ানের অটোপসিটা সেরে ফেলা যাক। আড়াইটের সময় রিপোর্ট দিতে হবে। আমার সহযোগীদের ডেকে কাজ আরম্ভ করে দিলুম।

আজ আমার একজন সহযোগী ডাক্তার পোস্টমর্টেম করছেন আর আমি দেখে দেখে নোট করছি।

মিনিট কুড়ি কাজ করেছি বোধহয় এমন সময় ভীষণ জোরে কোথাও বোমা ফাটল নাকি? ঘরের দেওয়াল কেঁপে উঠল। তারপরই টাট টাট টাট টাট করে মেসিন গানের আওয়াজ।

জানালায় লাগানো সবুজ রঙের জালের ভেতর দিয়ে দেখলুম তিন নম্বর ক্রিমেটোরিয়মের টালির ছাদ উড়ে গেছে, লোহার কড়ি বেরিয়ে পড়েছে। ভেতর থেকে ধোঁয়া আর আগুন বেরোচ্ছে। মেসিন গান চলছে আমাদের বাড়ির সামনেই।

কি হল কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাদের অ্যাকশন তো রাত্রে আরম্ভ হওয়ার কথা। কেউ কি বিশ্বাসঘাতকতা করল? ক্রিমেটোরিয়মে কোনো দুর্ঘটনা ঘটল? মুক্তিফৌজ ক্যাম্প আক্রমণ করল? কি হল? জানা যাচ্ছে না তো।

সারা অসউইজ ক্যাম্প জুড়ে সাইরেন বাজতে লাগল। আরও বিস্ফোরণ ঘটছে, মেসিন গানও চলছে আরও বেশি সংখ্যায়। আমি মনস্থির করে ফেললুম। যাই ঘটে থাকুক না কেন আমি আমার ঘর থেকে নড়ছি না। দেখি কি হয় তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

জানালা দিয়ে দেখলুম পিল পিল করে ট্রাক ছুটে আসছে। কটা হবে? ৭০? ৮০? ১০০? তাই হবে বোধহয়।

প্রথম ট্রাকখানা আমাদের ক্রিমেটোরিয়মের সামনে থামল। ঝপ ঝপ করে একদল মিলিটারি নেমে পজিসন নিল যেন কাউকে

আক্রমণ করবে। এইবার বুঝতে পারলুম। সনডারকমানডোর লোকেরা এক নম্বর ক্রিমেটোরিয়ম দখল করেছে। এস এস ট্রুপদের লক্ষ্য করে জানালা থেকে গুলি চালাচ্ছে আর গ্রেনেড ছুঁড়ছে। কয়েকটা মিলিটারি ধপাধপ পড়ল, হয় হত নয় তো আহত।

এস এস ট্রুপ সঙ্গে পঞ্চাশটা বাঘা বাঘা কুকুর এনেছিল। সেগুলোকে ছেড়ে দিল। কুকুরগুলো বাঘের মতো হিংস্র। মানুষ পেলে ছিঁড়ে খায় কিন্তু এখন ওরা লেজ গুটিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কতকগুলোতো রীতিমতো ভয় পেয়ে তাদের গার্ডদের পায়ের ফাঁকে আশ্রয় নিল। মনে হয় ওরা বুঝতে পারে নি কাদের আক্রমণ করতে হবে। ওরা যাদের আক্রমণ করে তাদের অঙ্গে কয়েদির মতো পোশাক থাকে এবং যাদের হাতে কোনো অস্ত্র থাকে না। বারুদের গন্ধেও ভয় পেয়ে থাকতে পারে।

এস এস মিলিটারিরা এবার ছোট ছোট কয়েকটা কামান নিয়ে এল। কামানের মুখে সনডারের লোকেরা কি করে লড়বে? এসব যে আছে এ খবর বোধহয় সনডারের লোকেরা জানত না।

কিন্তু রাত্রি হবার আগেই কে অ্যাকশন আরম্ভ করল? এবং কেন?

সনডারের লোকেরা এবার গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ক্রিমেটোরিয়মের পিছনের গেট দিয়ে পালাতে আরম্ভ করল। ইতিমধ্যে কেউ কাঁটাতারের বেড়া উড়িয়ে দিয়েছিল। সেই ফাঁক দিয়ে ওরা বেরিয়ে ভিশচুলা নদীর দিকে দৌড়তে লাগল।

দশ মিনিট ধরে লড়াই বেশ জমে উঠেছিল। ওয়াচ টাওয়ারের গার্ডরাও মেসিন গান চালাচ্ছিল। বোমা, মেসিন গান ও সাব-মেসিন গান, মানুষের গলা, নানারকম আওয়াজে সারা ক্যাম্প কাঁপছিল। তারপর হঠাৎ যেমন আরম্ভ হয়েছিল তেমনি হঠাৎ সব থেমে গেল।

ছোট কামান দুটো পজিশনে রেখে আর রাইফেলে বেয়নেট লাগিয়ে এস এস ট্রুপ আমাদের ক্রিমেটোরিয়ম বিল্ডিং-সবদিক

থেকে আক্রমণ করল। সনডারকমানডোর লড়িয়ে লোকেরা তো ততক্ষণে পালিয়ে গেছে।

মিলিটারিরা বিল্‌ডিং-এর ভেতরে ঢুকল। একদল আমাদের ডিসেকটিং রুমে ঢুকে আমাদের পিঠে ও পাঁজরে ঘুঁসি মারতে মারতে বাইরে বিল্‌ডিং-এর সামনে খোলা জমিতে নিয়ে এল।

আদেশ হল মুখ নীচু করে মাথায় হাত রেখে সবাই মাটিতে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়, নড়বে না। নড়বার চেষ্টাও করবে না। নড়লে বা মাথা তুললেই গুলি করা হবে।

আমরা সবাই সেই ভাবে শুয়ে মৃত্যু প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। অসহ্য। এক একটা মিনিট কাটছে যেন এক একটা যুগ। কে যেন বিড় বিড় করে ভগবানকে ডাকছে।

কয়েক মিনিট পরে পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝলুম আর এক দল মিলিটারি এল। এরা কিছু পলায়মান সনডারকে ধরে এনেছে। তাদেরও মাটিতে উবুড় করে শুইয়ে দিল।

ক'জনকে ধরেছে? কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। মাথা তুললেই তো বুলেট বিঁধবে। তিন চার মিনিট পরে আরও কয়েক জনকে এনে আমাদের পাশে শুইয়ে দেওয়া হল।

আমরা যখন এই অবস্থায় 'নট নড়চড়ন, নট কিচ্ছু' হয়ে শুয়ে আছি তখন আমাদের মাথায় ও পিঠে এস এস-এর লোকেরা কাঠের মুগুর দিয়ে মারতে লাগল। আমার তো মাথা ফেটে গাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। প্রথম আঘাতটা বেশি জোরে লাগল, পরের আঘাতগুলো যেন অনুভব করতেই পারছি না। মাথা ঘুরছে, কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। মৃত্যু বুঝি পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে।

আমাদের পিছনেই সাব-মেসিন গান হাতে এস এস ট্রুপ রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরাও বুলেটের জন্যে অপেক্ষা করছি। এইভাবে বোধহয় আধঘণ্টা কাটল।

একটা গাড়ি এসে থামল বুঝি। গাড়ির আওয়াজটা মেনজিলের গাড়ির মতো। তাহলে এস এস ট্রুপ মেনজিলের জন্যে অপেক্ষা করছিল। এবার তাহলে গুলি ছুটবে। আমি আমার মেয়ে, তার মা ও আমার বাবা, মা ও বোনের মুখ মনে করবার চেষ্টা করলুম। আর মিনিট দুই, তারপর শেষ।

মাথা তুলতে সাহস করছি না। যদি মাথা তুলি এবং মেনজিল আমাকে চেনবার বা কিছু বলার আগেই একটি বুলেট আমার ঘাড়ে বিঁধবে এবং ঐ একটি বুলেটই যথেষ্ট।

মেনজিল কাকে যেন আস্তে আস্তে কি বলল। সঙ্গে সঙ্গে একজন এস এস মিলিটারি ড্রিল করাবার কায়দায় হাঁক দিল। ডক্টরস, অন ইয়োর ফিট, ডাক্তাররা উঠে দাঁড়াও।

আঃ তাহলে বোধহয় বেঁচে গেলুম এ যাত্রা!

আমরা চারজন ডাক্তার তখনি উঠে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে পরবর্তী আদেশের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

আমার মুখে ও শার্টে রক্ত, মারের চোটে মাথা তখনও ঝিম ঝিম করছে। প্যাণ্টে কাদা লেগেছে।

ডাক্তার মেনজিল আমাদের এগিয়ে কাছে যেতে বলল। কাছে এগিয়ে গেলুম। ডাক্তারের পাশে তিনজন এস এস অফিসার। ডাক্তার মেনজিল আমাকে জিজ্ঞাসা করল,

তোমরা এই ব্যাপারে কতটা অংশ নিয়েছ?

আমি জবাব দিলুম কিছুমাত্র নয়। আমরা রাশিয়ান বন্দীর মৃতদেহ চেরাই করছিলুম, অসম্পূর্ণ অবস্থায় সেই মৃতদেহ এবং টাইপ-রাইটারে অসম্পূর্ণ রিপোর্ট এখনও দেখা যাবে এমন কি আমার সহযোগীদের হাতে এখনও গ্লাভস লাগানো রয়েছে, এই অবস্থায় এস এস গার্ডরা আমাদের এখানে ধরে এনেছে।

এস এস গার্ডদের একজন কর্তা কাছেই দাঁড়িয়েছিল। আমাদের ভাগ্য ভাল যে সে আমার কথা সমর্থন করল। ডাক্তারের এবার

আমার কথা বিশ্বাস হল। তবুও তার রাগ যায় নি, জানি না কার ওপর।

আমার দিকে কঠোর ভাবে চেয়ে বলল: যাও পরিষ্কার হয়ে আবার কাজে যাও। আমি এবং আমার তিনজন সহযোগী আমাদের বাড়িতে ফিরে গেলুম কিন্তু দরজা পার হয়েছি কি হই নি পট পট পট মেসিনগানের আওয়াজ। বুঝলুম যে ক'জন সনডারকমানডোর লোক ওখানে ছিল তাদের সকলকেই হত্যা করা হল। সবুজ ঘাস রক্তে লাল হয়ে গেল। বেচারীরা ভেবেছিল আর একটু পরেই এই নরক থেকে মুক্তি পাবে, তা একেবারেই মুক্তি পেয়ে গেল।

আমরা আর পিছন ফিরে দেখলুম না। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরলুম। সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। তবে টুব্যাকো ও জিগজ্যাগ পেপার ছিল। একটা সিগারেট পাকাবার চেষ্টা করলুম। হাত কাঁপছে, দু'খানা কাগজ ছেঁড়বার পর সিগারেট পাকাতে পারলুম।

সিগারেট ধরিয়ে কয়েকটা টান দেবার পর পা ঠিক হল। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলুম। ভীষণ দুর্বল মনে হতে লাগল। একটা ঝড় বয়ে গেছে তো মনের ওপর দিয়ে। এ যেন গলায় ফাঁসির দড়ি পরানো হয়ে গিয়েছিল, শেষ মুহূর্তে খুলে নেওয়া হল। আমি আমার বিছানায় শুয়ে পড়লুম আর তখনি অনুভব করলুম সারা অঙ্গে যন্ত্রণা। প্রহারের ফল। এতক্ষণ তো সারা দেহমন কিসের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। সমস্ত স্নায়ু অসাড় হয়ে গিয়েছিল। এখন স্নায়ুগুলির চেতনা ফিরে আসছে তাই যন্ত্রণা অনুভব করছি।

অনেক কাণ্ড ঘটে গেল, অনেক সময় পার হয়েগেল কিন্তু ঘড়িতে দেখি মাত্র তিনটে বেজেছে। প্রাণ ফিরে পেয়ে খুব যে আনন্দ হল তা নয়। জানি তো আমার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে আছে। আমি এখন বেপরোয়া। আমি মেনজিলকে চিনতে পেরেছি। সারা ক্যামপে আমার মতো যোগ্য একজনও ডাক্তার এখন নেই তাই কাজের জন্যে আমাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে এবং দ্রুত কাজ আদায়ের জন্যে

আমাকে কিছু সুযোগ সুবিধে দিচ্ছে, কাজ শেষ হলেই জবাই করবে। এ যেন মুরগি পোষা।

বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর আমি শান্ত হলুম। ব্যাপারটা কি ঘটল জানা দরকার। কেউ কি বিশ্বাসঘাতকতা করল?

আজকের তারিখই ছিল সনডারকমানডোদের জীবনের শেষ তারিখ। এস এস গার্ডরা সেইমতো অর্ডার পেয়ে তাদের হত্যা করতে এসে কি বাধা পেয়েছিল?

জানালা দিয়ে দেখতে পেলুম যাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, ঠেলা গাড়ি করে তাদের মৃতদেহগুলি উঠিয়ে চুল্লিঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যারা নিয়ে যাচ্ছে তারা কি জানে যে তাদেরও মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে?

সমস্ত ক্রিমেটোরিয়মে বারো নম্বর সনডারকমানডোদের সকলকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের লাস এখন এনে এক নম্বর ক্রিমেটোরিয়মে জড় করা হচ্ছে। জামাকাপড় খুলে নিয়ে এবার পোড়ানো হবে।

আমি চুল্লিঘরে এলুম। একজন এস এস অফিসার হাতের নম্বর মিলিয়ে নিচ্ছে। সে বলল বারোজন সনডারকমানডোকে পাওয়া যাচ্ছে না এবং সাতজনকে হত্যা করা হয় নি।

সেই সাতজন হল আমি, আমার দুই সহযোগী ডাক্তার, ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, ডায়নামোর এঞ্জিনিয়ার, হেড শফার এবং 'পিপেল'। শেষোক্ত এই পিপেলের অনেকরকম কাজ। বলতে গেলে আপাততঃ সে অপরিহার্য, তাই আপাততঃ তাকে বাঁচিয়ে রাখা হল।

পিপেলের সর্বত্র যাওয়া আসা আছে। এক সময়ে ফাঁক পেয়ে ঘটনার বিবরণ সে আমাকে জানাল। সে বলল

বেলা ঠিক দুটোর সময় এক ট্রাকভর্তি এস এস গার্ড তিন নম্বর ক্রিমেটোরিয়মে আসে। ওদের কমাণ্ডার সনডারের লোকদের আদেশ দিল বাইরে মাঠে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু সনডারেরা

লোকেরা তো জানে কেন তাদের দাঁড়াতে বলা হচ্ছে। কিন্তু তারা যে যার জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কমাণ্ডার অনুমান করল একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সে তখন তাদের ধাপ্পা দেবার চেষ্টায় বক্তৃতা আরম্ভ করল,

তোমরা তো এখানে অনেক দিন কাজ করলে এবং কাজ ভালই করেছ, তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বড় একটা শোনা যায়নি। তা কর্তারা এখন আমাকে অর্ডার দিয়েছেন তোমাদের রেস্ট ক্যামপে নিয়ে যেতে। অন্য জায়গায় ডিউটি দেবার আগে তোমরা কিছুদিন বিশ্রাম করবে। তোমাদের খাবার বাড়িয়ে দেওয়া হবে, সামনে শীত, এবার আর একটু ভাল গরম জামা দেওয়া হবে। আমি যাদের যাদের নম্বর ধরে ডাকব তারা এগিয়ে এসে দাঁড়াবে।

প্রথমে সে তিন নম্বর সনডারকমানডোর একশজন হাঙ্গেরিয়ান বন্দীর নাম ডাকতে লাগল। ওরা সার দিয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেকের মুখে রীতিমতো ভয় ফুটে উঠেছে।

একদল এস এস গার্ড এই হাঙ্গেরিয়ান বন্দীদের ট্রাকে তুলে নিয়ে ডি ক্যামপে নিয়ে গেল। সেখানে ১৩ নম্বর ব্যারাকে ওদের আটকে রাখা হল।

হাঙ্গেরিয়ানদের যখন ট্রাকে বোঝাই করা হচ্ছে তখন গ্রীকদের নম্বর ডাকা হচ্ছে। তারাও লাইন দিল কিন্তু তাড়াতাড়ি নয়, নেহাত অনিচ্ছাসহকারে, তারপর একদল পোল। তারা তো বেশ জোরেই গজগজ করছিল। এস এস গার্ডরা তাদের ধমক লাগাচ্ছিল, চুপ করতে বলছিল কিন্তু তারা গ্রাহ্য করছিল না।

পোলদের পরে অফিসার আবার নম্বর ডাকতে আরম্ভ করল। কোনো সাড়া নেই। কেউ এগিয়ে আসছে না। অফিসারের পায়ের কাছে একটা সোডার বোতল এসে পড়ল এবং সশব্দে ফাটল। চক্ষের নিমেষে অফিসার সমেত সাতজন ধরাশায়ী হল, কয়েকজন তো মরেই গেল।

এগুলি শুধু সোডার বোতল নয়। বোতল বোমা। বোতলের ভেতর বিস্ফোরক ও মারাত্মক রসায়ণ ভরা আছে। বোতলটা ছুঁড়েছে একজন পোল।

সঙ্গে সঙ্গে এস এস গার্ডরা গুলিবর্ষণ আরম্ভ করল। বন্দীরা ক্রিমেটোরিয়মের ভেতরে ঢুকে পড়ল আর ভেতর থেকে এস এস গার্ডদের লক্ষ্য করে বোতল বোমা ছুঁড়তে লাগল।

বাইরে তখনও গ্রীক বন্দীরা দাঁড়িয়ে ছিল। মেসিন গানের গুলিতে অনেক গ্রীক মারা পড়ল। তারা পালাতে পারে নি। কোথায়ই বা পালাবে?

ক্রিমেটোরিয়মের গেটে দারুণ সঙ্ঘর্ষ। এস এস গার্ডরা মেসিন গান থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করছে আর ভেতর থেকে পোলরা বোতল বোমা ছুঁড়ছে। পোলরা বোতল বোমা কি করে সংগ্রহ করল কে জানে? ক্যামপের ভেতরে তৈরি করেছিল হয় তো।

আর সেই সময়েই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। তিন নম্বর ক্রিমেটোরিয়মের ছাদ উড়ে গেল। লোহার কড়ি ভেঙে পড়ল। ধোঁয়া আর আগুন। অনেক লোক সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ল, জখম হল বিস্তর। চার ড্রাম ভর্তি পেট্রল ছিল। তাইতে কিভাবে আগুন লেগে একই সঙ্গে ফেটেছে। বিল্ডিংটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। ভেতরে যারা ছিল সবাই মারা পড়ল। আহতদের তো গুলি করেই শেষ করে দিল। যারা আহত হয়নি তারা মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, আর উঠল না।

আর ওদিকে সেই যে ১০০ জন হাঙ্গেরিয়ানকে ডি ক্যামপের ১৩ নম্বর ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের ব্যারাক থেকে বার করে এনে মেসিন গান চালিয়ে খতম করা হল। এরই নাম রেস্ট ক্যামপে পাঠান।

তিন নম্বরে হঠাৎ এইভাবে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে যায়। এক নম্বর

তখনও নিজের নিজের ডিউটি করে যাচ্ছিল কিন্তু তিন নম্বরে বিস্ফোরণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তারা বুঝল যে কারণে বা ভাবেই হক অ্যাকশন যখন আরম্ভ হয়েই গেছে তখন চুপ করে বসে থেকে লাভ নেই। তবুও ওরা কাজ বন্ধ করে কি ঘটেছে জানবার চেষ্টা করল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এস এস গার্ডরা এসে বন্দুক উঁচিয়ে হুংকার দিল, কে তোদের কাজ বন্ধ করতে বলেছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস? কুকুরের দল?

একজন কি বলতে গেল। একজন এস এস গার্ড তার কথা না শুনে কাঠের মুগুর দিয়ে তার মাথায় এত জোরে মারল যে তার মাথা ফেটে দু ফাঁক হয়ে গেল। রক্তে তার মুখ, বুক ভেসে গেল, তবুও সে পড়ে যায় নি। ভীষণ যোয়ান ছিল লোকটা। বুটের ভেতরে ধারালো, একখানা ছোরা লুকানো ছিল। সাঁ করে ছোরা বার করে সেই গার্ডের বুকে বসিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন গার্ড লোকটিকে ধরে জ্বলন্ত চুল্লির মধ্যে ফেলে দিল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল।

লড়াই আরম্ভ হয়ে গেল। মেসিন গান, রিভলভার, হ্যাণ্ড গ্রেনেড বোমা। দু পক্ষের অনেক লোক মরল। বাইরে ছোট কামান বসাবার পর লড়াই থামল। এদিকে সনডারের কুড়িজন লোক পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছে। তবে তারা রাত্রিবেলায় ধরা পড়েছিল।

ওরা ভিশ্চুলা পার হয়েছিল। পথশ্রমে কাতর হয়ে একটা বাড়িতে আশ্রয় ভিক্ষা চেয়েছিল। বাড়ির মালিক তাদের ভেতরে ঢুকিয়ে নাৎসীদের খবর দিয়েছিল।

ফেরবার পথে শুধু হাতেই ওরা গার্ডদের আক্রমণ করে। কিন্তু সাব-মেসিন গানের সঙ্গে কি শুধু হাতে লড়াই করা যায়? অতএব তাদের মৃত্যুবরণ করতে হল।

এই কুড়িজনের মধ্যে যদি কয়েকজনও পালাতে পারত তাহলে

বাইরের জগতকে জানাতে পারত আমরা কোন নরকে বাস করছি। তবে বিদ্রোহের খবরটা বাইরে পৌঁছেছিল। কনসেনট্রেশন ক্যামপে এই ঘটনা এই প্রথম।

৮৫৩ জন বন্দীকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, এস এস গার্ড মরেছিল ৭০ জন তারমধ্যে কয়েকজন অফিসার ছিল। তিন নম্বর ক্রিমেটোরিয়ম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল আর চার নম্বর ক্রিমেটোরিয়ম অকেজো হয়ে গিয়েছিল।

এটিকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলা যায়।

গতদিন দেহ ও মনের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তার ফলে রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি। ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুম, মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন। সকালে বিছানা ছেড়ে উঠে কিছুই ভাল লাগছিল না। সবেতেই বিরক্তি লাগছিল।

তবুও দৈনন্দিন কাজ তো করতে হবে। গরম জলে বেশ করে স্নান করে বেশ গরম এক কাপ কড়া কফি আর দুটো অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খেয়ে মেজাজটা একটু ভাল হল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে নীচে ইনসিনারেটর রুমে গেলুম। এই ঘরেই কাল আমার সঙ্গীদের পোড়ানো হয়েছে। ইতিমধ্যে তিরিশজন নতুন লোককে সনডারকমানডোতে আনা হয়েছে। এরা মাত্র কয়েকদিন ক্যাম্পে এসেছে। তার আগে কোথায় কোনো ঘেটোতে ছিল, তবুও এখনও কাজ করবার ক্ষমতা হারায় নি।

এদের নতুন জামাকাপড় দেওয়া হয়েছে, আহারও মোটামুটি ভালই দেওয়া হবে তাছাড়া ওরা রোজ কয়েকটা সিগারেট ও ব্র্যাণ্ডি পাবে।

ডিসেকটিং রুমে কোনো কাজ নেই। আমি আমার সহযোগীদের তাই একটা কাজে লাগিয়ে দিলুম। ডিসেকটিং রুমের সমস্ত অস্ত্র ও সরঞ্জাম পরিষ্কার করার কাজে লাগিয়ে দিলুম। ওরা সেগুলি পরিষ্কার ও পালিস করে একেবারে নতুনের মতো করে ফেলল।

এমনকি জানালার জাল ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলল। দু-এক জায়গায় ফুটো হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো মেরামত করে ফেলল।

আমার গায়ের ব্যথা তখনও মরে নি। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। চেয়ারে বসে বসে ওদের কাজ দেখছিলুম আর মনে মনে তারিফ করছিলুম।

ডাক্তার মেনজিল এলে তার সঙ্গে কথা বলে ডিসেকটিং রুমটা এখান থেকে সরাবার চেষ্টা করতে হবে। কারণ ক্রিমেটোরিয়ম বিল্ডিং-এ কোনো কাজে মন দেওয়া যায় না।

হতভাগ্যদের করুণ ক্রন্দন, অন্য চিৎকার, ধোঁয়া, দুর্গন্ধ, এইসব মিলিয়ে মনের ওপব যে প্রতিক্রিয়া হয় তাতে মন দিয়ে কাজ করা যায় না। মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কাজে ভুল হয়ে যায়।

জানি, মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে। চার মাস আমাদের মেয়াদ। আমাদের আগে এগারোটা সনডারকমানডো খতম হয়েছে। আমারও মেয়াদ শেষ হয়েছে। ভাগ্যক্রমে এখনও বেঁচে আছি এবং যুদ্ধের যা গতি প্রকৃতি তাতে মনে হচ্ছে বেঁচে যেতেও পারি। যে কটা দিন বাঁচব চেষ্টা করতে হবে সে কটা দিন যদি একটু শান্তি পাই। যদিও সে আশা সুদূর পরাহত।

কাল এস এস গার্ডের যে লোকগুলো আমাকে বা আমাদের প্রহার করল এবং মাথা লক্ষ্য করে ট্রিগারে হাত রেখে বন্দুক ধরেছিল তারাও অনেকে জখম হয়েছিল। তাঁদের জখমের চিকিৎসাও আমাকেই করতে হয়েছিল। ডাক্তার হিসেবে আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল অতএব আমার অনুরোধ কি মেনজিল রাখবে না?

বসে বসে এইসব ভাবছি আর সেই সময়েই দরজা খুলে মেনজিল ঘরে ঢুকল। ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হবে অতএর আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অ্যাটেনশন হয়ে মেনজিলকে খটাস করে একটা স্যালুট দিয়ে বললুম:

ক্যাপটেন, তিনজন ডাক্তার এবং একজন ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এখন ডিউটিতে আছি।

ডাক্তার আঙুল দিয়ে আমার মাথার ব্যাণ্ডেজটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল তোমার মাথায় কি হয়েছে?

ডাক্তারের মুখে অল্প একটু হাসি। ভাবখানা এমন যে কালকের ঘটনা যেন কিছুই জানে না। জানে ভাল করেই, তবুও একটু কৌতুক করা আর কি। আমি বুঝলুম ডাক্তারের মেজাজ ভাল আছে। এই হত্যালীলার মাঝে থেকে কি করে যে মানুষ মেজাজ ভাল রাখতে পারে তা আমার মাথায় ঢোকে না।

ডাক্তারকে অনেক কথা বলব ভেবেছিলুম কিন্তু বলা হল না। ভয় করতে লাগল। তবুও এক সময়ে যেন কথা প্রসঙ্গে বলে ফেললুম

ক্যাপটেন, এই পরিবেশে তো কাজ করা যাচ্ছে না বিশেষ করে তোমার দেওয়া রিসার্চের কাজগুলি। ডিসেকটিং রুমটা কি একটু ভাল জায়গায় তুলে নিয়ে যাওয়া যায় না?

ডাক্তারের চোয়াল কঠিন হল। গম্ভীর। আমাকে বলল:

কেন? তোমার কি হল? ভাবুক হয়ে পড়ছ নাকি?

ভুল করলুম নাকি? আমি আর কিছু বললুম না। ডাক্তারও কিছু বলল না। আমার মনে হল ডাক্তার বোধ হয় ক্লান্ত। লক্ষ্য করে দেখলুম ডাক্তারের টুপি ও কোট ভিজে।

আমি বললুম, ক্যাপটেন তোমার টুপি আর কোটটা খুলে দাও, আমি অভেন রুমে নিয়ে শুকিয়ে আনি। পাঁচ মিনিটে শুকিয়ে যাবে।

ঠিক আছে, ও ভেজায় আমার কিছু হবে না। কই সেই রাশিয়ান অফিসারের অটোপসি রিপোর্টটা আমাকে দাও।

আমি রিপোর্ট দিলুম কিন্তু ভাল করে পড়ল না। চোখ বুলিয়ে আমাকেফিরিয়ে দিয়ে বলল

তুমি পড় তো, আমার কিছু ভাল লাগছে না। আই অ্যাম ভেরি টায়ার্ড।

আমি কয়েকটা লাইন পড়তে না পড়তে বলল,

রেখে দাও, ওটা বোধহয় লাগবে না।

কি হল ডাক্তারের! মানসিক অবসাদ! হতে পারে বই কি হাজার হলেও মানুষ তো! এবং এই নৃশংস কাজ ডাক্তারকে দিয়ে জোর করে করানো হচ্ছে। আইখম্যান ভীষণ কড়া লোক। ইহুদি সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসার ভার তাকে দেওয়া হয়েছে। সাংঘাতিক লোক এই আইখম্যান।

অন্যমনস্ক হয়ে পিছনে হাত রেখে ডাক্তার পায়চারি করতে লাগল। আমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলুম

ক্যাপটেন, এই হত্যাকাণ্ড কবে থামবে বলতে পার?

ডাক্তার কিন্তু চটে উঠল না। আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল,

মাই ফ্রেণ্ড, এ চলছে, চলবে, চলতেই থাকবে।

পুরো নাম অ্যাডলএ আইখম্যান। অস্ট্রিয়ার লিনজ শহরে বাড়ি। হিটলারেরও আসল বাড়ি এই শহরে। ১৯৩৪ সালে আইখম্যানের বয়স যখন ২৭ তখন সে বার্লিনে এসে গেস্টাপোর সদর দফতরে এস ডি বিভাগে ভর্তি হয়। এই বিভাগের কাজ হল খবর সংগ্রহ করা। বিশেষ করে যারা নাৎসী পার্টির সমর্থক নয় তাদের এবং ইহুদিদের ক্রিয়াকলাপের খবর সংগ্রহ করা ছিল এই বিভাগের মূল উদ্দেশ্য।

আইখম্যানের প্রথম চাকরি হল কার্ড ইণ্ডেক্স বিভাগে। কিন্তু অচিরে সে তার কর্মদক্ষতা প্রমাণ করে। তার ওপর কর্তাদের নজর পড়ল। কার্ড ইণ্ডেক্স থেকে তাকে সরাসরি গেস্টাপোর কেন্দ্রীয় দফতরে বদলি করা হল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল সেই কাজ সম্পাদনে তার নাম স্মল পক্স মড়কের মতো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

নাৎসী পার্টি জার্মানিতে ক্ষমতা দখল করার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি নির্যাতন শুরু হয়। এই নির্যাতনের প্রতিবাদে হার্শেল গ্রীনসবান নামে ১৭ বৎসরের একটি পোলিশ ইহুদি বালক প্যারিসে জার্মান এমব্যাসিতে প্রবেশ করে ফম রাথ নামে একজন জার্মান অফিসারকে গুলি করে হত্যা করে।

অনলে ইন্ধন পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সারা জার্মানি ও অস্ট্রিয়া জুড়ে ইহুদিদের ওপর অকথ্য, অমানুষিক ও বর্বর অত্যাচার আরম্ভ হল। হিটলার প্রতিজ্ঞা করল অস্ট্রিয়া ও জার্মানিতে একটিও ইহুদি রাখবে না। তারপর যখন ইউরোপ জয় করবে তখন ইউরোপ থেকে ইহুদি বংশ নির্বংশ করব। কলির পরশুরাম আর কি।

ইহুদি সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসার ভার দেওয়া হল আইখম্যানের ওপর। চূড়ান্ত মীমাংসা আর কি? ইহুদি দেখলেই তাদের হত্যা কর। একজন দু'জন করে হত্যা করতে তো অনেক সময় লাগবে। সেইজন্যে আইখম্যান কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বানাতে আরম্ভ করল। এইসব ক্যাম্পে গ্যাস প্রয়োগ এবং অন্যভাবে পাইকারি হারে ইহুদি নিধনের ব্যবস্থা। জার্মানিতে নতুন অথচ বিরাট একটা শিল্প স্থাপিত হল। সেই শিল্পের উৎপাদন বলতে গাদা গাদা ছাই।

ইহুদি বিতাড়ন, গ্রেফতার বা নিধন, সমস্ত প্ল্যান আইখম্যান বার্লিনে বসে রচনা করত। কবে কত হাজার ইহুদিকে হত্যা করা হবে সে সব নির্দেশ আইখম্যান পাঠাত। এই সব নির্দেশে সে কোথাও স্বাক্ষর করত না।

যুদ্ধের পরে আইখম্যান ইউরোপ থেকে পালিয়েছিল কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে নি। ইজরেলিরা তাকে ধরে ফাঁসি দিয়েছিল। সে আর এক চাঞ্চল্যকর কাহিনী। যথাস্থানে বলা হবে।

এই নারকীয় হত্যালীলা চলছে, চলবে, চলতেই থাকবে.....

আমি রীতিমতো হতাশ ও শংকিত হয়ে পড়লুম। এই হত্যা-লীলা কি তাহলে শেষ হবে না?

ব্যাগ নিয়ে মেনজিল উঠে পড়ল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। আমি তার সঙ্গে সঙ্গে তার গাড়ি পর্যন্ত চললুম। গাড়িতে উঠে আমাকে বলল: কয়েকদিনের মধ্যেই তোমাকে কিছু নতুন কাজ দোব।

মেনজিল চলে গেল। কি নতুন কাজ? আমি ভাবতে থাকি।

মেনজিলকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফেরবার সময় ক্রিমেটোরিয়মের চুল্লি ঘরে ঢুকে দেখি সেখানে সংস্কার কাজ হচ্ছে। দরজা জানালায় ও দেওয়ালে নতুন রং লাগানো হচ্ছে, যন্ত্রপাতি, ডায়নামো ইত্যাদি মেরামত করা হচ্ছে। ফারনেসগুলিতে নতুন ফায়ার ব্রিক বসানো হচ্ছে। আরও নানারকম কাজ হচ্ছে।

এ আয়োজন কি জন্যে?

শুনলুম লিনজমানস্টাড ঘেটো থেকে সত্তর হাজার হতভাগ্য ইহুদি এসে গেছে। তাদের মধ্যে ৯৫ শতাংশ বাঁ দিকের লাইনে পড়েছে আর বাকি ৫ শতাংশ ডান দিকের লাইনে। অর্থাৎ এই ৫ শতাংশ আপাততঃ বেঁচে গেল। ওদের সকলকেই ব্যারাকে রাখা হয়েছে। আজ কালের মধ্যে ডাক পড়বে। ঘেটোর টরচার চেম্বার থেকে গ্যাস-চেম্বারে।

লিনজমানস্টাড ঘেটো ১৯৩৯ সালে জার্মানরা স্থাপন করেছিল। তখন এই ঘেটোতে থাকত পাঁচ লক্ষ ইহুদি। ওদের বিভিন্ন কলকারখানায় কাজ করতে পাঠানো হতো। পরিশ্রমের তুলনায় যে মজুরি দেওয়া হত তাতে ওদের পেটভরার মতো আহার জুটতো না। এ ছাড়া নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাস করার ফলে ঘেটোতে মড়ক লেগেই থাকত। ফলে ১৯৪৪ সালে চার লাখের ওপর ইহুদি শেষ। বাকি ছিল সত্তর হাজার। তাও শেষ হল বলে।

ইহুদিদের শেষ করবার এটাও একটা প্ল্যান।

ওদের যখন অসউইজ ক্যাম্পে আনা হল তখন ওদের কাছ থেকে পাওয়া গেল কয়েকখানা কর্নফ্লেকের বিস্কুট, একটু করে তিসির তেল, তিন চার পাউণ্ড জইয়ের আটা, পানীয় জল। তাও আবার সকলের কাছে এইসব সামগ্রী ছিল না, পরিমাণেরও ব্যতিক্রম ছিল।

এদের কারও দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো ছিল না, সোনার ফ্রেমের চশমা বা সোনার আংটিও কারও ছিল না। থাকলেও ঘেটোতেই খুলে নেওয়া হয়েছে।

লিনজমানস্টাড ঘেটোর ইহুদি নিধনের ব্যাপারে একটা ঘটনা আমি ভুলতে পারি নি। গ্যাস-চেম্বারে যাদের হত্যা করা হল তাদের মধ্যে একটি কুব্জ ও তার একটি কিশোর ছেলে ছিল।

আমার ওপর আদেশ হল এই দুজনের লাস পোস্টমর্টেম করে রিপোর্ট দিতে হবে। তাদের গ্যাস-চেম্বারে পাঠান হল না। মাসফেল্‌ডের ডাক পড়ল। দুজনের ঘাড়ে গুলি করে সে তার কর্তব্য শেষ করল। তারপর আমি আমার কাজ শেষ করে মেনজিলকে রিপোর্ট দিলুম।

রিপোর্ট পড়ে মেনজিল বলল এই লাস দুটো যেন পোড়ানো না হয়। এদের পুরো কংকাল বার্লিনে অ্যানথ্রোপলজিক্যাল মিউজিয়মে পাঠান হবে।

মনে মনে ভাবলুম বার্লিনে মিউজিয়মে কংকাল তো পাঠাবে কিন্তু বার্লিনের ওপরে অ্যামেরিকান আর ইংরেজদের বোমাবর্ষণ যে হারে দিন দিন বাড়ছে তাতে শেষ পর্যন্ত তোমার ঐ মিউজিয়ম থাকবে তো!

মেনজিল জিজ্ঞাসা করল: তুমি কি করে কংকাল তৈরি করবে?

আমি বললুম: দুটো পদ্ধতি আছে। প্রথম পদ্ধতি হল লাস দুই সপ্তাহ লাইম ক্লোরাইডে ভিজিয়ে রাখতে হবে। সব মাংস গলে জীর্ণ হয়ে যাবে, হাড় থেকে খসে খসে পড়বে। তারপর সেটিকে পেট্রলে ডুবোলে হাড়ের গায়ে লেগে থাকা মাংস ও চর্বি পরিষ্কার হয়ে

বেরিয়ে আসবে। হাড় ধবধবে সাদা হয়ে যাবে ও তাড়াতাড়ি হাড় শুকিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটা কি? মেনজিল জিজ্ঞাসা করল

স্রেফ জলে সেদ্ধ করা যে পর্যন্ত না মাংস গলে হাড় থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছে। তারপর হাড় থেকে মাংস ছাড়িয়ে নিয়ে পেট্রলে চুবিয়ে পরিষ্কার করা।

প্রথম পদ্ধতি তো অনেক সময় লাগবে, মেনজিল বলল, অতদিন অপেক্ষা করা যাবে না, তুমি ঐ সেদ্ধ করার ব্যবস্থাই কর।

কি বীভৎস ব্যাপার! আমার গা ঘিন ঘিন করতে লাগল। তবুও কি আর করব। আদেশ মানতেই হবে।

সেদ্ধ করতে হলে বড় ডেকচি চাই। মাসফেল্‌ডের স্মরণাপন্ন হলুম। মাসফেল্‌ডের মতো অমন কড়া মানুষও স্তম্ভিত। যা হক সে একটা ব্যবস্থা করে দিল। কোথায় নাকি লোহার পাত্র ছিল কাপড় সেদ্ধ করার জন্যে।

মাসফেল্‌ড সেই লোহার পাত্র আনিয়ে দিল। বিরাট উনুন তৈরি করিয়ে দিল। ক্রিমেটোরিয়মের মধ্যেই সেদ্ধ করা হবে। পাত্রটা বিরাট। একটা পাত্রেই দুটো লাস কুলিয়ে গেল।

সনডারকমানডোর দুজন কর্মীর ওপর সেদ্ধ করার ভার দেওয়া হল। মাসফেল্‌ড অনেক কাঠ পাঠিয়ে দিয়েছিল। সনডারকমানডোর লোক দুজনেই সব ঠিকঠাক করে লাস সমেত পাত্র উনুনে চড়িয়ে জল ঢেলে উনুন ধরিয়ে দিল। বিরাট উনুন। শুকনো পাইন কাঠ, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল।

পাঁচ ঘণ্টা পরে এসে আমি লাস পরীক্ষা করে দেখলুম সেদ্ধ হয়ে গেছে, যাকে বলে মাংস গলে গেছে। হাড় থেকে মাংস খসে পড়ছে।

আমি বললুম, আর কাঠ দিয়ো না। আগুন নিবে যাক, পাত্র ঠাণ্ডা হক, তারপর নামানো যাবে এখন।

এরপর যা ঘটল তা অতিশয় করুণ।

আমি একটু দূরে গিয়ে একটা গাছতলায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলুম। ভাবছি কংকাল তৈরি করার ভার আমার সহযোগী ডাক্তার দু'জন ও ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্টের ওপর দেব। এ কাজ আমি নিজের হাতে করতে পারব না। এ অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ।

এমন সময় একজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। সে হাঁফাতে হাঁফাতে আমাকে বলতে লাগল—

ডাক্তার, ডাক্তার, তাড়াতাড়ি এস, পোলরা তো ঐ মাংস খাচ্ছে।

সে কি? আমি চমকে উঠি। মানুষ মানুষের মাংস খাচ্ছে? আমি ছুটে গিয়ে দেখি যে, চারজন পোল সেই লোহার পাতের কাছে ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পরনে কয়েদির ডোরাকাটা জামা। ওরা রাজমিস্ত্রি। দিনের কাজ শেষ করে অপেক্ষা করছিল। গার্ড এসে ওদের ব্যারাকে নিয়ে যাবে।

নিশ্চয় তাদের ক্ষিধে পেয়েছিল। কিছুই তো খেতে পায় না। তখন পাত্রের কাছে কেউ ছিল না। মাংসের গন্ধ পেয়েছে। কিসের মাংস জানে না। ভেবেছে সনডারকমানডোদের জন্যে বুঝি মাংস সেদ্ধ হচ্ছে। প্রত্যেকেই বেশ খানিকটা করে মাংস তুলে এনে খেতে আরম্ভ করেছে। তবে বেশি খেতে পারে নি। সনডার-কমানডোর লোকেরা দেখতে পেয়েছিল।

যখন তাদের বললুম যে ওরা মানুষের মাংস খেয়েছে, ওরা তৎক্ষণাৎ বমি করে ফেলল। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। প্রত্যেকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। একজন হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতে লাগল।

এই ঘটনা আমি ভুলতে পারি নি।

আমার ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্টই কংকাল তৈরি করে দিল। কংকাল দেখে মেনজিল খুব খুশি। সেই কংকাল বেশ করে প্যাক করে প্যাকিং কেসে ভর্তি করে ওপরে মোটা মোটা অক্ষরে লিখে

দেওয়া হল 'আর্জেন্ট : ন্যাশানাল ডিফেন্স'। তারপর সেই প্যাকিং কেস বার্লিনে চালান দেওয়া হল। ওদিকে এক সপ্তাহের মধ্যে লিনজমানস্টাড ঘেটোর হতভাগ্যদের নিধনপর্ব সমাপ্ত হয়ে গেল।

১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাস। তুষারপাত আরম্ভ হয়ে গেছে। চারদিক সাদায় সাদা। তুষারপাতের সময় ওয়াচটাওয়ারগুলো আবছা দেখায়। জোরে হাওয়া বয়। চারদিক শান্ত। ক্রিমোটেরিয়মের কাজ বন্ধ। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোয় না, আগুনের শিখাও দেখা যায় না।

সে আর ক'দিনের জন্যে? রাক্ষুসে চুল্লির ক্ষুধা নিবারণের কাজ আবার আরম্ভ হয়ে গেল।

তারিখটা আমার মনে আছে। ১৭ নভেম্বর। একজন এস এস নন-কমিশনড অফিসার আমাকে একদিন চুপি চুপি বলল ওপর থেকে নাকি অর্ডার এসেছে আর বন্দী হত্যা করা হবে না। খবরটা নাকি রেডিও মারফত এখানে এসেছে।

আমার কিন্তু বিশ্বাস হল না। দেখা যাক।

দু'দিন পরে একটা ট্রেন এল। ট্রেন থেকে নামল ৫০০ দুর্বল ও অক্ষম নরনারী। পরের দিন আরও ৫০০ জন এল।

এরা ট্রেন থেকে নামার পর মেডিক্যাল সিলেকশন হল না। সক্ষম ও অক্ষমের দুটো লাইনে ভাগ করা হল না। রুটিনের রীতিমতো ব্যতিক্রম। এবার সত্যিই আমি অবাক হলুম। অসউইজ ক্যাম্পের সব কাজকর্ম যেন বন্ধ হয়ে গেল।

ইহুদি নিধন হঠাৎ বন্ধ হল কেন? কারণ কি? কারণ একটা আছে। সেটা আমি অনেক পরে জানতে পেরেছিলুম। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে।

হিমলার ছিল গেস্টাপোর সর্বেসর্বা। আইখম্যান তার অধীন। আইখম্যানকে হিমলারের আদেশ মানতে হত।

সেই হিমলারের পেটে একটা তীব্র যন্ত্রণা হত। হিমলার প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই যন্ত্রণায় ভুগত। রাত্রে ঘুমোতে পারত না। কোনো চিকিৎসায় ফল হয় নি।

একজন ডাক্তারের সন্ধান পাওয়া গেল। পাশকরা ডাক্তার হলেও সে সাধারণ চিকিৎসা করে না। সে চিকিৎসা করে ব্যথা বেদনার, ম্যাসাজ করে ব্যাথা সারায়।

ডাক্তারের নাম ফিলিক্স কারসটেন, ফিনল্যাণ্ডের নাগরিক কিন্তু সে প্রাকটিশ করত হল্যাণ্ডের হেগ শহরে। বার্লিন ও রোমেও তার চেম্বার ছিল, এই দুই শহরেও মাঝে মাঝে তার চেম্বারে বসত।

হিমলারের চিকিৎসার জন্যে সেই ডাক্তারের ডাক পড়ল। স্বয়ং হিমলার ডেকেছে অতএব ডাক্তারকে আসতে হল।

১৯৩৯ সালের মার্চ মাস। আর কয়েক মাস পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবে। সমস্ত ইউরোপ তখন একটা বারুদ স্তুপের ওপর বসে আছে। বার্লিনের ৮ নম্বর প্রিন্স অ্যালবার্ট স্ট্রীট একটি বিখ্যাত ঠিকানা। এই বাড়িতে হিমলার বাস করে। এই বাড়িতেই তার অফিস।

হিমলার স্বয়ং এসে ডাক্তারকে অভ্যর্থনা করে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। অমন দুর্ধর্ষ হিমলার লোকটিকে হাতে পেয়ে যেন ভিখিরির মতো কাঙাল হয়ে গেল। আবেগকম্পিত স্বরে বলল—

তোমাকে ধন্যবাদ ডাক্তার, অনেক ধন্যবাদ, আমি ভেবেছিলুম তুমি বুঝি আসতে পারলে না, বোসো ডাক্তার।

দুজনে বসবার পর হিমলার বলল—

ডাক্তার আমি মরে যাচ্ছি, উঠতে বসতে তীব্র যন্ত্রণা, অথচ মাথার ওপর বিরাট দায়িত্ব, সারাক্ষণ আমি যন্ত্রণা ভোগ করছি, এইজন্যেই আমি বোধ হয় এত নিষ্ঠুর, তুমি আমার রোগ সারাতে পারবে তো?

ডাক্তার কারসটেন কোনো উত্তর দিল না। যে লোক সারা ইউরোপের বিভীষিকা, সারা দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে, দেশটা

কনসেনট্রেশন ক্যামপে ভরে তুলেছে তার আকুল প্রার্থনা-কাতর মুখের দিকে চেয়ে দেখল কারসটেন।

ডাক্তারের উত্তর শোনবার জন্যে তার মুখের দিকে ব্যাকুলভাবে চেয়ে আছে হিমলার। ডাক্তার বলল :

হের রাইখুসফুরের, আপনি আপনার গায়ের সব জামা খুলে ফেলুন, কোমরের বেল্ট আলগা করুন, এইবার ডিভানে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন, আলগা হয়ে।

একটা চেয়ার টেনে ডাক্তার হিমলারের পাশে বসল তারপর হিমলারের দেহের ওপর ডাক্তার মৃদুভাবে হাত বোলাতে লাগল। ডাক্তারের হাত দুটি বেশ পুরু ও মাংসল, ছোট নখ আর নখের নীচে যেন বাড়তি কিছু মাংস আছে, আঙুলের ডগাগুলি যেন ফোলা ফোলা।

ডাক্তার এখন রীতিমতো সিরিয়স। রোগীকে পরীক্ষা করছে মুখের ভাব বদলে গেল। রোগ লক্ষণ ডাক্তার যেন আঙুল দিয়ে শুনছে। কোমল অথচ দ্রুত আঙুল চলছে। ডাক্তার যেন সেতার বাজাচ্ছে। চোখ বুজে ডাক্তার কি অনুভব করছে। কখনও ভুরু কোঁচকাচ্ছে, কখনও কপালে কুঞ্চনরেখা, কখনও মুখে বুদ্ধের প্রশান্তি। গলা, বুক, পেট, সর্বত্র ডাক্তারের আঙুল চলছে।

পেটের এক জায়গায় চাপ দিতেই হিমলার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চিৎকার করে উঠল অবুঝ মহিলার মতো।

ডাক্তার হাত সরাল না। বলল, ঠিক আছে একটু সহ্য করুন।

হিমলার দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছে! যন্ত্রণায় মুখ নীল হয়ে গেছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

এই জায়গাটাতেই খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, নয়কি?

উঃ ভীষণ যন্ত্রণা ডাক্তার, আর পারি না

বুঝেছি, যন্ত্রণা তাহলে পাকস্থলীতে এবং সংশ্লিষ্ট নার্ভগুলিতে, বলতে বলতে ডাক্তার হাত তুলে নিল।

আমাকে কি একটু আরাম দিতে পারবে ডাক্তার, আমার এ রোগ সারবে না জানি ডাক্তার, যতদিন আমি আমার পদে অধিষ্ঠিত থাকব ততদিন আমার এ রোগ সারতে পারে না, আমি চাই একটু আরাম। আমি চাই রাত্রে মাত্র দু'ঘণ্টা ঘুমোতে, পারবে ডাক্তার?

হিমলারের কাতর আবেদন।

চেষ্টা তো করতেই হবে, বলতে বলতে ডাক্তার আবার হিমলারের পেটের সেই জায়গাটা চেপে ধরল। সেখানে যেন একটা মাংসপিণ্ড আছে। সেটাকে ডাক্তার টিপতে লাগল, চাপ দিতে লাগল আস্তে আস্তে মোচড়ও দিল। হিমলার যন্ত্রণায় চিৎকার করছে।

কয়েক মিনিট পরে ছেড়ে দিয়ে ডাক্তার বলল, আজ এই পর্যন্ত, কি রকম বুঝছেন?

হিমলার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। তখন তার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে আর দেহের ভিতর কি ঘটল তাই অনুভব করবার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ পরে বলল

হ্যাঁ, ভালই মনে হচ্ছে, আরে এ তো অবাক কাণ্ড, আমার ব্যথা যেন হারিয়ে গেল।

তবুও হিমলারের ভয়, আবার বুঝি ব্যথা ফিরে আসে। ভয়ে ভয়ে উঠে বসল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে জামা পরতে লাগল। কিন্তু সেই তীব্র যন্ত্রণা আর ফিরে এল না।

কোনো ওষুধেই কাজ হয় না ডাক্তার এমন কি মরফিয়া ইঞ্জেকসন-ও ব্যর্থ হয়েছে আর তুমি কি করলে ডাক্তার? এমন আরাম আমি কতদিন যে পাইনি তা মনে করতে পারছি না, এ যে অবিশ্বাস্য।

তারপর হিমলার ডাক্তারের হাত ধরে বলল, তোমাকে আমি ছাড়ব না ডাক্তার, তোমাকে সর্বদা আমার সঙ্গে থাকতে হবে। আমি তোমাকে এস এস এর কর্নেলের মর্যাদা দিলুম।

ডাক্তার যদিও মনে মনে বুঝল যে সে জার্মানির বিভীষিকা হিমলারকে জয় করেছে তবুও সে হিমলারের প্রস্তাবে অসোয়াস্তি

বোধ করতে লাগল। এস এস-এর কর্নেল? তার দেশবাসীরা যে তাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করবে! তাই ডাক্তার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল

হেয়র রাইখসফুরের, আপনি আমাকে যে মর্যাদা দিলেন তাতে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি কিন্তু আমি সাধারণ একজন ডাক্তার হিসেবেই থাকতে চাই। আপনি অনুগ্রহ করে আপনার দেওয়া সম্মান প্রত্যাহার করুন। আমি হল্যাণ্ডে বসবাস করি। সেখানে আমার চেম্বার আছে, অনেক রোগী আছে, তাদের ছেড়ে বারলিনে থাকা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে আমি আপাততঃ পনেরো দিন বারলিনে আছি। খবর পেলেই আসব। এখানে আমার কয়েকজন রোগী আছে।

বেশ ডাক্তার, তাহলে সেই রোগীদের সঙ্গে আমার নামটাও লিখে নাও কিন্তু তোমাকে রোজ একবার করে আসতে হবে। তোমার যখন সুবিধে আসবে বলতে বলতে হিমলার একটা সুইচ টিপল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে একজন এস এস গার্ড ঘরে ঢুকে খটাস করে গোড়ালি ঠুকে হিমলারকে একটা স্যালুট দিয়ে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল।

হিমলার তাকে বলল, সকলকে বলে দাও ডক্টর কারসটেন যখন ইচ্ছে এখানে আসবেন। কেউ যেন কোনোরকম বাধা না দেয়। আমার আদেশ সবাইকে জানিয়ে দাও, বুঝলে? ভুল যেন না হয়।

রক্ষী আবার স্যালুট দিয়ে অ্যাবাউট টার্ণ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কারসটেনও রোজ আসতে রাজি হয়ে বিদায় নিল।

সে জানে যতদিন বারলিনে থাকবে ততদিন তাকে রোজ আসতেই হবে। হিমলারের আদেশ উপেক্ষা করলে বিপদ হতে পারে।

হিমলারের চিকিৎসা করতে ডাক্তার কারসটেন আগ্রহী ছিল না। তার এক পুরনো রোগী ও শুভার্থী বন্ধুর অনুরোধে রাজি হয়েছিল।

ডাক্তারের চিকিৎসায় হিমলার যদি আরোগ্য লাভ করে তাহলে সেই বন্ধুর কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ হবে। বন্ধুর খাতিরে কারসটেন রাজি হয়েছিল নইলে ডাক্তার নাৎসীদের চিকিৎসা করে না আর নিষ্ঠুরতম নাৎসীর চিকিৎসা তো নয়ই।

যাইহক হিমলারের চিকিৎসা চলতে লাগল। কয়েকদিন চিকিৎসার পরই অদ্ভুত ফল দেখা গেল। কারসটেন স্বকীয় পদ্ধতিতে ডাক্তারের পেটে হাত বোলালে হিমলারের যন্ত্রণার উপশম হত। হিমলার তখন সহজ মানুষ, সমস্ত গাম্ভীর্য পরিহার করে ডাক্তারের কাছে মুখ খুলত।

ক্রমে ডাক্তার কারসটেন সেই নিষ্ঠুর মানুষ হিমলারের ওপর দারুন প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধের সময় তো কারসটেনকে হিমলারের সঙ্গে থাকতে হত আর এই সময়েই ডাক্তার সুযোগ বুঝে বহু হতভাগ্য ইহুদির প্রাণ বাঁচিয়েছে।

এজন্যে ডাক্তারও কয়েকবার বিপদে পড়েছে এমন কি তার প্রাণ-নাশের চেষ্টাও হয়েছিল।

যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে আসছিল তখন হিটলার রীতিমতো উন্মত্ত। ক্রোধে ক্ষিপ্ত। কারণ জার্মানি তখন হারছে। হিমলারকে হিটলার অর্ডার দিল যে রাশিযান বা অ্যামেরিকানরা কোনো কনসেনট্রেশন ক্যামপের পাঁচ মাইলের মধ্যে এসে পড়লে সেই কনসেনট্রেশন ক্যামপ যেন ডিনামাইট মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

সর্বনাশ! তখনও যে কনসেনট্রেশন ক্যামপগুলিতে আট লক্ষ ইহুদি আছে। এরা সবাই মরবে।

খবরটা কারসটেনের কানে এল। হিমলারকে জিজ্ঞাসা করল, যা শুনছি তা কি সত্যি? হিটলার নাকি সমস্ত ক্যামপ বন্দী সমেত উড়িয়ে দেবার অর্ডার দিয়েছেন আপনাকে?

হ্যাঁ, আমরা যদি যুদ্ধে মরি আমাদের শত্রুরাও আমাদের সঙ্গে মরবে, হিমলার উত্তর দেয়।

সে কি রাইখসফুরের? অতীতের জার্মান নেতারা এমন জঘন্য কাজ কখনই করতেন না। আমার তো মনে হয় বর্তমানে আপনার তুল্য মহান নেতা জার্মানিতে একজনও নেই, তাছাড়া এখন আপনার ক্ষমতা স্বয়ং হিটলারের চেয়েও বেশি। আপনি এই আদেশ মেনে নেবেন? সারা পৃথিবীর লোক আপনাকে ঘৃণা করবে এইটে আপনি চান?

কারসটেনের কথা হিমলার উপলব্ধি করল। কারসটেন কিছু অন্যায় বলে নি। কিন্তু কোনো উত্তর দিল না।

কারসটেন আশা ছাড়ল না। সে চাপ দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন। শেষ পর্যন্ত মানবতার দাবিতে হিমলার রাজি হল।

অবশেষে ১৯৪৫ সালের ১২ মার্চ তারিখে হিমলার একটি ঐতিহাসিক দলিল স্বহস্তে মুসাবিদা করল। মহাযুদ্ধের একটি স্মরণীয় দলিল। 'এ কনট্রাক্ট ইন দি নেম অফ হিউম্যানিটি' নামে একটি চুক্তি হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল হাইনরিশ হিমলার ও ফিলিপ্স কারসটেন। চুক্তির শর্তাবলী:—

১। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলি ডিনামাইটের সাহায্যে ধ্বংস করা হবে না।

২। আর একজনও ইহুদিকে হত্যা করা হবে না।

৩। ব্যক্তিগতভাবে ইহুদি বন্দীদের সুইডেন উপহার প্যাকেট পাঠাতে পারে।

এই চুক্তির ফলেই অসউইজ ক্যাম্পে ইহুদি নিধন বন্ধ হয়েছিল।

উপরোক্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার কয়েক মাস আগে মেনুজিল একদিন আমাকে বলেছিল অসউইজ ক্যাম্প উড়িয়ে দেওয়া হবে। আপাততঃ দুটো ক্রিমেটোরিয়ম ভেঙে ফেলা হবে। অকটোবর মাসে একটা তো ধ্বংস হয়ে গেছেই, একটা মাত্র থাকবে। যে সব বন্দী মড়কে বা হাসপাতালে মরবে তাদের পোড়াবার জন্যে একটা

ক্রিমেটোরিয়ম থাকবে। ডিসেকটিংরুম সেই ক্রিমেটোরিয়মে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

পরদিনই কাজ আরম্ভ হল। দুটো ক্রিমেটোরিয়ম ভাঙা আরম্ভ হয়ে গেল। নাৎসীরা তাদের পাপের নিদর্শন রেখে যেতে চায় না।

আমাদের কোনো কাজ নেই। চুপচাপ বসে থাকি।

একদিন মাসফেল্ড এসে খবর দিল রাশিয়ানরা ৪০ কিলোমিটারের মধ্যে এসে গেছে। জার্মান সৈন্যরা বাধা দিতে পারছে না। শহর ছেড়ে জার্মানরা এখন গ্রাম বা জঙ্গলের দিকে পালাচ্ছে। ইটস্ অল ওভার।

একদিন শোনা গেল ডাক্তার মেনজিল নিরুদ্দেশ, সে অসউইজ ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়েছে। একজন নতুন ডাক্তার এসেছে। অসউইজের নামও পাল্টে দেওয়া হয়েছে। নতুন নাম আর্বাইটস-ল্যাগার অর্থাৎ ওয়ার্ক ক্যাম্প।

রাশিয়ানরা দ্রুত এগিয়ে আসছে। কামান গর্জন শোনা যাচ্ছে। দরজা জানালা থর থর করে কেঁপে উঠছে।

এদিকে শুনছি আমাদের ক্যাম্পের সর্বত্র নাকি মাটিতে ডিনামাইট পোঁতা হয়ে গেছে। অর্ডার হলেই ক্যাম্প উড়িয়ে দেওয়া হবে। সত্যিই ডিনামাইট পোঁতা হয়েছে কিনা সঠিকভাবে জানবার উপায় নেই। তবে কি আমরা পালাতে পারব না? এখানেই আমাদের মাটি নিতে হবে? রাশিয়ানরা আর কত কিলোমিটার দূরে?

পর পর কয়েকটা বিস্ফোরণের ফলে মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। ডিনামাইট ফাটছে নাকি? ফটাফট দরজা জানালা খোলার আওয়াজ এবং দুমদাম পায়ের শব্দও পাচ্ছি। কোনো কোনো ঘরে বা বিল্ডিং-এ আলো জ্বলছে।

এস এস রুমের দরজা খোলা। ক্রিমেটোরিয়মের বড় গেটটাও নাকি খোলা। কি ব্যাপার। অনেক কথা, অনেক চিৎকার শোনা

যাচ্ছে ওয়াচটাওয়ারগুলোও অন্ধকার। সার্চলাইট জ্বলছে না। কি ব্যাপার? নাৎসীরা কি ক্যাম্প ছেড়ে পালাল নাকি?

সকলেই উঠে পড়েছে। নাৎসীরা পালিয়েছে।

নাৎসীরা পালিয়েছে? একটাও এস এস গার্ড নেই? তাহলে চল আমরাও পালাই। এই সব ওঠ। যা পার পরে নাও, যা পার সঙ্গে নাও।

আমরা আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে রাজি নেই। গত আট মাস ধরে আমাদের মাথার ওপর মৃত্যুর খাঁড়া ঝুলছে। যম কয়েকবার এসে হানা দিয়েও গেছে।

রাশিয়ানদের জন্যেও আমরা অপেক্ষা করতে রাজি নই। রাশিয়ানদের তাড়া খেয়ে যে সব জার্মান সৈনিক পালিয়ে আসছে আমরা যদি তাদের খপ্পরে পড়ি তাহলে তারা আমাদের শেষ করে দেবে।

ভাগ্যক্রমে ক্রিমেটোরিয়মের স্টোরে বেশ পুরু সোয়েটার, ওভারকোট, বুটজুতো ছিল। বাইরে তখন প্রচণ্ড শীত, শূন্য ডিগ্রির নীচে ১০ ডিগ্রি টেমপারেচার।

খাবার ওষুধ এবং সিগারেটও স্টকে ছিল। তাও আমরা যত পারলুম সঙ্গে নিলুম। একটা ঘরে দেখলুম প্রচুর সোনা রয়েছে, কিন্তু আমরা স্পর্শ করলুম না। কেউ কেউ বলেছিল ওতো আমাদেরই কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া, অতএব আমরা নেবো না কেন?

কিন্তু তখন আমরা পালাতে খুবই ব্যস্ত। আশংকা, যদি নাৎসীরা ফিরে আসে। তাছাড়া সোনা নিতে গেলে এখনই নিজেদের মধ্যে বা পরে রাস্তায় নিজেদের মধ্যে মারামারি হানাহানি লেগে যেতে পারে। আমরা কেউ সোনা স্পর্শ করলুম না।

অসউইজ ক্যাম্পের মেন গেট দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলুম। পথ খোলা। বাধা দেবার কেউ নেই। চল চল এগিয়ে চল।

আমরা বিরকেনাউ অরণ্যের পথ ধরলুম। আমাদের আগে কত

হতভাগ্য এই পথ দিয়ে যেয়ে অরণ্যের আড়ালে নাৎসী ঘাতকের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেছে।

লম্বা লম্বা স্প্রুস গাছগুলো সাদা তুষারের আস্তরণে আবৃত। অন্ধকারে মনে হচ্ছে, এক একটা গাছ যেন সাদা মুখোস পরে মৃত্যু-দূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

ওধারে আগুন জ্বলছে কিসের? দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আমরা এগিয়ে গেলুম। নাৎসী গার্ডরা বিরকেনাউ ক্যাম্পে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। হাজারখানেক বা তারও বেশি বন্দী বাইরে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। কি করবে বুঝতে পারছে না।

সেই রাত্তিরে শীতে এবং দুর্বল মানসিক অবস্থার জন্যে আপাত-দৃষ্টিতে যা দেখেছিলুম তা ঠিক নয়।

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল ঠিকই কিন্তু তার আগেই বিরকেনাউয়ের সেই ক্যাম্প ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। প্রাঙ্গণে বেশ কিছু পাইন কাঠের গুঁড়ি গাদা করে রাখা ছিল, সেইগুলোতে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। সেই কাঠের গুঁড়িগুলোই দাউ দাউ করে জ্বলছিল।

এস এস গার্ডরা কেউ পালিয়ে যায়নি। আমরা যখন সেখানে পৌঁছলুম তখন তারা নিজেদের জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিচ্ছিল। তবে তারাও পালাবার জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছিল।

ওখানে তখন তিন হাজার বন্দী ছিল। আমাদের সংখ্যা বেশি ছিল না। ব্যারাকে যারা ছিল তারা আমাদের সঙ্গে আসতে পারে নি। তারা এতই দুর্বল ছিল যে ব্যারাকের বাইরে এই পথটুকু আসতে আসতেই শীতে তারা মারা যেত! না ছিল তাদের গরম পোশাক, না ছিল জুতো!

আমরা ঐ তিন হাজার বন্দীর সঙ্গে যোগ দিতেই এস এস গার্ডরা আমাদের ঘিরে ফেলল তবে তাদের আর রুদ্রমূর্তি নেই। মনে হল তারা আমাদের ছাড়বে না, অন্য ক্যাম্পে নিয়ে যাবে।

আমরাই বা যাব কোথায়? এত লোক! গার্ডরা যদি আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে তাহলে আপত্তি কি? ওদের সঙ্গে রাস্তার ম্যাপ আছে, অস্ত্রও আছে। পথে বিপদও আছে। এখন আমরা ওদের হাতে পড়ে গেছি। না গিয়েও উপায় নেই।

রাত্রি একটার কিছু পরে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হল। আগে, পিছনে ও দুপাশে এস এস গার্ডরা চলল। তারাও পালাচ্ছে। তারাও প্রাণভয়ে ভীত। রাশিয়ানদের হাতে তাদেরও বন্দী হবার সম্ভাবনা। অসউইজ ক্যাম্প ছেড়ে এস এস গার্ডরা যখন লরি চেপে পালিয়ে যায় তখন এই বিরকেনাউ ক্যাম্পের গার্ডদের সঙ্গে নেয় নি বা খবরও দেয় নি। এদের কাছে লরি নেই অতএব পায়ে হেঁটেই পালাতে হবে। বিরকেনাউ ক্যাম্প থেকে টেলিফোন করে এরা জানতে পারে যে অসউইজ ক্যাম্প থেকে সবাই পালিয়েছে। তখন এরাও পালান সাব্যস্ত করে।

ভাগ্যিস বিরকেনাউ ক্যাম্পে গ্যাস-চেম্বার নেই তাহলে বোধহয় গার্ডরা এই তিন হাজার বন্দীকে হত্যা করে যেত। কিন্তু এতজনের ঘাড়ে গুলি করে বা মেসিন গান চালিয়ে হত্যা করতে সময় লাগবে তাছাড়া এখন পালাবার সময় সঙ্গে গুলি থাকা দরকার কারণ রাশিয়ান অ্যাডভান্স গার্ডের হাতে পড়বার সম্ভাবনা আছে। যে কারণেই হক আপাততঃ গার্ডদের সুবুদ্ধির উদয় হয়েছিল।

আমাদের সত্যি সত্যিই যে রাশিয়ান অ্যাডভান্স গার্ডের হাতে পড়তে হবে আমরা তা ভাবি নি। প্রায় পাঁচ কিলোমিটার যাবার পর হঠাৎ গুলি বর্ষণ শুরু হল। আমাদের এস এস গার্ডরা বলল রাস্তার ধারে নীচে নেমে যেয়ে মাটিতে শুয়ে পড়তে।

দুপাশে বেশ গুলি বর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেল কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল। ওদের সঙ্গে হালকা ট্যাংকও ছিল। অন্ধকারে আমি কিছু বুঝতে পারলুম না কিন্তু গুলি বর্ষণ হঠাৎ থেমে গেল কেন? আমার মনে হয় ওরা রাশিয়ান নয়। ওরা রাশিয়ান ফ্রন্ট থেকে পালিয়ে আসা

জার্মান সৈনিক। ভুল করে গুলি চালিয়ে ছিল। কিন্তু যখন তাদের সন্দেহ হয় যে ওখানে রাশিয়ান থাকবার সম্ভাবনা নেই তখন গুলি বর্ষণ বন্ধ করে।

আমরা তুষারাবৃত সাইলেসিয়ার বিশাল প্রান্তর দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছি। সারা রাত্রি ধরে আমরা হাঁটলুম। প্রায় পনেরো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করলুম।

সকাল হল। পথে যেতে যেতে দেখতে পাচ্ছি করুণ দৃশ্য। আমাদের আগে এক বা একাধিক বন্দীদল গেছে। মাঝে মাঝে স্ত্রী বা পুরুষের রক্তাক্ত মৃতদেহ। মনে হয় যারা ক্লান্তিতে অবশ হয়ে হাঁটতে পারছিল না এস এস গার্ডরা সেইখানেই তাদের গুলি করে হত্যা করেছে। কে তাদের ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যাবে? কিলো-মিটারের পর কিলোমিটার আমরা এরকম অনেক মৃতদেহ দেখলুম। আমাদের মধ্যেও অনেককে তাহলে এইভাবে মৃত্যু বরণ করতে হবে। আমাদের সকলেরই মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

ভাবতে না ভাবতে আমরা দুটো গুলির আওয়াজ শুনলুম। আমাদের দলে দু'জন ক্লান্তিতে একেবারে ভেঙে পড়েছিল, আর হাঁটতে পারছিল না। রাস্তার ওপরে শুয়ে পড়েছিল। তাদের আর তোলা যাচ্ছিল না। তারা বোধহয় তখন চির শান্তির কোলেই আশ্রয় চাইছিল। এস এস গার্ডরা দুটি গুলি খরচ করে তাদের মুক্তি দিল।

আমাদের কনভয়ে এই প্রথম গুলি চলল। আরও কত চলবে, আরও কত মরবে কে জানে? ক্রমাগত গুলি করে করে গার্ডদের যেন নেশা হয়ে গেছে। গুলি করতে না পারলে ওদের হাত নিশপিশ করে।

দুপুর নাগাদ আমরা প্লেসাউ নামে এক জায়গায় পৌঁছলুম। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। যাদের সঙ্গে খাবার ছিল তারা কিছু খেল। আমি একটা সিগারেট ধরালুম।

আবার হাঁটা শুরু। এক সপ্তাহ, দু সপ্তাহ, হেঁটেই চলেছি তুষার

ভেঙে। কুড়ি দিন ধরে হেঁটে একটা স্টেশনে পৌঁছলুম। দুশো কিলোমিটার পার হয়েছি এই ক'দিনে। রাত্রিটা আমাদের খোলা আকাশের নীচেই কাটাতে হল।

পরদিন সকালে একটা হিসেব নেওয়া হল। বিরকেনাউ থেকে আমরা তিন হাজারের ওপর নরনারী যাত্রা করেছিলুম। হাজার খানেক লোক পথে কমে গেছে। বেশির ভাগই মরেছে গার্ডদের গুলিতে, রোগেও মরেছে, কেউ আবার পথে কোথাও আশ্রয় পেয়ে গেছে।

এই তিন সপ্তাহ বলতে গেলে আহার জোটে নি, বেশির ভাগ রাত্রি কাটাতে হয়েছে ফাঁকা জায়গায়। কি করে মানুষ বাঁচবে?

লাইনে একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়েছিল। একসময়ে আমাদের উঠতে বলা হল। আমরা সকলে গাদাগাদি করে উঠে পড়লুম। বাইরে ঠাণ্ডা। গাড়ির ভেতরে ঢুকে আরাম পেলুম।

বসে আছি তো বসেই আছি। ট্রেন ছাড়ল শেষ রাত্রে। এর পর পাঁচটা দিন আমাদের ট্রেনেই কাটল।

মাউথাউসেন স্টেশনে ট্রেন থামল। এখানে পাহাড়ের ওপর আছে বিখ্যাত মাউথাউসেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। বিরাট ক্যাম্প। ক্যাম্পটা ইহুদি বন্দীদের দিয়েই বেশ পাকাপোক্ত ভাবে তৈরি করানো হয়েছে।

হিটলার স্থির করেছিল যে যখন সারা ইউরোপ জয় করা হয়ে যাবে এবং তখনও যে সব ইহুদি বেঁচে থাকবে তাদের প্রত্যেককে ধরে এনে এই ক্যাম্পে বন্দী করা হবে এবং একে একে হত্যা করা হবে। এই ভাবে ইউরোপ থেকে ইহুদি নিশ্চিহ্ন করা হবে।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বোধহয় টের পেয়েছিল যে আমাদের আর একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পথ থেকে প্রায় শ' পাঁচেক পালিয়ে গিয়েছিল।

এখানে আমরা দশ দিন ছিলুম। আরও অনেককে আনা হল।

প্রায় সাত হাজার হবে। আমাদের কোনো কাজ করতে হয় নি। খাবারও খারাপ নয়। রুটি, মারগারিন, কফি। পরিমাণও ভাল।

সবচেয়ে আরাম পেলুম গরম জলে স্নান করতে পেয়ে। স্নানের পর বেশ তাজা বোধ হল।

হঠাৎ একদিন একজন জেনারেল এসে হাজির। সে পর পর অনেককে লাইনে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল :

অসউইজ ক্যাম্পে যারা যারা ছিলে তারা এক পা এগিয়ে দাঁড়াও।

শুনে আমি ঘাবড়ে গেলুম। অসউইজ নামে নরকের অত্যাচার যাতে বাইরে প্রকাশ না হয়ে পড়ে সেইজন্যে জেনারেল আমাদের হত্যা করবে বোধহয়।

আমার কপাল বোধ হয় ভাল। আমি ছাড়া অসউইজ ক্যাম্পের আর কেউ ছিল না, হয় তারা পথে মারা গেছে কিংবা পালিয়ে গেছে।

আমি চুপ করে নিজের লাইনে দাঁড়িয়ে রইলুম। বুক ঢিব ঢিব করছে। জেনারেল আরও কয়েকবার হাঁক দিল। কেউ সাড়া দিল না। বেঁচে গেলুম। মরতে মরতে আর একবার বেঁচে গেলুম।

সেই দিন রাত্রেই মাউথাউসেন ক্যামপের সকলকে, সেই সাত হাজার ইহুদিকে রেল স্টেশনে নিয়ে যেয়ে একটা ট্রেনে বোঝাই করা হল। ট্রেনে যদিও ভীষণ ঠাসাঠাসি হয়েছিল তবুও কোনোরকমে সহ্য করা গেল কারণ এবার আমাদের ট্রেনের মধ্যে বাক্সবন্দী হয়ে বেশিক্ষণ থাকতে হয় নি।

এবার যে কনসেনট্রেশন ক্যামপে আমাদের আনা হল সেটার নাম মেলক। এটাও একটা পাহাড়ের ওপরে, পাহাড়ের গা দিয়ে ড্যানিউব নদী কলকল করে বয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। চারদিকে লম্বা লম্বা পাইন গাছ। ভালই লাগছিল।

এই ক্যামপে আমাদের কয়েদির জামা পরিয়ে দেওয়া হল এখানেও আমাদের কোনো কাজ দেওয়া হয় নি। কাজ না দিলে কি

হবে, আহার এখানকার মোটেই ভাল নয়। আমরা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ি।

দেখতে দেখতে দু'মাস কেটে গেল। এপ্রিল মাস এসে গেল। বসন্ত এবার আগেই এসে গেল। পাইন গাছে কচি কচি সবুজ পাতা রোদ পড়ে চিক চিক করে, ড্যানিউবের তীর থেকে তুষার কবেই বিদায় নিয়েছে, এখন সেখানে সবুজ ঘাসের কারপেট।

কবে মুক্তি পাব, সেই আশায় দিন গুনছি।

থার্ড রাইখের হাজার বছর রাজত্বের স্বপ্ন ধুলিসাৎ। ক্যাম্প থেকে দেখতে পাই পরাজিত ও বিধ্বস্ত নাৎসী সৈন্যরা পালাচ্ছে। শহরের মানুষেরা নৌকো করে ড্যানিউব নদী দিয়ে গ্রামে সরে যাচ্ছে।

১৯৪৫ সালের ৭ এপ্রিল। সেদিন রাত্রে আমাদের ক্যাম্পে আলো জ্বলল না। অন্ধকারেই ক্যাম্প খালি করা হল। আবার যাত্রা। ক্যাম্পের সাত হাজার বন্দীকে সাত দিন ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। কেন যে আমাদের এক ক্যাম্প থেকে আর এক ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা আমরা বুঝতে পারছি না।

এবার এবেনসি কনসেনট্রেশন ক্যামপ। মাউথাউসেন থেকে যতজন যাত্রা করেছিল ততজন এবেনসি ক্যামপে পৌঁছতে পারে নি। মাউথাউসেনের তুলনায় এই ক্যামপের অবস্থা শোচনীয়। ব্যারাক-গুলি অতিশয় নোংরা। তার ওপর আমাদের কোয়ারানটাইনে রাখা হল। মতলব কি? আমাদের কি খতম করা হবে নাকি? বাবা তাই হক, খতমই করে দিক, আর পারছি না। সহ্যের সীমা কবে শেষ হয়ে গেছে। এখানে যদিও গ্যাস চেম্বার নেই, মেসিন গান তো আছে।

কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা বুঝতে পারলুম থার্ড রাইখের আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে। তবুও আমরা বেঁচে রইলুম।

৫মে তারিখে এবেনসি কনসেনট্রেশন ক্যামপের একটা ওয়াচ টাওয়ার থেকে মস্ত বড় একটা সাদা পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হল।

তাহলে সব শেষ। এবার কি তাহলে মুক্তি! উল্লাসে দু' হাত তুলে যে চিৎকার করব সে ক্ষমতাও আমাদের বিলুপ্ত।

বেলা তখন ন'টা। সারা ক্যামপ রোদে ঝলমল করছে। আমাদের ক্যামপের গার্ডরা তাদের সমস্ত রাইফেল, মেসিনগান এবং অন্য যে সব অস্ত্র ছিল তা সব স্তূপাকার করে একদিকে নামিয়ে রেখেছে।

একখানা অ্যামেরিকান লাইট ট্যাংক ক্যামপে ঢুকল। তিনজন সৈনিক ট্যাংক থেকে নেমে এল। ভারপ্রাপ্ত জার্মান অফিসারের কাছ থেকে অ্যামেরিকানরা এবেনসি ক্যামপের ভার নিল।

এবার আমরা মুক্ত।

আমার মেয়ে? আমার স্ত্রী? তারা এখন কোথায়? যদি বেঁচে থাকে তা হলে নিশ্চয় বাড়ি ফিরবে। আমার আগে কি তারা বাড়ি ফিরতে পেরেছে! ভাবতে ভাবতে বাড়ির পথে যাত্রা করি। দুধারে খালি ধ্বংস। আমার বাড়িখানা কি আছে? নাকি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে? খুব ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরছি। এই এক বছরের মধ্যে আমার মনের জোর খুব কমে গেছে। কোমল অনুভূতিগুলি বিলুপ্ত।

আর এই এক বছরে কি না দেখেছি, কি না সহ্য করেছি! ওরা আমাকে দিয়ে যে সব পরীক্ষা করিয়েছে সেগুলি তাদের সন্তানদের দেখাবার জন্যে মিউজিয়মে রেখে দিয়েছে। তাদের বলবে ইহুদিরা ছিল ঘৃণ্য, তাদের দৈহিক গঠন ও আভ্যন্তরীন ক্রিয়া প্রক্রিয়া ছিল জার্মান জাতির তুলনায় নিকৃষ্ট ও দুর্বল। জার্মান জাতির সঙ্গে এমন নিম্নশ্রেণীর মানুষের বাঁচবার অধিকার নেই। এইসব নমুনা দেখলেই তোমরা বুঝবে তারা সিংহের তুলনায় ইঁদুর বিশেষ। জার্মানরা হল সুপার রেস। আর সেই সুপার রেসের আজ এই পরিণতি!

দেহটাকে কোনোরকমে টানতে টানতে বাড়ি এসে পৌঁছলুম।

বাড়িখানা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। বাগান আগাছায় পূর্ণ। সৌন্দর্য ম্লান। তবুও নিজের বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলতা অর্ধেক দূর হয়ে গেল।

আমার একটা কুকুর ছিল। ডিংকি। কোথায় ছিল জানি না, কোথা থেকে ছুটে এল তাও জানি না। আঃ আমি এখন নিশ্চিন্ত।

ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য ফিরে আসতে লাগল, সেই সঙ্গে মনের জোর। শূন্য বাড়িতে একা। একদিন বিকেলে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে আছি। বাইরের দরজায় কে নক করল। পায়ের কাছে ডিংকি বসেছিল। সে সহসা লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটে গিয়ে দরজা আঁচড়াতে লাগল আর সেই সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে ডাক।

ডিংকির আচরণ দেখেই বুঝলুম কারা এসেছে। দরজা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে ও তার মা আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে নীরবে অশ্রু মোচন করতে লাগল।

বর্বর নাৎসীরা এই যে ষাট লক্ষ ইহুদি নরনারী ও শিশুকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে গ্যাস চেম্বারে বা অন্যভাবে হত্যা করল, নিঃসন্দেহে এটি হল বর্তমান শতাব্দীর মর্মান্তিক ঘটনা তো বটেই, একটি ঘৃণিত ও জঘন্যতম অপরাধ যার কোনো তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। হত্যার আগে তাদের ওপর অকথ্য নিপীড়ন ও অত্যাচারের কথা ভুললে চলবে না।

সুখের বিষয় যে ইউরোপের সকলেই নাৎসী নয়। তাই জার্মানি এবং নাৎসী অধিকৃত ইউরোপে ইহুদিদের অনেক খৃশ্চান বন্ধু ছিল যারা নিজের প্রাণ দিয়ে হাজার হাজার ইহুদির প্রাণ রক্ষা করেছে।

প্রথমে ডেনমার্কের কথাই ধরা যাক। প্রথম প্রতিরোধ ডেনমার্কেই আরম্ভ হয়। বড় রকমের প্রথম বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল নাৎসীদের এই ডেনমার্কে।

১৯৪৩ সালের কথা। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। বছর আরম্ভ হতেই নাৎসীরা ইহুদিদের জোর করে বন্দী করতে আরম্ভ করল। তাদের ঘর থেকে টেনে জেলে বা কনসেনট্রেশন ক্যামপে ভরতে লাগল। হতভাগ্য বন্দীদের হত্যার উদ্দেশ্যে অন্যত্র পাঠাবার জন্যে জাহাজ তৈরি রাখা হল। যেখানে গ্যাস চেম্বার বা পাইকারি হারে দাহ করবার শ্মশান আছে সেখানে পাঠান হবে আর কি!

ইহুদি হলেও তারা তো ডেনমার্কেরই মানুষ। তাই একদল দুঃসাহসিক খৃশ্চান ডেন বন্দীদের ছিনিয়ে নেবার জন্যে সমস্ত বন্দীশালা আক্রমণ করে ইহুদিদের মুক্ত করল। আর একদল ডেন ছোট জাহাজ সংগ্রহ করে নাৎসীদের বড় জাহাজ ডুবিয়ে দিল। সে এক আত্মত্যাগ ও দুঃসাহসের অতুলনীয় কাহিনী।

তারপর সেই ইহুদিদের তারা সুইডেনে পাঠিয়ে দিল। সুইডেনও বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তাদের আশ্রয় দিয়েছিল। ডেনমার্কের প্রায় সমস্ত ইহুদিকেই সুইডেন আশ্রয় দিয়েছিল।

ইটালিতে মুসোলিনির পতনের পর যে নতুন সরকার গঠিত হয়েছিল সেই সরকার ইহুদিদের জার্মানি ও পোল্যাণ্ডে চালান দিতে আরম্ভ করেছিল। জার্মানি ও পোল্যাণ্ডে পাঠান মানে গ্যাস-চেম্বারে পাঠান।

কিন্তু ফ্যাসিস্ট-নাৎসী বিরোধী ইটালিয়ানরা তখন জেগে উঠেছে। এই ইহুদি বিতাড়ন বন্ধ করতে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করল। দলে দলে ইহুদিদের তারা সুইটজারল্যাণ্ড অথবা অন্য নিরাপদ দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করল। মহামান্য পোপ তাঁর ভ্যাটিক্যানে হাজার হাজার ইহুদিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বিদেশগামী ইচ্ছুক ইহুদিদের ভ্যাটিক্যান পাসপোর্ট দেবার ব্যবস্থা করে দিল। অন্ততঃ ৫০,০০০ ইহুদির প্রাণ রক্ষা হয়েছিল।

ফ্রান্স তো ইহুদিদের রক্ষার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল। নাৎসী অধিকৃত ফ্রান্স থেকে সমস্ত ইহুদিকে ধরে আনবার জন্যে স্বয়ং

আইখম্যান ফ্রান্সে গিয়েছিল এবং যাতে একটিও ইহুদি না পালাতে পারে তার ব্যবস্থা করে, একজন কড়া লোকের ওপর ভার দিয়ে তবে সে ফ্রান্স থেকে ফিরে এসেছিল। তবুও ফরাসিরা নাৎসীদের ধোঁকা দিয়ে হাজার হাজার ইহুদিকে ফ্রান্সের অনধিকৃত অংশে পাঠাতে পেরেছিল।

ফ্রান্সে তখন ছিল তিন লক্ষ ইহুদি। ফরাসিরা এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ইহুদির প্রাণরক্ষা করতে পেরেছিল। পনেরো হাজার শিশুকে উদ্ধার করে খৃষ্টান পরিবারে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বহু ইহুদি শিশুকে গির্জা বা মঠেও রাখা হয়েছিল।

ফ্রান্সের মতো বেলজিয়মেও প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে উঠেছিল। নাৎসীরা বেলজিয়ম দখল করার পর হাজার হাজার ইহুদি তারা বিদেশে পাচার করতে পেরেছিল।

হল্যাণ্ডে তো সাংঘাতিক ব্যাপার হয়েছিল। হল্যাণ্ড দখল করার সঙ্গে সঙ্গে নাৎসীরা ইহুদিদের ওপর উৎপীড়ন শুরু করল। ১৯৪১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে অ্যামস্টার্ডামে ইহুদি গ্রেফতার অভিযান আরম্ভ হল। বেলজিয়ানরা বিশেষ করে ডক কর্মীরা দলে দলে এগিয়ে এসে বাধা দিতে আরম্ভ করল। দু সপ্তাহ ধরে বেলজিয়ানরা নানাভাবে বাধা দিল। ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে জার্মান নাৎসীরা ১১০০ যুবক ইহুদি গ্রেফতার করল। রাস্তায় রাস্তায় নাৎসী সৈনিকদের সঙ্গে বেলজিয়ান নাগরিকদের সঙ্গে লড়াই চলছে। নাৎসী ট্যাংকের সঙ্গে কতক্ষণ আর যুঝবে?

তবুও তারা সংগ্রাম পরিত্যাগ করল না। তিন দিন পর বেলজিয়ানরা সারা বেলজিয়মে সর্বাত্মক বন্‌ধের ডাক দিল। সমস্ত কল-কারখানা, যানবাহন, দোকানপাট বন্ধ। 'আমাদের ইহুদি ভাইদের মুক্তি দাও' ব্যানার হাতে দলে দলে বেলজিয়ান রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। নাৎসীরা মেসিনগান থেকে গুলি চালাতে আরম্ভ করল। সাড়ে তিন হাজার বেলজিয়ান নরনারী নাৎসী বুলেটে প্রাণ দিল।

চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি এবং অন্যত্র ইহুদিদের বাঁচাবার জন্যে খৃশ্চান জনসাধারণ প্রতিরোধবাহিনী গড়ে তুলেছিল। সর্বক্ষেত্রে তারা হয় তো সফল হয় নি, বিফলতার ওজনই ভারি কিন্তু তারা নীরবে এই অত্যাচার মেনে নেয় নি।

আগে একজন ডাক্তার ফেলিকস কারসটেনের নাম উল্লেখ করেছি। এই ডাক্তারকে বলা হত 'দি ম্যান উইথ দি মিরাকিউলাস হ্যাণ্ডস্' কারণ তার হাতে তথা আঙ্গুলে বোধহয় জাদু ছিল। হিমলার তার পেটে অজ্ঞাত যন্ত্রণায় ভুগত। সেই যন্ত্রণা সময়ে সময়ে এত তীব্র হত যে মরফিয়া ইন্‌জেকশনেও কাজ হত না। কোনো চিকিৎসাতেও ফল হয় নি।

কিন্তু ডাক্তার কারসটেন যখনই হিমলারের পেটে ম্যাসাজ করে দিত তখনই হিমলার আরাম পেত, ব্যথা যেন উবে যেত। সেই ডাক্তার হিমলারের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। হিমলারের একটা অন্ততঃ গুণ ছিল। ডাক্তারের ঋণ সে সর্বদা স্বীকার করত। ডাক্তারকে তার অদেয় কিছুই ছিল না।

চিকিৎসা করার জন্যে ডাক্তার একটিও পয়সা ফি দাবি করে নি কিন্তু সুযোগ বুঝে মাঝে মাঝে দাবি করত হতভাগ্য ইহুদিদের জীবন। এইভাবে ডাক্তার কারসটেন হাজার হাজার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

আর একজন ছিল। সে ডাক্তার নয়, ডক্টর রুডলফ কাস্টনার। অসউইজ ক্যামপের ডাক্তার মিকলস নিজলির মতো কাস্টনারও ছিল হাঙ্গেরির নাগরিক, ইহুদি। পেশায় সাংবাদিক। জিঅনিস্ট আন্দোলন অর্থাৎ ইহুদিদের নিজস্ব বাসভূমির দাবির জন্য আন্দোলনকারীদের একটি খবরের কাগজের কাস্টনার ছিল সম্পাদক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে থাকতেই কাস্‌টনারের একটা ধারণা

জন্মেছিল যে হিটলার ইউরোপে ইহুদিদের বাস করতে দেবে না। হয় তাদের বিতাড়িত করবে কিংবা নির্মূল করবে।

হাঙ্গেরি ছিল নাৎসী জার্মানির তাঁবেদার এবং মিউনিক চুক্তির পর হিটলার তাকে ট্রান্সালভানিয়া এবং রোমানিয়া থেকে কিছু অংশ পাইয়ে দিয়েছিল। হাঙ্গেরি সরকার সেইজন্য বোধহয় অনুমান করত যে হাঙ্গেরির ইহুদিদের গায়ে হিটলার হাত দেবে না। কাস্‌টনার কিন্তু হিটলারকে বিশ্বাস করে নি।

খবরের কাগজ সম্পাদনার জন্যে কাস্‌টনার রাজধানী বুডাপেস্টের বাইরে থাকত। তার খবরের কাগজখানি একদিন বন্ধ করে দেওয়া হল। সে বুডাপেস্টে ফিরে এল। ইউরোপে যুদ্ধ তখন বেধে গেছে।

বুডাপেস্টে জিঅনিজম আন্দোলনের একটা কেন্দ্র ছিল কিন্তু তার কর্মতৎপরতা ছিল ক্ষীণ। এই কেন্দ্রে একদিন কাস্‌টনারের সঙ্গে ব্র্যাণ্ড দম্পতির দেখা হল। স্বামীর নাম জুল ব্র্যাণ্ড, স্ত্রীর নাম হানসি ব্রাণ্ড।

পোল্যাণ্ড থেকে তখন দলে দলে ইহুদি সীমান্ত অতিক্রম করে হাঙ্গেরিতে প্রবেশ করছে। নাৎসীরা পোল্যাণ্ডে যে কি পরিমাণে ইহুদিদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে তারই সব মর্মান্তিক কাহিনী শোনা যেতে লাগল।

পোল্যাণ্ডের এই সব রিফিউজিরা তো হাঙ্গেরিতে নিরাপদ নয়। তখন ডঃ কাস্‌টনার এবং ব্র্যাণ্ড দম্পতি, এই তিনজনে মিলে একটা 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলরোড' গঠন করল, উদ্দেশ্য হতভাগ্য ইহুদিদের হাঙ্গেরির বাইরে কোনো নিরাপদ অঞ্চলে পাচার করা।

ইতিমধ্যে অন্যান্য দেশে আইখম্যান নির্বিচারে ইহুদি নিধন চালিয়ে যাচ্ছে। দু' বছরের মধ্যে এরা তিনজন মিলে দশ হাজার ইহুদিকে নিরাপদ স্থানে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল এবং অনাথ ইহুদি শিশুদের জন্যে হ্যানসি ব্র্যাণ্ড বারোটি অনাথ আশ্রম স্থাপন করেছিল।

শেষ পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল হল। হাঙ্গেরির পালা এসে

গেল। ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে আইখম্যান স্বয়ং বুডাপেস্টে এসে হাজির। মূর্তিমান বিভীষিকা, শয়তানের অনুচর। ম্যাজেস্টিক হোটেলে আড্ডা গাড়ল।

রাশিয়ানরা তো এগিয়ে আসছে। তারা এসে পড়ে তো ইহুদিদের রক্ষা করবে। যাতে এই শুভ কাজটি রাশিয়া করতে না পারে তাই তার আগে ইহুদিদের শেষ করে ফেলতে হবে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, এবং যত বেশি সম্ভব ইহুদিদের হাঙ্গেরি থেকে সমূলে উৎপাটিত করে নিয়ে যেতে হবে যেখানে আছে গ্যাস-চেম্বার, যে গ্যাস-চেম্বারে একসঙ্গে কয়েক হাজার হতভাগ্যের ভবলীলা সাঙ্গ করা যায়।

একটা কথা ডঃ কাস্‌টনারের কানে উঠল। আইখম্যান নাকি ঘুষ নিচ্ছে। মোটা টাকার বিনিময়ে ইহুদিদের ছেড়ে দিচ্ছে। ব্যাপক হারে নয়, গোপনে দু'চারজন করে। এটা তার নিজস্ব রোজগার। এই অর্থ তার পকেটে যাচ্ছে।

হাঙ্গেরিতে ইহুদি গ্রেফতার শুরু হয়ে গেছে। তার ধনসম্পত্তি লুটপাট করে নিয়ে প্রথমে কনসেনট্রেশন ক্যামপে রাখা হচ্ছে, তারপর ট্রেনে গরু-ছাগলের মতো বোঝাই করে অসউইজ ক্যামপে বা বিরকেনাউয়ের মহাশ্মসানে পাঠান হচ্ছে।

এই কাজের জন্যে আইখম্যান একজন লোক এনেছিল। তার নাম ব্যারন ডিটার ফন ভিসলিসেনি, সংক্ষেপে ব্যারন। হিটলারের আত্মীয়।

কাস্‌টনার এই ব্যারনের সঙ্গে যোগাযোগ করে বেশ কিছু টাকা সোনা ও জহরতের বিনিময়ে কুড়ি হাজার ইহুদি চালান বন্ধ রেখেছিল যদিও তাদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত।

এদিকে হাঙ্গেরিতে কনসেনট্রেশন ক্যামপে এক লক্ষ ইহুদি জমে গেছে। এদের ভবিষ্যত স্থির করবার জন্যে হিমলারের সঙ্গে পরামর্শের নিমিত্ত আইখম্যান বারলিন গেল।

হিমলারও বুঝেছিল জার্মানির খেলা শেষ হয়ে গেছে। এখন ইহুদিরা মরলেই বা কি বাঁচলেই বা কি। এই সুযোগে যদি কিছু অর্থ সঞ্চয় করে নেওয়া যায়, মন্দ কি? তাকেও তো পালাতে হবে, তারও তো ভবিষ্যত আছে। হিমলার সম্ভবতঃ আইখম্যানকে সেই পরামর্শ দিয়েছিল, যা পার ওদের কাছ থেকে আদায় করে যাও।

বুডাপেষ্ট থেকে ফিরে জুল ব্র্যাণ্ডকে আইখম্যান তলব করল। ব্র্যাণ্ড তো বিস্মিত। ইহুদিদের যম ইহুদির সঙ্গে কথা বলবে?

ব্র্যাণ্ড তো ম্যাজেস্টিক হোটেলে গেল। আইখম্যান তাকে ডেকে পাঠাল। ব্র্যাণ্ড তো একটা খালি চেয়ারে বসতে যাচ্ছিল। আইখম্যান চিৎকার করে উঠল

বসতে যাচ্ছ কি? জান আমি কে?

আইখম্যানের হাতের কাছেই রয়েছে একটা ঝকঝকে রিভলভার। সেই অস্ত্র দেখে ব্র্যাণ্ড আর বসতে সাহস করল না। দাঁড়িয়েই রইল।

শোনো, আইখম্যান চিৎকার করে উঠল, ব্লাড ফর মনি, মনি ফর ব্লাড, তোমরা কি চাও?

ব্র্যাণ্ড চুপ করে রইল। কি জবাব দেবে? আইখম্যান আগে প্রস্তাব করুক। আইখম্যান প্রস্তাব করল

আমি তোমাদের কাছে এক লাখ জু বিক্রি করতে পারি। কি দাম দেবে?

বলুন কি দাম চাই

দিতে পারবে? আচ্ছা এবার বোসো, এক লাখ জু কুকুরের বদলে আমার চাই দশ হাজার মিলিটারি ট্রাক। তোমাদের নগদ টাকাও তো নেই, দশ হাজার ট্রাকও নেই, তাহলে কোথা থেকে দেবে?

দশ হাজার ট্রাক দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

জানি, কি করে দিতে পারবে তাও আমি বলে দিচ্ছি।

ব্র্যাণ্ড মনে মনে শংকিত হল। এই উন্মাদ শয়তান আবার কি বলে বসে। কোথায় পাওয়া যাবে দশ হাজার মিলিটারি ট্রাক?

শোনো, কি যেন নাম তোমার? ব্র্যাণ্ড, শোনো, টারকি তো নিরপেক্ষ দেশ। টারকিতে তোমাদের লোক পাঠাও, সেখানে অ্যামেরিকান আর ইংরেজদের বল আমাদের দশ হাজার মিলিটারি ট্রাক দিতে। আমি এক লাখ জু ডগ ছেড়ে দোব। আর একটা কথা ওদের বলে দিয়ো যে এই দশ হাজার ট্রাক আমরা ওদের বিরুদ্ধে ওয়েস্টার্ণ ফ্রণ্টে ব্যবহার করব না, ব্যবহার করব ইস্টার্ণ ফ্রণ্টে, রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে। রাশিয়ানদের তো ওরাও পছন্দ করে না, এখন বন্ধু হলে কি হবে? এই হল আমার প্রস্তাব। রাজি থাক তো বল।

কিন্তু আপনি যদি এক লক্ষ মৃতপ্রায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ব্যক্তি দেন তাহলে?

সে প্ল্যান পরে হবে, তুমি ওদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাদের ফলাফল জানাও।

জুল ব্র্যাণ্ড কয়েকদিনের মধ্যেই একটা জার্মান প্লেনে ইস্তামবুল গিয়ে পৌঁছল। পশ্চিমি শক্তির সঙ্গে সে পরামর্শ আরম্ভ করল, কিন্তু কোনো কারণে তাকে গ্রেপ্তার করে ইজিপ্টে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এ খবর কাস্টনার জানতে পারল।

আইখম্যান চুপ করে নেই। প্রতিদিন সে বারো হাজার ইহুদি পাঠাচ্ছে অসউইজ ক্যাম্পে। কাস্টনার একদিন অনুরোধ করতে গেল চালান বন্ধ রাখতে।

আইখম্যান তার মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, তোমাকে অসউইজ ক্যাম্পে পাঠাব। তোমার বন্ধুর দেরি হচ্ছে কেন? কি মতলব তোমাদের?

অসউইজে যাবার জন্যে আমি পা বাড়িয়েই আছি, এটুকুও সাহস না থাকলে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারতুম না। কিন্তু তোমাদের সদিচ্ছা আছে তার কিছু পরিচয় দাও।

ঠিক আছে। ছ'শো জু ডগ ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি আমাকে ছ'শো জনের লিস্ট দাও।

এ প্রস্তাবে কাস্টনার বা মিসেস ব্র্যাণ্ড রাজি হতে পারে না। কোন ছ'শো জনের নাম তারা দেবে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে? ওদিকে কিন্তু মিত্রশক্তি জার্মান প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করছে। চেষ্টা করছে প্রাণপণ।

এদিকে কাস্টনার আরও একজন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে সম্মত হল। তার নাম কুর্ট বেচার। নাৎসী সরকারের ইকনমিক সেকশনের প্রধান। হিমলারের ওপর তার প্রভাব আছে।

বেচারকে কাস্টনার বলল যে যুদ্ধের পর যদি বেচারের বিচার হয় এবং সে যদি বেঁচে থাকে তাহলে সে বেচারের অনুকূলে সাক্ষ্য দেবে।

হিমলারের সঙ্গে কথা বলতে বেচার রাজি হল এবং হিমলারের সঙ্গে কথা বলল। হিমলার বলল এক একটি ইহুদি প্রাণের বিনিময়ে তাদের হাজার ডলার চাই।

হাজার ডলার দেবার মতো ক্ষমতা এখনও অনেক জু-এর ছিল। এইভাবে বেশ কিছু জু বিনিময় করা গেল। সে আর কত, হাজার খানেক। এদিকে পাঁচ লাখ জু হাঙ্গেরি থেকে চালান হয়ে গেছে।

মিত্রশক্তি ব্র্যাণ্ডকে বন্দী করে রাখলেও তারা জার্মানির প্রস্তাব অবহেলা করে নি। ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে জানান হল যে জার্মানি দশ হাজার ট্রাক চেয়েছে, বিনিময়ে এক লক্ষ ইহুদিকে তারা মুক্তি দেবে। রুজভেল্ট টারকিতে একজন বিশেষ দূত পাঠালেন বিষয়টা খুঁটিয়ে দেখবার জন্যে।

মিত্রশক্তি এবং সুইডেনের রাজা, মহামান্য পোপ এবং ইণ্টার-ন্যাশানাল রেডক্রস হাঙ্গেরিকে সাবধান করে দিল যে ইহুদি নিধনের জন্যে ভবিষ্যতে তাদের দায়ী করা হবে। আর যেন ইহুদি নিধন বা বিতাড়ন না করা হয়।

বেচার মারফত হিমলারকে কাস্টনার জানান যে নাৎসীরা কিছু

ইহুদিকে মুক্তি না দিলে মিত্রশক্তি তাদের প্রস্তাবে গুরুত্ব দেবে না। হিমলার রাজি হল। ইতিমধ্যে বোধহয়, হিমলারের ওপর আমাদের পূর্ব পরিচিত ডাক্তার কারসটেন প্রভাব বিস্তার করেছিল।

যাইহক হিমলার এক ট্রেন ভর্তি ইহুদি নিরপেক্ষ দেশ সুইটজারল্যাণ্ডে পাঠাতে রাজি হল এবং নির্দেশও দিল। তবে কিছু সময় লাগবে।

এদিকে আইখম্যান আরও কিছু ইহুদি অসউইঞ্জে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে আর ঠিক সেই সময়ে কাস্‌টনারকে ব্যারন খবর দিল আইখম্যান ও তার দলবলকে বারলিনে ডেকে পাঠান হয়েছে। নিঃসন্দেহে সুখবর।

আইখম্যান যাবার আগে কাস্‌টনারকে শাসিয়ে গেল; ভেবো না, আমি আবার ফিরে আসছি।

হিমলার তার কথা রেখেছিল। এক ট্রেন ভর্তি ইহুদি সে পাঠিয়ে ছিল। অবিশ্যি মুক্তিপণ বাবদ পাঁচ লক্ষ ডলার দিতে হয়েছিল। টাকাটা সুইটজারল্যাণ্ডের ব্যাংকে জমা দিয়ে কাস্‌টনার বারলিনে গিয়েছিল। সেখান থেকে সুখবর নিয়ে ফিরে এল যে সমস্ত গ্যাস-চেম্বার নষ্ট করে ফেলার আদেশ জারি করেছে হিমলার।

তবুও নাৎসীদের বিশ্বাস নেই। গ্যাস-চেম্বার বন্ধ করার আদেশ জারি হলেও ইহুদিদের ওপর নির্যাতন থামে নি! পাশের রাজ্য রোমানিয়াতে কিন্তু ইহুদিদের অবস্থা মোটামুটি ভাল। কাস্‌টনার ও মিসেস ব্র্যাণ্ড যতবেশি পারল ইহুদি রোমানিয়াতে পাচার করতে লাগল।

আইখম্যান সত্যিই একদিন হাঙ্গেরিতে ফিরে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পুরনো খেলা আরম্ভ করল। হিমলার আর ডাক্তার কারসটেনের সঙ্গে মানবতার নামে সেই ঐতিহাসিক চুক্তি তখন স্বাক্ষরিত হয়েছে, আর একজনও ইহুদি হত্যা করা হবে না।

আইখম্যান সেই চুক্তি মানতে রাজি নয়। সে তার পৈশাচিক

কাজ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু তাকে আর বেশিদিন কাজ চালাতে হল না, রাশিয়ানরা দ্রুত এগিয়ে আসছে। সে একদিন পালাল।

বেচার তখনও হাঙ্গেরিতে ছিল। বোঝাই গেল যুদ্ধ শেষ হতে আর কয়েকটা দিন বাকি। মিত্রশক্তির সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলছে। বেচারকে সঙ্গে নিয়ে কাস্‌টনার বিভিন্ন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ঘুরতে লাগল এবং ইহুদি বন্দীদের যাতে মিত্র শক্তির হাতে জীবিত অবস্থায় সমর্পণ করা হয় তার ব্যবস্থা করল।

তারপর একদিন যুদ্ধ শেষ হল। নতুন রাষ্ট্র ইজরেল জন্ম নিল। ডঃ ফেলিক্স কাস্‌টনার ইজরেলের নাগরিক হল। জেরুজালেমে সে কমার্স বিভাগের রেডিও ব্রডকাস্‌টার এবং পাবলিক রিলেশনস অফিসারের চাকরি পেল।

ইজরেলের একটি রাজনীতিক দল কিন্তু কাস্‌টনারের ওপর বিরূপ। তাদের অভিযোগ কাস্‌টনার কেন শয়তান খাইখম্যানের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। কাস্‌টনারের উচিত ছিল মুক্তি ফৌজের সঙ্গে কাজ করা। তারপর সে বিচারের সময় বেচারের অনুকূলে কেন সাক্ষ্য দিয়েছিল? হাজার হলেও বেচার তো নাৎসী অতএব ইহুদিদের পরম শত্রু। ইতিমধ্যে জুল ব্র্যাণ্ড মুক্তি পেয়ে ইজরেলে এসেছে। কাস্‌টনারের সে ছিল একজন দৃঢ় সমর্থক। প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কাস্‌টনার বা ব্র্যাণ্ড বোঝাতে পারল না যে ইহুদিদের কল্যাণের জন্যে ফেলিক্স কাস্‌টনার কি করেছে।

একদিন কাস্‌টনার বাড়ি ফিরছে। এমন সময় একটি যুবক তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল।

তোমার নাম কি কাস্‌টনার?

হ্যাঁ।

দ্বিতীয় কথা না বলে যুবক রিভলভার বার করে কাস্‌টনারকে গুলি করল। সেই গুলির ফলে আহত কাস্‌টনারের এগারো দিন

পরে মৃত্যু হল। আততায়ী যুবক ও তার দু'জন সহযোগী ধরা পড়েছিল। তাদের সাজা হয়েছিল। যাবজ্জীবন কারাবাস।

সৎ কাজ করেও কাস্‌টনারকে প্রাণ দিতে হল।

আইখম্যান কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালাতে পারে নি। সে ধরা পড়েছিল। কীভাবে যে সে ধরা পড়ল সে এক আশ্চর্য কাহিনী।

আইখম্যানের নতুন করে পরিচয় দেবার আর দরকার নেই। আইখম্যান হল শতাব্দীর এক নম্বর জল্লাদ। ষাট লক্ষ ইহুদি হত্যার জন্য সে দায়ী। সে যে নিজে পাপী। অত্যন্ত নিষ্ঠুর কাজ করেছে, এসব সে হাড়ে হাড়ে জানত আর এও জানত যে ইহুদিরা যদি তাকে একবার ধরতে পারে তাহলে তাকে ছিঁড়ে খাবে। তাই যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই বিশাল এই পৃথিবীতে সে কোথায় মিলিয়ে গেল।

দীর্ঘদিন কেউ তার সন্ধান পায় নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ধরা পড়েছিল এবং বড় কথা হল যে সে নিজে যেমন বহু নির্দোষ ব্যক্তিকে বিনা নোটিসে সহসা নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছিল, তার বেলায় তা করা হয় নি। তার বিচার করা হয়েছিল। স্বপক্ষ সমর্থন করবার জন্যে তাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হবার পর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

আইখম্যান বলেছিল তার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করা হয়েছে সে সব অভিযোগ থেকে সে মুক্ত। সে সৈনিকের মতো সেনাপতিদের আদেশ পালন করেছে মাত্র।

নির্লজ্জের মতো বলেছিল যে সে যা করেছে তার জন্যে তার অনুশোচনা নেই। আদেশ পালন করবার সময় সে অবশ্যই জাতীয় ভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বলেই সে হিটলার ও হিমলারের হুকুম তামিল করতে পেরেছিল। তবুও বিচারের সময় প্রমাণিত হয়েছিল

যে অনেক ক্ষেত্রে সে নিজের ইচ্ছামতো নরহত্যা করেছে, সব ক্ষেত্রে কর্তাদের আদেশ পালন করে নি।

এইবার প্রশ্ন, আইখম্যান ধরা পড়ল কি করে?

একটি মাত্র লোকের নিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস ও একাগ্রতার জন্যে আইখম্যানকে ধরা সম্ভব হয়েছিল। ইহুদিদের ঐ এক নম্বর শত্রুকে ধরবার জন্যে সেই লোকটি দীর্ঘ ষোলো বছর পরিশ্রম করেছে। তার বন্ধুরা, সহকারীরা এমন কি কর্তৃপক্ষ নিরাশ হলেও সে নিরাশ হয় নি। সে ঠিক করেছিল শেষ পর্যন্ত সে দেখবে। এমন নিষ্ঠুর আর জঘন্য অপরাধ করে একটা লোক নিষ্কৃতি পাবে? তা হতেই পারে না। শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

সেই লোকটির নাম হল টুভিয়া ফ্রেডম্যান। ইজরেল সিক্রেট সারভিসের একজন নীরব কর্মী। আইখম্যানকে ধরবার জন্যে টুভিয়া গুপ্তচরের যে নিপুণ জাল বিস্তার করেছিল যুদ্ধোত্তর জগতে তার তুলনা বিরল।

টুভিয়ার মেজাজ খুব ঠাণ্ডা, সহজে উত্তেজিত হয় না, নীরব ও নিরলস কর্মী। ছক বেঁধে কাজ করতে ভালবাসে। ইজরেলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেন গেঁরার সঙ্গে চেহারার খুব মিল আছে। এক সময়ে তার মাথাভর্তি চুল ছিল কিন্তু পোল্যাণ্ডে কনসেনট্রেশন ক্যামপে থাকবার সময় বেচারীর মাথার সব চুল উঠে যায়। বেন গেঁরার সঙ্গে এইটুকু তার চেহারার তফাৎ।

১৯৪৫ সালের কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে। ইহুদিদের নিজস্ব দেশ ইজরেল তখনও জন্ম নেয় নি। ইহুদি জিয়নিস্টরা ইজরেল গঠন করতে বদ্ধপরিকর। নাৎসীদের দ্বারা উৎপীড়িত দশ হাজার জার্মানকে তারা প্যালেস্টাইনে গোপনে পাচার করে 'হাগানা' নামে গুপ্ত সৈন্যদল তৈরি করেছে আর সেই সঙ্গে গঠন

করেছে সুশিক্ষিত এক গুপ্তচর বাহিনী। ইউরোপের বিভিন্ন শহরে এই গুপ্তচর বাহিনীর শাখা অফিস ছিল। ইউরোপে এই সব শাখা অফিসের প্রধান ছিল অ্যাশার বেন নাথান। বয়স অল্প হলেও যোগ্য লোকের হাতেই ভার ন্যস্ত ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শেষ হতে না হতেই বেন নাথান একদিন তার বিশ্বস্ত সহকারী টুভিয়া ফ্রেডম্যানকে ডেকে বলল—

তোমাকে একটা জরুরী কাজের ভার দেওয়া হচ্ছে। এই মুহূর্ত থেকে তোমার একমাত্র কাজ হল সেই পশুটা যার নাম আইখম্যান তাকে খুঁজে বার করা। সে নিশ্চয়ই মরে নি। কোথাও লুকিয়ে আছে। সে যে শুধু একজন যুদ্ধ অপরাধী মাত্র তা নয়, সে চেয়েছিল ইউরোপ থেকে ইহুদিদের অবলুপ্ত করতে। সে আমাদের লক্ষ লক্ষ বাপ মা, ভাই বোন ও ছেলেমেয়েদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। আমরা তাকে চাই।

আইখম্যানের একখানাও ছবি নেই যেটি অবলম্বন করে টুভিয়া কাজ আরম্ভ করতে পারে। ডিটেকটিভদের যে সব গুণ থাকা উচিত অন্ততঃ ডিটেকটিভ উপন্যাসে যেমন পড়া যায় তেমন কোনো গুণ টুভিয়ার নেই তবুও গোয়েন্দাগিরি করতে হবে। আইখম্যানের চেহারার ভাসা ভাসা বর্ণনা সম্বল করে টুভিয়া কাজ আরম্ভ করল।

টুভিয়া একের পর এক রিফিউজি ক্যামপ ঘুরে আইখম্যান সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু বৃথা। কেউ বিশেষ কিছু বলতে পারল না। মনে রাখবার মতো বা লক্ষ্য করবার মতো কোনো বিশেষত্বই আইখম্যানের চেহারায় নেই।

টুভিয়া তখন বিভিন্ন দেশের সি. আই. ডি দফতরের সঙ্গে এবং যুদ্ধশেষে জার্মানিতে যে নাৎসী-বিরোধী মুক্তিফৌজ গড়ে উঠেছিল তাদের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে লাগল।

না, আইখম্যানের খবর কেউ জানে না। সে মরেছে কি বেঁচে আছে তাও কেউ জানে না। তবে টুভিয়াকে সাহায্য করতে সকলেই

রাজী হল। আইখম্যানের কোনোরকম সন্ধান পেলে তারা টুভিয়াকে জানাবে, এই আশ্বাস সকলেই দিল।

টুভিয়া প্রায় নিরাশ। কেউ কোনো খবর দিতে পারছে না। বদমাইশটা ফাঁকি দিয়ে পালাবে? সামান্য একটু আশার আলো দেখা গেল।

অস্ট্রিয়া থেকে ভিয়েনার পুলিস দফতর একটা খবর দিল। উত্তর অস্ট্রিয়ার নির্জন এক গ্রামে একজন মহিলা একটি কটেজে বাস করেন। সেই মহিলা হল আইখম্যানের পত্নী? মানে ফ্রাউ আইখম্যান? এ তো দারুণ খবর!

টুভিয়ার অনুরোধে অস্ট্রিয়া পুলিস সেই কটেজের ওপর নজর রাখবার ব্যবস্থা করল। ফ্রাউ আইখম্যান ছিল কটেজের ভাড়াটে। মালিক একজন ছিল। সে অস্ট্রিয়ান নয়, জার্মান। ভাড়া আদায় এবং সম্পত্তি তদারক করতে মাঝে মাঝে আসত। খোঁজ নিয়ে জানা গেল লোকটা নাৎসী পার্টির মেম্বার ছিল এবং মোটেই ভাল লোক নয়। জার্মানির নতুন নেতাদের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে লোকটা লুকিয়ে আছে এই গ্রামে।

লোকটা স্বয়ং আইখম্যান নয় তো? হয় তো প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে মুখের চেহারা পাল্টেছে। লোকটা কিন্তু বুঝতে পেরেছিল যে তার কটেজের ওপর নজর রাখা হয়েছে। নজর যে আসলে রাখা হচ্ছে ফ্রাউ আইখম্যানের ওপর তা সে প্রথমে বুঝতে পারে নি। অবিশ্যি পুলিসের চোখে সে সন্দেহমুক্ত নয়।

সন্দেহজনকভাবে একটা মোটরে কিছু মাল বোঝাই করবার সময় পুলিস তাকে আটক করে। লোকটা হঠাৎ পিস্তল বার করে গুলি চালাতে উদ্যত হয়। পুলিসও তৎপর হয়। কয়েকটা গুলি বিনিময়ও হয়। লোকটা মারা গেল। কিন্তু সে আইখম্যান নয়।

জার্মানি তখন মার্কিন সৈন্যে ও মিলিটারি পুলিসে ভর্তি। মার্কিন সূত্র থেকে সামান্য একটু খবর পাওয়া গেল। জার্মানিতে কোনো

একটা জেলখানায় আইখম্যানকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক রাখা হয়েছিল। তখন তাকে চেনা যায় নি। এখন মনে হচ্ছে সেই লোকটাই আইখম্যান।

সেই আটক বন্দী বলেছিল সে নাৎসীই নয়, সাধারণ একজন জার্মান নাগরিক। নাৎসীরা তাকে জোর করে ইউনিফরম পরিয়ে হাতে নাৎসী ব্যাজ স্বস্তিক চিহ্ন লাগিয়ে দিয়েছিল। ইহুদি হত্যা গ্যাস-চেম্বার বা কনসেনট্রেশন ক্যামপের বিষয় সে কিছুই জানে না।

জেলখানায় তাকে একটা ফরম ভর্তি করতে দেওয়া হয়েছিল তাতে সে নিজের নাম বা নিজের বিষয় কিছুই লেখে নি। কিন্তু সন্দেহ হয়েছিল যে লোকটা সত্যি কথা বলছে না। একে জেরা করতে হবে। কিন্তু সে সুযোগ আর হল না। সে এবং আরও চারজন জার্মান অ্যামেরিকান সৈনিকের ইউনিফরম পরে জেলখানা থেকে পালিয়েছিল। এ হল ১৯৪৬ সালের কথা।

কিন্তু তদন্ত করে জানা গিয়েছিল যে আইখম্যান সন্দেহে ব্যক্তিটি অটো হেমিনজার এই নামের জাল কাগজপত্র দেখিয়ে উত্তর জার্মানিতে পালিয়ে গিয়েছিল। এই নামেই উত্তর জার্মানির অরণ্য অঞ্চল কলেনবাখ লাম্বার ক্যামপে একটা চাকরি পেয়েছিল। তখন জার্মানিতে সহজে চাকরি পাওয়া যেত। পুরুষ তো প্রায় সবাই যুদ্ধে মরে গেছে, এইজন্যে জার্মানিকে বিদেশ থেকেও প্রচুর মানুষ আমদানি করতে হয়েছিল।

যুদ্ধের পর নাৎসী সরকারের যে সব কাগজপত্র আটক করা হয়েছিল সেই সব ঘাঁটতে ঘাঁটতে টুভিয়ার হাতে একখানা কাগজ এল। কাগজখানা একটা আবেদন পত্র। ১৯৩৪ সালের ৩০ অক্টোবর তারিখে অ্যাডলফ আইখম্যান বিবাহ করার অনুমতি চাইছে। তার মতে পাত্রীটি শুদ্ধ আর্যকন্যা, কুমারি, নাম ভেরোনিকা লিবেল।

১৯৩৫ সালের ২৩ জানুয়ারি তারিখে বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হল। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ মেয়েটিকে নগ্ন করে তার শরীরের বিশেষ

বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাপ নিয়েছে। ত্বক, চুল ও নখ রাসায়নিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করেছে। রক্ত পরীক্ষাও বাদ যায় নি। বংশতালিকাও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। হ্যাঁ, মেয়েটি খাঁটি আর্য। বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হল। ১৭ মে তারিখে আইখম্যানের সঙ্গে ভেরোনিকার বিয়ে হয়েছিল।

আইখম্যানের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। ভেরোনিকারও নয়। কেউ বলে ওরা আছে ইজিপ্টে, কেউ বলে সাউথ অ্যামেরিকায়। সারা পৃথিবী হয় তো খুঁজে বেড়াতে হবে। দরকার হলে টুভিয়া তাই করবে কিন্তু হতাশ হয়ে ছেড়ে দেবে না।

চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ শহরে আইখম্যানের একজন অন্তরঙ্গ সহযোগী ধরা পড়ল। এ হল আমাদের পূর্ব পরিচিত সেই ব্যারন, যার পুরো নাম ব্যারন ডিটার ফন ভিসলিসেনি, হিমলারের আত্মীয়। সে বলল, বাধ্য হয়ে তাকে ঐ শয়তানটার হুকুম তামিল করতে হয়েছে নইলে বদমাইশটাকে ও ঘৃণা করে। যতদিন সে ঐ হাড় বজ্জাতটার সঙ্গে কাজ করেছে ততদিন সে প্রাণভয়ে ভীত ছিল, কে জানে কখন কি অপরাধ করে ফেলবে আর আইখম্যান সঙ্গে সঙ্গে তার গর্দান নেবে। তবে ব্যারন আশ্বাস দিল যে টুভিয়ার সঙ্গে সে সহযোগিতা করবে। সে চায় আইখম্যানের কঠোরতম সাজা হক, সে যেন ধরা পড়ে।

ব্যারন সামান্য একটা সূত্র দিল। বলল, একবার খুঁজে দেখতে পার। আইখম্যানের একজন রক্ষিতা ছিল। তার নাম সে জানে না তবে এইটুকু জানে যে ডপল গ্রামে তার কিসের যেন একটা কারখানা আছে।

যে কোনো সূত্রই হক না কেন ছাড়া হবে না। ডপল গ্রামটা হল অস্ট্রিয়াতে। আইখম্যানের সেই নাম-না-জানা রক্ষিতার সন্ধানে টুভিয়া একজন লোক পাঠাল।

যে লোকটিকে টুভিয়া নির্বাচন করল সে নানা গুণের অধিকারী,

কয়েকটা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে, সুদর্শন, সৌজন্যবোধ ও অভিনয়ে দক্ষতা আছে, যথেষ্ট তৎপর ও চৌকস। দেখে মনে হবে ভূতপূর্ব কোনো নাৎসী অফিসার বুঝি। নাম ম্যানস।

ডপল গ্রামে এসে ম্যানস পুলিস সূত্রে খবর নিয়ে জানল খবরটা একেবারে ফাঁকা নয়। এই গ্রামে আইখম্যানের সত্যি একজন মেয়েমানুষ ছিল তবে সে এখন ডপল-এ নেই। বাড অসে নামে স্বাস্থ্যাবাসে হাওয়া বদলাতে গেছে। আর দেরি করা নয়। ম্যানস ছুটল বাড অসে-তে। সেখানকার সবচেয়ে সেরা হোটেলে উঠল, নেদারল্যাণ্ডের অধিবাসী বলে নিজের পরিচয় দিল। তবে প্রচার করতে লাগল যে আসলে সে জার্মান। ভূতপূর্ব নাৎসী নেতাদের যে সমস্ত স্ত্রী বাড অসে-তে আশ্রয় নিয়েছে তাদের প্রতি তার সহানুভূতির অন্ত নেই। আহা বেচারীরা! স্বামীর দোষে আজ তারা কত কষ্টই না ভোগ করছে!

একদিন একটা উষ্ণ প্রস্রবণের কুণ্ডের ধারে এক মহিলার সঙ্গে ম্যানসের পরিচয় হল। মহিলা সারা অঙ্গে কাদার প্রলেপ লাগিয়ে মাড-বাথ নিচ্ছিল। ম্যানস অনুমান করেছিল এই মহিলাই বুঝি আইখম্যানের রক্ষিতা কিন্তু পরে যখন জানতে পারল যে এই মহিলাই হল ফ্রাউ আইখম্যান যার নাম ভেরোনিকা তখন তো সে হতভম্ব।

ম্যানস ভীষণ ধূর্ত। সে তৎক্ষণাৎ ভেরোনিকার সঙ্গে আলাপ জমাল না বরঞ্চ আলাপ জমাল ভেরোনিকার এক সুন্দরী বিধবা বান্ধবীর সঙ্গে। এই সুন্দরী মহিলার সঙ্গেই ম্যানস একদিন ভেরোনিকার ড্রইং রুমে প্রবেশ করল।

ভেরোনিকার সঙ্গে ম্যানসের পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হল। ম্যানস প্রায়ই আসে, চা খায়, কফি খায়, বিয়ার খায়, তাস খেলে, বাচ্চাদের সঙ্গে গল্প করে, খেলা করে। কোনো কোনো রাত্রে ডিনার খেয়ে হোটেলে ফেরে। ম্যানসকে ভেরোনিকার খুব পছন্দ হয়েছিল বন্ধু

হিসেবে। ভেরোনিকা বলত, তুমি আমার ভাইয়ের কথা মনে করিয়ে দাও। আহা, বেচারী যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে।

আইখম্যানের একখানা ছবি বার করবার জন্যে ম্যানস অনেক চেষ্টা করল, এমনকি বক্স ক্যামেরাতেও তোলা আইখম্যানের বাড়িতে কোথাও একখানা ফটো নেই।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে ম্যানস যখন বেড়াতে যেত তখন সে কথাচ্ছলে তাদের বাবার কথা জিজ্ঞাসা করত। ছেলেমেয়েরা সত্যিই সরকারী ইস্তাহারের বাইরে তাদের বাবার কোনো খবর জানত না। তারা জানত যে যুদ্ধ শেষ হবার মুখে তাদের বাবা মারা গেছে।

ম্যানস কথা প্রসঙ্গে হিটলার, হিমলার, হেস, গোয়েরিং, গয়বেলস, বোরম্যান, আইখম্যান ইত্যাদির কথা বলত। সে লক্ষ্য করত যে আইখম্যানের প্রসঙ্গ উঠলে ভেরোনিকা যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠত কিন্তু বিরক্ত হত না বা কথা চাপা দেবার চেষ্টা করত না। তবে প্রসঙ্গ কোনোদিনই এত দূর এগোত না যার দ্বারা আইখম্যানের গতিবিধির কোনো সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। যাইহক ম্যানস প্রতিদিনই টুভিয়ার কাছে রিপোর্ট পাঠাত।

ভেরোনিকার একজন পুরুষের দরকার ছিল যে তার ও তার বাচ্চাদের দেখাশোনা করতে পারবে। ম্যানস আপাততঃ সেই স্থান পূরণ করেছিল। ম্যানস যে একজন গুপ্তচর যার ওপর ভার পড়েছে আইখম্যানের বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহের, এমন সন্দেহ ভেরোনিকার মনে ক্ষণিকের জন্যেও উদয় হয় নি। ভেরোনিকা যে আইখম্যানের পত্নী এই সংবাদ যে ম্যানসের জানা আছে তাও সে ভেরোনিকা বা তার বাচ্চাদের কোনদিন জানতে দেয় নি, আভাসে ইঙ্গিতেও নয়।

মাড-বাথ নিয়েও ভেরোনিকা দেহে তেমন শক্তি পাচ্ছে না। সংসারে খাটাখাটনির জন্যে একজন মেড দরকার। বিশ্বাসী ও কর্মপটু কোনো মেডের সন্ধান কি ম্যানসের জানা আছে? ভেরোনিকা জিজ্ঞাসা করল।

ম্যানস বলল, থাকতে পারে, খোঁজ নিয়ে একজন বিশ্বাসী মেড সে পাঠিয়ে দেবে। নিশ্চয় চেষ্টা করবে।

কয়েক দিন পরে সঙ্গে চিঠি দিয়ে ম্যানস একজন যুবতী মেড পাঠাল। মেয়েটি আসলে টুভিয়ার দলের লোক। ভোরোনিকা তাকে ভর্তি করে নিল। কাজ করতে করতে পরিবারের প্রতিটি কথা মেড কান পেতে শুনত, প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য করত। সুযোগ পেলেই চিঠিপত্তর পড়ত। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সামান্যতম সূত্রও পাওয়া গেল না যার ওপর ভিত্তি করে আইখম্যানের কোনো সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। ম্যানস এবং টুভিয়াও ভাবল যে ভেরোনিকার সঙ্গে আইখম্যানেরও কোনো যোগাযোগ নেই এবং ভেরোনিকাও আইখম্যানের সন্ধান জানে না।

ম্যানস আপাততঃ স্থির করল এখানে সময় নষ্ট করা বৃথা। ইতিমধ্যে আইখম্যানের সেই প্রণয়িনীর সন্ধান করা যাক। ডপল-এ গিয়ে ভাল করে খোঁজ করা যাক।

ডপল গ্রামে এসে ম্যানস ধৈর্য ধরে খুঁজে খুঁজে সেই রমণীকে বার করল। বলতে গেলে সে একটা টোপ ফেলেছিল। গ্রামে গিয়ে সে প্রচার করল যে সে হল কার্লের (আইখম্যানের আর এক নাম) ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর ভাই। সেই বন্ধুর কাছে কার্লের বেশ কিছু টাকা গচ্ছিত আছে। কার্ল যদি বেঁচে থাকে তাহলে তার এখন টাকার খুব দরকার নিশ্চয়। তাই সে ও তার ভাই কার্লকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

গ্রামের একজন খবর দিল যে ফ্রাউ মিস্টেলবাখের সঙ্গে আইখম্যানের একদা ঘনিষ্ঠতা ছিল। তুমি তার সঙ্গে দেখা করছ না কেন?

তার কাছ থেকে বাড়িটা চিনে নিয়ে ম্যানস একদিন ফ্রাউ মিস্টেলবাখের দরজায় নক করল। মহিলা নিজেই দরজা খুলে দিল। বয়স হয়েছে ঠিকই কিন্তু মহিলার রূপ আছে, যৌবনও ত্যাগ করে নি।

ম্যানস নিজের একটা কাল্পনিক পরিচয় দিল এবং গচ্ছিত অর্থের কথাও বলল। সব শুনে ঘাড় দুলিয়ে, মাথা নেড়ে মহিলা বলল কার্লের কোনো খবরই সে জানে না। সে কি আজকের কথা। কার্ল তখনও আইখম্যান হয় নি, সে এক যুগ আগে, দু'জনে কিছু প্রেম হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তারপর আরও কত পুরুষ এল গেল। তাদের ভীড়ে সে কার্লকে ভুলেই গিয়েছিল এই এখন আবার সেই সব পুরনো কথা মনে পড়ছে।

ম্যানসকে বিয়ার খাইয়ে ফ্রাউ মিস্টেলবাখ বলল : তা তুমি একটা কাজ করতে পার, লিনজ টাউনে কার্লের বাবা থাকে, বুড়ো টাউন ছেড়ে কোথাও যায় নি। তুমি বরঞ্চ বুড়োর কাছে খোঁজ নাও, বুড়ো কিছু জানলেও জানতে পারে।

অতএব ডপল গ্রাম থেকে লিনজ টাউন। আইখম্যানের বাবাকে খুঁজে বার করতে দেরি হল না। শহরে সে বিখ্যাত ব্যক্তি। কিন্তু ম্যানস যেই না তার ছেলে আইখম্যানের ঠিকানা জানতে চেয়েছে অমনি বৃদ্ধ যেন ক্ষেপে উঠল। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল : গেট আউট, আই সে গেট আউট অফ হিয়ার, কে তোমাকে বলেছে যে সে আমার ছেলে ?

ম্যানস কিছু উপহার আর কিছু ভাল অ্যামেরিকান সিগারেট নিয়ে আবার ডপল-এ ফিরে এসে ফ্রাউ মিস্টেলবাখের সঙ্গে গল্প জমাল। ফ্রাউ মিস্টেলবাখ একদিন একটা পুরনো জীর্ণ অ্যালবাম বার করে পাতার পর পাতা উলটে ম্যানসকে ফটো দেখাতে লাগল। এই দেখ ম্যানস কার্লের একখানা ছবি

ম্যানস চমকে উঠল কিন্তু অহেতুক কোনো আগ্রহ প্রকাশ করল না। ছবিখানা অত্যন্ত মূল্যবান দলিল। এই ফটো আইখম্যানকে সনাক্ত করবে। ছবিখানা চাইলে ফ্রাউ-এর মনে সন্দেহ হতে পারে। অথচ এই ছবি তাদের চাই।

নিজের আসল পরিচয় জানিয়ে স্থানীয় পুলিসের সঙ্গে ম্যানস

পরামর্শ করল। পুলিস তাকে সাহায্য করতে রাজি হল। অ্যালবামটি কোন ড্রয়ারে আছে সে খবরটা ম্যানস পুলিসকে জানিয়ে দিল।

পরদিনই পুলিস মিস্‌টেলবাখের বাড়িতে হানা দিল। পুলিস খবর পেয়েছে যে ফ্রাউ মিস্‌টেলবাখ বেআইনীভাবে প্রচুর রেশন কুপন জমিয়ে রেখেছে। তারা বাড়ি সার্চ করবে।

কর। সার্চ কর। বাড়তি কুপন একখানাও নেই! [illegible]।

পুলিসের উদ্দেশ্য তো ভিন্ন। তারা সার্চ করবার [illegible] সেই অ্যালবামখানা বার করে আইখম্যানের ফটোখানা খুলে নিয়ে গোপনে ম্যানসকে দিল।

ম্যানসের এই কর্মদক্ষতায় ফ্রেডম্যান টুভিয়া চমৎকৃত।

কার্ল অ্যাডলফ আইখম্যান কিন্তু তখনও জার্মানিতেই ছিল। একদা যার ভয়ে নাৎসী কবলিত ইউরোপের সমস্ত ইহুদি সম্প্রদায় ভয়ে কম্পমান ছিল, সেই লোকটাই এখন প্রাণভয়ে ভীত হয়ে উত্তর জার্মানির অরণ্যে সামান্য একজন কাঠুরের কাজ করছিল অবিশ্যি ভিন্ন নামে ও পরিচয়ে।

যে কম্পানির অধীনে সে চাকরি করছিল সেই কম্পানি একদিন ফেল মারল অতএব চাকরি থেকে আইখম্যান বরখাস্ত হল। সহকর্মীদের বলল এবার সে ভাগ্যান্বেষণে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া যাবে।

টুভিয়ার গুপ্তচরেরা পরে উত্তর জার্মানির অরণ্যের এবং আইখম্যানের এই সব সহকর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। তারা তো শুনে স্তম্ভিত। এই লোকটাই সেই! যার ভয়ে জু-এরা কাঁপত! কিন্তু তার ব্যবহার তো বেশ ভালই ছিল, ভদ্র, কঠিন পরিশ্রমী, সময়ে সময়ে নিজের রেশন থেকে সহকর্মীদের ভাগ দিত। লোকটা একা থাকতে ভালবাসত তবে মাঝে মাঝে একজন স্ত্রীলোক তার কাছে আসত। কে সেই স্ত্রীলোক? তারা তা জানে না তবে গণিকা বোধহয়। তাদের কাছে আইখম্যান বলেছিল যে যুদ্ধের সময়ে

বোমাবর্ষণে তার পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সেও যদি মরত তাহলে ল্যাঠা চুকে যেত।

আইখম্যান বলেছিল বটে যে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া যাবে কিন্তু সে মোটেই উত্তর দিকে যায় নি। ইহুদিদের যেমন নিজের দেশ বলে কিছু ছিল না, এ দেশ আর সে দেশে তাদের ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, আইখম্যানেরও এইবার থেকে শুরু হল ভ্রাম্যমাণ জীবন তবে ঠিক ইহুদিদের মতো নয় বরঞ্চ পলাতক আসামীর মতো।

আইখম্যান আর তার দু'জন নাৎসী বন্ধু যারা তার সঙ্গে সেই অরণ্যে কাঠুরের কাজ করত তারা লুকিয়ে অস্ট্রিয়ার বর্ডার পার হয়ে ইটালিতে ঢুকে তিন জনে তিন পথ ধরল। উপকূল ধরে যেতে যেতে আইখম্যান প্রাচীন শহর জেনোয়াতে ঢুকল।

জেনোয়াতে এক গির্জায় সে পাদ্রী সাহেবদের কাছে চাকরী করতে লাগল। সৎ ও নিয়মনিষ্ঠ জীবন যাপন করত কিন্তু পলাতক আসামীর মন ভয়ে সর্বদাই শংকিত। জেনোয়াতে সে আর থাকতে সাহস করল না।

অনেক পরিশ্রম করে তিল তিল করে টুভিয়ার গুপ্তচরেরা আইখম্যানের আত্মগোপনের যে বিবরণ সংগ্রহ করেছিল তা থেকে জানা যায় যে রিকার্ডো ক্লিমেণ্ট নাম নিয়ে সে ভ্যাটিকান থেকে পাসপোর্ট সংগ্রহ করে। সেই পাসপোর্টের বলে সে এসে উঠল সিরিয়াতে।

অনেক নাৎসী নেতা তখন নাম ভাঁড়িয়ে সিরিয়াতে আশ্রয় নিচ্ছিল। তাদের দলে আইখম্যান ভিড়ে গেল। আরবরা তখন ইহুদি-প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলছিল। তারা চেষ্টা করছিল ইহুদিরা যাতে নিজেদের রাজ্য ইজরেল গঠন করতে না পারে। আরবরা তাই ভূতপূর্ব জার্মান সৈনিকদের সাহায্যে আরব সৈন্যদের আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করে তুলছিল। আইখম্যানেরও এই সংগঠন কাজে একটা ভাল চাকরি জুটে গেল।

আইখম্যান নিজের স্ত্রীর কাছেও চিঠি লিখত না, ঠিকানা তো জানায়ই নি। খুব সাবধানে থাকত। সযত্নে নিজের পরিচয় রক্ষা করত। যে সব মুদ্রাদোষ ছিল সেগুলিও সযত্নে পরিহার করেছিল। জুইশ ও জার্মান খবরের কাগজ পড়ত নিয়মিত। এই সব কাগজে মাঝে মাঝে আইখম্যান ও মার্টিন বোরম্যানের খবর ছাপা হত। তারা নাকি এখনও বেঁচে আছে। তাদের নাকি কোথাও কোথাও দেখা যায়।

আরবরা বাধা দেওয়া সত্ত্বেও একদিন ইজরেল জন্মলাভ করল। এই সময়ে আইখম্যানের চাকরিটাও গেল। সে বেকার হয়ে পড়ল। পুরনো বন্ধুদের সন্ধানে একদিন স্পেনে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু স্পেনে কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল না। সে আবার জেনোয়াতে ফিরে এল। পরিচিত পাদ্রীদের সাহায্যে ১৯৫০ সালের ১৪ জুন তারিখে আর্জেন্টিনা যাবার ভিসা যোগাড় করল। একমাস পরে "এস এস গিয়োভানা সি" জাহাজ চেপে আর্জেন্টিনায় হাজির হল।

আইখম্যান এখন থেকে তার স্ত্রীকে সরাসরি চিঠি না লিখলেও কোনো একটা সূত্র মারফত যোগাযোগ রক্ষা করতে আরম্ভ করল। তার পত্নী অবশ্য এই সংবাদ অস্বীকার করেছিল। বলেছিল চেক নাগরিকেরা তার স্বামীকে হত্যা করেছে। দু'জন সাক্ষীর নামও ভেরোনিকা লিখিয়েছিল। এই মর্মে ভেরোনিকা একটি লিখিত বিবৃতি দিয়েছিল। সেই বিবৃতি খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল।

এই বিবৃতি দ্বারা ভেরোনিকা বলতে চেয়েছিল যে তার স্বামী তো নিহত অতএব তোমরা বৃথাই খুঁজে বেড়াচ্ছ।

ভেরোনিকার সেই বিবৃতি সকলে বিশ্বাস করেছিল একমাত্র টুভিয়া ছাড়া। এজন্যে অনেকে টুভিয়াকে ঠাট্টাও করত। ইজরেল সিক্রেট সারভিস ঠিক করল আইখম্যানের অনুসন্ধান কাজে তারা টাকা খরচ করবে না, লোকটা বেঁচে থাকলে এতদিনে খবর পাওয়া যেত।

টুভিয়া বিশ্বাস করতে রাজী নয়। সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করত যে লোকটা নিশ্চয় বেঁচে আছে। পোল্যাণ্ডে টুভিয়ার চোখের সামনে তার বাবা-মাকে নাৎসীরা টেনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড কি টুভিয়া ভুলতে পারে?

ঠিক আছে। সরকার সাহায্য না করুক সে নিজেই টাকার যোগাড় করবে। বড়লোকদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে ইহুদিদের এক নম্বর শত্রুকে খুঁজে বার করবে। ধনী ব্যক্তি এবং বন্ধুরা সত্যই টাকা নিয়ে এগিয়ে এল। ইজরেলে ধনীর অভাব নেই। সৎ কাজে অর্থ ব্যয় করতে তারা প্রস্তুত।

আইখম্যান তখন দক্ষিণ অ্যামেরিকায়, আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আয়ার্স নগরীতে। সেখানে সে তার নতুন পরিচয় পেশ করল। নাম রিকার্ডো ক্লিমেণ্ট, অবিবাহিত, অস্ট্রিয়া ও ইটালির বর্ডার শহর বোজেন-এ তার জন্মস্থান।

এতদিন পরে আইখম্যান নিজেকে নিরাপদ মনে করল। ভাবল, যাক নিশ্চিন্ত মনে বাস করবার একটা জায়গা পাওয়া গেল। বাকি জীবনটা এইখানেই কাটিয়ে দেবে। সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ করবে। চুয়াল্লিশ বছর বয়স হয়েছে, এমন কিছু বেশি নয়। তার দেশে অনেকে এই বয়সে প্রথম বিয়ে করে সংসার পাতে।

একে একে দিন কাটে, আইখম্যানেরও সাহস বাড়ে, নিরাপত্তার আশ্বাসও বাড়ে কিন্তু জানতে পারে না 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে'। শমন ধীরে ধীরে লঘু পায়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

এমন সাবধানী ও ধূর্ত আইখম্যানও ভুল করল যখন সে স্থির করল এবার সে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে তার কাছে লুকিয়ে নিয়ে আসবে তারপর বাকি জীবনটা আনন্দে কাটাবে।

১৯৫১ সালের ক্রিসমাসের ঠিক আগে ভেরোনিকা একখানা চিঠি পেল। চিঠির নিচে স্বাক্ষর আংকল রিকার্ডো, মাথায় ঠিকানা, টুকুমান প্রভিন্স, আর্জেন্টিনা। ভেরোনিকা বুঝল কে চিঠি লিখেছে। হাতের লেখা লুকোবার চেষ্টা করলেও ভেরোনিকার চোখ এড়াতে পারে নি।

এতদিন পরে চিঠি পেয়ে ভেরোনিকাও খুশি। ছেলেদের বলল তারা সকলে শীঘ্রই আর্জেন্টিনা যাবে, সেখানে তাদের আংকল রিকার্ডো আছে, ভারি ভাল লোক, কাপরি কম্পানির এঞ্জিনিয়ার। তার বাড়িতে আমরা কিছুদিন থাকব।

নিজের ও ছেলেমেয়ের 'লিবেল' উপাধিতে পাসপোর্ট করিয়ে একদিন ভেরোনিকা ইউরোপ থেকে কেটে পড়ল। টুভিয়ার লোকেরা টের পেল না কারণ তার ওপর তখন আর কড়া নজর রাখা হচ্ছিল না।

১৯৫২ সালের জুলাই মাসে কোনো এক তারিখে ছেলেমেয়েকে নিয়ে ভেরোনিকা বুয়েনস আয়ার্সে জাহাজ থেকে নামল। তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে আইখম্যান বন্দরে আসে নি। ইচ্ছে করেই আসে নি। বন্দরে পুলিসের নজর থাকতে পারে।

ব্যুয়েনস আয়ার্সে একটা সাধারণ হোটেলে ওরা কয়েকটি দিন কাটিয়ে একদিন ট্রেনে চেপে বসল। গ্রামাঞ্চলে ছোট একটি স্টেশনে তারা ট্রেন থেকে নামল। আংকল রিকার্ডো স্টেশনে এসেছিল। সাত বছর পরে স্বামী-স্ত্রীতে মিলন হল। ছেলেদের সঙ্গে ভেরোনিকা পরিচয় করিয়ে দিল। এই তোমাদের আংকল রিকার্ডো।

আইখম্যান আরও একটা ভুল করল। পাঁচজনের পরিবার কিন্তু নামের উপাধি তিন রকম। সে নিজে হল ক্লিমেন্ট, স্ত্রীর পরিচয় দিল সিস্টার বলে, নাম ভেরোনিকা লিবেল আর তিন ছেলে হল ক্লাউস, হর্স্ট আর ডিটার আইখম্যান। কিছুদিন বেশ আনন্দে কাটল।

এদিকে টুভিয়া মাথা খুঁড়ে মরছে। শয়তানটা কি উবে গেল? তার এত পরিশ্রম, চেষ্টা, অর্থ ব্যয় সবই কি ব্যর্থ হবে। কোনো খবর নেই। গুপ্তচরেরা পাঁচ জায়গা থেকে রিপোর্ট করল, নিউ ইয়র্ক, ভিয়েনা, টেল আভিভ, সিরিয়া এবং বুয়েনস আয়ার্স থেকে রিপোর্ট করল যে তারা একই তারিখে আইখম্যানকে দেখেছে।

একজন লোক একই সঙ্গে পৃথিবীর পাঁচটি বিভিন্ন স্থানে একই তারিখে থাকতে পারে না। অনেক বিচার বিবেচনা করে টুভিয়া স্থির করল যে আর্জেন্টিনার ওপর জোর দেওয়া যাক। অনেক নাৎসী ওখানে আশ্রয় নিয়েছে।

আর্জেন্টিনায় তার যতগুলি গুপ্তচর ছিল তাদের সকলকে সেই মতো নির্দেশ দিল। এর মধ্যে আইখম্যানের ফটো পাওয়া গিয়েছিল। ফটো এবং বর্তমান চেহারার সম্ভাব্য পরিবর্তনের বিবরণ দিয়ে টুভিয়া নির্দেশ পাঠাল।

আইখম্যান চাকরি করছিল কাপরি ড্যাম প্রজেক্টে। কাপরি ড্যাম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চাকরি গেল। কাজ জানা থাকলে আর্জেন্টিনায় চাকরি পাওয়া যায়। ব্যবসায়ের সুযোগও আছে। আইখম্যান বিভিন্ন জায়গায় চাকরি বা ছোটখাটো ব্যবসা করতে লাগল কিন্তু কোনোটা স্থায়ী হল না।

সঞ্চিত অর্থভাণ্ডার ফুরিয়ে আসছে। আইখম্যান চঞ্চল হয়ে উঠল। কাজের সন্ধানে ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া, চিলি ও পেরুতে ঘুরে বেড়াল কিন্তু পাকাপাকি ব্যবস্থা কোথাও করে উঠতে পারল না।

দক্ষিণ অ্যামেরিকায় টুভিয়া ফ্রেডম্যানের গুপ্তচরেরা তার গন্ধ পেয়েছে। তার পিছনে টিকটিকিও লাগানো হয়েছে কিন্তু ধরি ধরি করেও লোকটার নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। সে হঠাৎ যেমন কোথাও এসে হাজির হয় তেমনি হঠাৎ আবার সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। ঠিক সময়ে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

১৯৫৬ সালে আইখম্যান আবার আর্জেন্টিনায় ফিরে এল। এখানে এখন বাজার মন্দা। ছোটখাটো চাকরি জোটে। কখনও কেরানী, কখনও ক্ষেতী মজুরদের সর্দার আবার কখনও ফেরিওয়ালা। আর্জেন্টিনাতেও বুঝি অন্ন জোটে না।

দেশহীন ইহুদিদের ওপর সে নিষ্ঠুর উৎপীড়ন চালিয়ে ছিল, তাদেরও সে এক দেশ থেকে আর এক দেশে তাড়িয়ে বেড়িয়েছিল আজ নিজেই সে নিরাপদ একটু আশ্রয়ের জন্যে এক দেশ থেকে আর এক দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

পরের বছরে ১৯৫৭ সালে আইখম্যান সিরিয়াতে এল। ইউনাইটেড অ্যারাব রিপাবলিক-এর প্রধান মন্ত্রী তখন নাসের। চাকরির জন্যে প্রধান মন্ত্রীর কাছে আবেদন করল। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী তার আবেদনে কোনো সাড়া দিল না। অতএব অ্যাডলফ আইখম্যান ওরফে সেনর রিকার্ডো ক্লিমেন্ট আর্জেন্টিনায় ফিরে গেল।

আইখম্যানকে সকলে স্মৃতি থেকে মুছতে চাইলেও টুভিয়া তাকে ভুলতে পারছে না। সে ঠিক লেগে আছে। ১৯৫৯ সালের অকটোবর মাসে জার্মানির উটেনবার্গ-ব্যাডেন-এর অ্যাটর্নি জেনারেল ডঃ এডউইন শিলা টুভিয়াকে চিঠি লিখে জানাল, "আমি গোপনে খবর পেয়েছি যে আইখম্যান পারসিয়ান গলফ অঞ্চলে কুবাইতে চাকরি করছে।"

ইজরেল সরকারের কাছে টুভিয়া চারজন লোক ও অর্থ সাহায্য চাইল। কিন্তু ইজরেল সরকারের সিক্রেট সারভিস টুভিয়ার এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে চিঠি দিল।

টুভিয়া ইজরেল সরকারের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করে একটি প্রবন্ধ ও সেই সঙ্গে সরকারের সেই চিঠি ইজরেলের একটি বিখ্যাত খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিল।

এই প্রবন্ধ ও চিঠি পড়ে ইজরেলের জনসাধারণ যেন জেগে উঠল। জনমত প্রবল হল। আইখম্যানকে তারা ভুলতে বসেছিল।

প্রতিশোধ চাই। প্রতিহিংসা চাই। সারা ইজরেল চিৎকার করে উঠল। জনমত এতই প্রবল হল প্রধান মন্ত্রী বেন-গেরাঁ তখন সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর ইনটেলিজেন্স অ্যাণ্ড সিকিউরিটিকে আদেশ দিল টুভিয়াকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে।

১৯৬০ সালের এপ্রিল মাস এসে গেল। চোখে ধূলো দিয়ে তখনও আইখম্যান পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এই সময়ে ফ্রাউ আইখম্যান অস্ট্রিয়াতে ফিরে এল এবং জীবনের চরম ভুল করল যখন সে তার পাসপোর্টখানি রিনিউ করবার জন্যে পাসপোর্ট অফিসে জমা দিল।

ফ্রাউ আইখম্যানের ভুল বলব? না পাসপোর্ট অফিসে টুভিয়ার গুপ্তচরের কৃতিত্ব বলব? ভেরোনিকা লিবেল নামটা সেই গুপ্তচরের খুবই চেনা। আইখম্যান নিজে যে এখন দক্ষিণ অ্যামেরিকায় যততত্র বিচরণ করে বেড়াচ্ছে এ খবরও তার জানা ছিল।

এতদিন পরে কি একটা সূত্র পাওয়া গেল? ফ্রাউ আইখম্যান কি সেই সূত্র? ফ্রাউ আইখম্যান আবার আর্জেন্টিনায় ফিরে গেল। টুভিয়ার লোকেরা তাকে অনুসরণ করছে। ট্র্যাভেল এজেন্টের প্রতিনিধি যে মানুষটি ফ্রাউকে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জ থেকে বিমানে তুলে দিয়ে এল সেই মানুষটি টুভিয়ার এজেন্ট। বিমানেও টুভিয়ার এজেন্ট ফ্রাউ-এর ওপর নজর রাখতে লাগল। ব্যুয়নস আয়ারসে বিমান বন্দর থেকে হোটেল পর্য্যন্ত যে ট্যাকসি ড্রাইভার গেল সেও টুভিয়ার এজেন্ট।

ইজরেলি এজেন্টরা ভেরোনিকার সূত্র ধরে চারদিক থেকে আইখম্যানকে ঘিরে ফেলল। সে কি করে, না করে, কোথায় যায়, কি খায়, তার প্রত্যেকটি কথা, চলন, সব কিছুই গুপ্তচরেরা লক্ষ্য করে। ছায়ার মতো তারা লেপটে রইল। এইসব গুপ্তচরদের অনেককেই আইখম্যান একদা কোনো না কোনো কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী করে রেখেছিল। অনেকের হাতে এখনও ছ্যাঁকা

দেওয়া নম্বর দেখা যাবে। আইখম্যানের দুর্ভাগ্য তাদের কাউকে সে চেনে না।

টুভিয়া ফ্রেডম্যানের এখন একটা সমস্যা দেখা দিল। অন্য একটা দেশ থেকে সে কি করে আইখম্যানকে ধরে আনবে? অনেক আইন, অনেক বাধা। লুকিয়ে আনারও অসুবিধে অনেক। কাসটম নামে জীবের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া খুবই কঠিন। তাহলে কি করা যাবে? হাতে পেয়েও কি শয়তানটাকে ছেড়ে দিতে হবে নাকি?

একটা সুযোগ পাওয়া গেল। আর্জেন্টিনার দেড়শত বার্ষিক স্বাধীনতা উৎসবের দিন এসে গেল। আর এই সময়েই ইজরেল থেকে আর্জেন্টিনা পর্যন্ত ইজরেল সরাসরি একটা এয়ার লাইন চালু করল। এই নতুন এয়ার লাইনের উদ্বোধন উপলক্ষে আর্জেন্টিনায় উৎসব করা হবে। একটা সুযোগ উপস্থিত।

আইখম্যান ছুটির পর কাজ থেকে ফিরছে। এদিকে বাইরে একখানা ভাড়া গাড়ি এবং চারজন লোক রিভলভার হাতে অপেক্ষা করছে। আইখম্যান বেরোবার একটু পরেই সেই চারজন তাকে ঘিরে ফেলল এবং সহজেই গাড়িতে নিয়ে তুলল। গাড়ি থেকে একটা বাসাবাড়ির একটা ঘরে আটকে রাখা হল। পরে ইজরেলি বিমানে আইখম্যানকে তুলে দিতে কোনো অসুবিধে হল না।

১৯৬১ সালের ১১ এপ্রিল তারিখে জেরুজালেমে আইখম্যানের প্রকাশ্য আদালতে বিচার আরম্ভ হল।

১৫ ডিসেম্বর তারিখে বিচারক রায় দিলেন, টু বি হ্যাঙ্গড ইন দি নেক টিল ডেড। ফাঁসি।

১৯৬২ সালের ১ জুন তারিখে র‍্যামলে জেলখানায় আইখম্যানের ফাঁসি হয়ে গেল।